ইসলামী চরিত্রের মূলনীতি

أصول
التربية الإسلامية

রচনায়:
প্রফেসর ডক্টর/ খালেদ বিন হামেদ বিন মুবারক আল-হাযেমী।
শিক্ষক: এডুকেশন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা মুনাওয়ারাহ।

ইসলামী চরিত্রের মূলনীতি

রচনায়:

প্রফেসর ডক্টর/ খালেদ বিন হামেদ বিন মুবারক আল-হাযেমী।

শিক্ষক: এডুকেশন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা মুনাওয়ারাহ।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, আমরা তার প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের হৃদয়ের অনিষ্টতা এবং মন্দ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে সুপথ প্রদর্শন করার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর:

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির উপর অগণিত নেয়ামত ও অপরিসীমিত অনুগ্রহ দান করেছেন; তন্মধ্যে রাসূলগণ পাঠানোতে বিরতী পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ সাঃ কে প্রেরণ করা। আর এটি ছিল কালপ্রবাহে মানুষের নিকট এমন সময় আগমন করার পর যখন সে তার মনোবৃত্তি অনুসরণ করে চারিত্রিক অধপতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছিল। অতঃপর মানবজাতিকে উদ্ধার এবং পূর্ববর্তী আসমানী রেসালাত যে প্রশংসিত চরিত্রের সূচনা করেছিল তা পূর্ণতা দেয়ার লক্ষ্যে মুহাম্মাদ সাঃ এর রেসালাতের আগমন ঘটল। ফলে তার রেসালাত উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দিল যেমনটি তিনি বলেছেন: (সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।)[(১)] রাসূল সাঃ সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন যেমনটি আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।][(২)] সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দান করেছেন। ফলে তিনি তার উম্মতকে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ও শরয়ী শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিক্ষা ও অনুসরণীয় আদর্শের মাধ্যমে তা অর্জনের উপায় তাদেরকে বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামে স্বভাব-চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে; ফলে নিষ্কলুষ হৃদয় এবং সঠিক ফিতরাত তা প্রবলভাবে পেতে চায়। অনুরূপভাবে ইসলামী শিষ্টাচার সমগ্র দ্বীনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং রব, নিজ সত্ত্বা ও সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ককে নির্ধারণ ও সুবিন্যস্ত করেছে। ফলে ইসলামী শিষ্টাচার সমগ্র মানবজাতির সংশোধনের জামিনদারে পরিণত হয়েছে।

আর যখন তরবিয়ত বা পরিপালন কর্মতৎপরতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইসলামী সমাজে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন সমাজের কিছু চরিত্রের গতিপথ ইসলামী পরিপালন পদ্ধতির বিপরীত দিকে মোড় নেয়। এমতাবস্থায় এমন বিকৃত চরিত্র প্রকাশ পায় যা ইসলামী পরিপালন পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়।

অনেকগুলো চারিত্রিক বিষয়াবলী, মূলনীতি এবং গুণাবলী ধারণ করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আগমন করেছে। এছাড়াও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে খারাপ ও বিকৃত চরিত্র সম্পর্কিত বিষয় এবং তা সংশোধনের পথ-পদ্ধতির

(১) মুসনাদে আহমদ (২/৩৮১), মুয়াত্তা (২/৯০৪, হা: ৮), শাইখ আলবানী জামেউস সগীরে (হা: ২৩৪৯) এটিকে সহীহ বলেছেন।
(২) সূরা আল-কলম: (০৪)।

চমৎকার বর্ণনা, মন্দ চরিত্রের ক্ষতিকর দিকসমূহ এবং এ বিকৃত চরিত্রের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য।

আমি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করছি যে, এ গ্রন্থটিকে এই উম্মতের বিনির্মাণে কার্যকর এবং উপকারী কর্ম হিসেবে পরিণত করবেন, একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করবেন এবং এটিকে কিয়ামত দিবস অবধি সাদাকা জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিবেন। এ গ্রন্থে যা কিছু সঠিক তা তো আল্লাহ তায়ালার তাওফীকে সম্ভব হয়েছে এবং যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সে বিষয়ে আমার দোয়া হল: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَاۚ﴾ [হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।] অনুরূপভাবে আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে কথা ও কাজে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের তাওফীক দান করেন এবং অসৎ চরিত্র ও তার শাস্তি এবং মন্দ পরিণাম থেকে দূরে রাখেন।

আর আমাদের শেষ ধ্বনি হল ‘সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর প্রাপ্য’। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের সর্দার আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজন এবং সকল সহচরবৃন্দের উপর।

আল-মদিনা আল-মুনাওয়ারাহ

২৭/১১/১৪২৮ হিঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ:

ইসলামী চরিত্র

প্রথম অনুচ্ছেদ: চরিত্রের সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক মূলনীতি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: চরিত্রের সীমারেখা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক আচরণের মূলনীতি।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: ইসলামী চরিত্রের ভিত্তি।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: শিষ্টাচার ও চারিত্রিক গুণাবলী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক শিক্ষা এবং চারিত্রিক হুকুম আরোপের ভিত্তিসমূহ।

ইসলামী চরিত্রের মূলনীতি

মুখবন্ধ:

ইসলামে চরিত্র বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এটিকে অসংখ্য কুরআনের আয়াত ও নবী সাঃ এর হাদিস ধারণ করেছে এবং এর মূলনীতি প্রণয়ন করেছে; যা একজন ব্যক্তি বা সমাজ যদি গ্রহণ করে তাহলে তারা সফলকাম হবে, ধ্বংসাত্মক প্রবণতা থেকে রক্ষা পাবে এবং চারিত্রিক অধঃপতন, সামাজিক ও মনোজাগতিক সংঘাতের দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাবে -যে সমস্যায় কিছু সমাজ ইতিমধ্যে আক্রান্ত।

ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে চরিত্রের মর্ম নিরূপণে পরিপালনীয় অনেক ভুল ধারণা আছে। কেউ কেউ ভুল বুঝ এবং নৈতিক শিক্ষার মূল উৎসাধারা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে উত্তম চরিত্রের মাঝে এমন স্বভাবকে অন্তর্ভুক্ত করে যা তার অংশ নয়। আবার কেউ কেউ ভ্রান্ত অভিরুচীর দোহায় দিয়ে ইসলামী শিষ্টাচারের কিছু গুণাবলীকে বাদ দিয়ে দেয়। ফলে এ সকল ভুল বুঝ এমন চরিত্রের উদ্ভব ঘটায় যা ইসলামী জীবনব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং তা ইসলামী পরিপালন পদ্ধতির বিপরীত; যেমন: নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পর্দাহীনতা, প্রতারণা, ধোঁকা এবং আল্লাহ তায়ালা কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এমন ভিনদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ।

জ্ঞান ও বিকাশমান বিজ্ঞানের স্থানান্তরের উপকরণের মাধ্যমে আগত সাংস্কৃতিক স্রোত, অনৈসলামী সংস্কৃতির অনুবাদ এবং তা প্রচার ও তার মাঝে থাকা প্রথা-ঐতিহ্য প্রচারণার ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার লেখনিতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকি খাবার, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দ-উৎসব এবং অনুষ্ঠানগুলোতে এর প্রভাব দৃশ্যমান। এটি এ কথা নিশ্চিত করে যে, ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে চারিত্রিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ একটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে।

অনুরূপভাবে ইসলামী নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, ভিনদেশী প্রভাব থেকে ইসলামী নৈতিকতার বুঝকে সুরক্ষিত রাখা এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে তা বাস্তবায়নে কাজ করা। এ প্রেক্ষিতে আবশ্যক হল চারিত্রিক আচরণের ক্ষেত্রে পরিপালন সম্বন্ধীয় মূলনীতি এবং শরয়ী বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা।

প্রথম অনুচ্ছেদ

চরিত্রের সংজ্ঞা

প্রথমত: আভিধানিক অর্থে চরিত্র:

আরবি (الخلق) উচ্চারণ ‘লাম’ বর্ণে পেশ ও সাকিন সহকারে। এর অর্থ হল: দ্বীন, স্বভাব এবং সহজাত বৈশিষ্ট্য।

আর তার হাকীকত হল, এটি মানুষের ভেতরের প্রতিচ্ছবি এবং এটি স্বয়ং, তার গুণাবলী ও সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য হল বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি দেহকাঠামো, তার গুণাবলী ও তাৎপর্যের পর্যায়ভুক্ত। উভয়েরই ভাল এবং মন্দ গুণাবলী রয়েছে।(১)

‘মুজামুল ওয়াসীতে’ এসেছে চরিত্র হল: অন্তরের স্থিতিশীল অবস্থা; যেখান থেকে ভাল বা মন্দ কর্মগুলো কোন ধরণের চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছাড়াই উদ্ভূত হয়।(২)

‘খুলুক’ শব্দটি মানুষ যে স্বভাব-চরিত্র অর্জন করে তা বুঝাতেও ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়: تخلَّق بخلق كذا।

সে অমুক চরিত্র গ্রহণ করেছে অর্থাৎ সে জন্মগত বৈশিষ্ট্যের বাইরে কোন একটি স্বভাব-চরিত্র ধারণ করেছে। অনুরূপভাবে বল হয়: ‘অমুক তার স্বভাবের বাইরের চরিত্র ধারণ করেছে’ অর্থাৎ সে চরিত্র গ্রহণের ভান করেছে।(৩)

রাগেব ইস্পাহানী বলেন: “যে উত্তম গুণ মানুষ তার স্বভাবের মাধ্যমে অর্জন করে; তাই চরিত্র।(৪)

আর ‘ইলমুল আখলাক হল: মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিধিবিধান যা নন্দিত বা নিন্দিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে।(৫)

পূর্বোক্ত আলোচন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আখলাক আভিধানিকভাবে পরস্পর বিপরীতধর্মী ও কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুশীলনের মাধ্যমে ভাল বা মন্দ চরিত্র ধারণে মানুষের সক্ষমতার কারণে আখলাক কখনো স্বভাব, সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং ফিতরাত অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো কৃত্রিমভাবে স্বভাব গ্রহণ ও চরিত্র গ্রহণের ভান ধরার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে উত্তম মেলামেশা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

অন্যভাবে, আভিধানিক অর্থ প্রমাণ করছে যে আখলাকের কিছু অংশ সহজাত আর কিছু অংশ অর্জনীয়। আর উভয়টির ভাল বা মন্দ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: কুরআনুল কারীমের বর্ণনায় চরিত্র:

---

(১) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১/৮৬)।
(২) ফিরোজ আবাদী, আল-কামূক আল-মুহীত (৩/২২৯)।
(৩) মাজমাউল লুগাহ, (১/২৫২)।
(৪) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১০/৮৭)।
(৫) মাজমাউল লুগাহ, (১/২৫২)।

কুরআনুল কারীমের দু'টি স্থানে (خُلُق) বা চরিত্র শব্দটি এসেছে:

ক. মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡنَآ أَوَعَظۡتَ أَمۡ لَمۡ تَكُن مِّنَ ٱلۡوَٰعِظِينَ ١٣٦ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾ অর্থ: [তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও উভয়ই আমাদের জন্য সমান* এটা তো কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।][১]

ইবনু কাসীর রহঃ বলেন: "তারা এ কথার দ্বারা তাদের ধর্ম ও তারা যে বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বুঝাতে চায়। আর তা হল, তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের ধর্ম। তারা প্রকারান্তে বলে যে, আমরা তাদের অনুগামী ও তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতির অনুসারী এবং তারা যে বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করছে আমরাও সেভাবে মৃত্যুবরণ করব। আর পুনরুত্থান ও পরকাল বলে আদতে কিছুই নেই"।[২]

খ. মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ অর্থ: [আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।][৩] অর্থাৎ, "আপনি শ্রেষ্ঠ দ্বীন ইসলামের উপর রয়েছেন"।[৪] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: "রাসূল সাঃ কুরআনের আদেশ-নিষেধ পালনে এবং আখলাক-চরিত্রে ধারণে উত্তম দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিলেন। কুরআন যে বিষয়ে তাকে নির্দেশ দিয়েছে তিনি তা পালন করেছেন এবং যে বিষয়ে তাকে নিষেধ করেছে তা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। এর সাথে সাথে লজ্জাশীলতা, দানশীলতা, সাহসিকতা, সহনশীলতা এবং সকল অনুপম চরিত্রের ন্যায় যে মহান আদর্শের উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন"।[৫] আর এর প্রতিই উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রাঃ ইঙ্গিত করেছিলেন যখন কাতাদা রাঃ তাকে রাসূল সাঃ এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বলেছিলেন: (তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর নবী সাঃ এর চরিত্র তো ছিল আল-কুরআনই।)[৬]

অনুরূপভাবে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: (আমি দশ বছর রাসূল সাঃ এর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো আমাকে উহ শব্দও বলেন নি এবং কোন বিষয়ে আমাকে এটা কেন করলে, ওটা কেন কর নি, তাও বলেন নি।)[৭] এটি রাসূল সাঃ এর খাদেমের সাথে ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ দিক। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহঃ বলেন: "আর আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাঃ কে যে 'মহান চরিত্র' হিসেবে বর্ণনা করেছেন তা হল পূর্ণাঙ্গ দ্বীন যা শর্তহীনভাবে আল্লাহর সকল নির্দেশনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমন ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ রহঃ এবং অন্যান্য ইমামগণ। তা হল কুরআনের ব্যাখ্যা, যেমন বলেছেন আয়েশা রাঃ 'তার চরিত্র তো ছিল আল-কুরআনই।' এর হাকীকত হল প্রফুল্ল চিত্তে এবং প্রশস্ত হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন তা পালনে উদ্যোগী হওয়া"।[৮]

এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে 'খুলুক বা চরিত্র' শব্দটি শ্রেষ্ঠ দ্বীন ইসলাম বুঝাতেও প্রয়োগ করা হয়। যেমনটি দ্বিতীয় আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়। আর এটি রাসূল সাঃ এর নিরঙ্কুশ অনুসরণ এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ নিয়তকে অন্তর্ভুক্ত করে; যেন ইসলামী চরিত্রের গুণাবলী অর্জিত হয়। আবার কখনো অন্যান্য ধর্ম ও তার মাঝে সংঘটিত আচরণগত বিকৃতি বুঝাতেও প্রয়োগ করা হয়; যেমনটি প্রথম আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ,

---

(১) সূরা আশ-শুআ'রা: (১৩৬-১৩৭)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৩৫৫)।
(৩) সূরা আল-কলম: (০৪)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর: (৪/৪২৯)।
(৫) প্রাগুক্ত (৪/৪২৯)।
(৬) সহীহ মুসলিম (১/৫১২-৫১৩)।
(৭) সহীহ বুখারী (৪/৯৮, হা: ৬০৩৮), সহীহ মুসলিম (৪/১৮০৪)।
(৮) মাজমুউর রাসায়েল (১/২৩৪)।

উত্তম গুণাবলী ও প্রশংসনীয় স্বভাব বুঝাতে যেমন ‘খুলুক/চরিত্র’ শব্দটি ব্যবহার হয় অনুরূপভাবে এবং মন্দ গুণাবলী বুঝাতেও ব্যবহার হয়; যেমন আভিধানিক অর্থে এবং কুরআনে বর্ণিত অর্থে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তৃতীয়ত: হাদিসের বর্ণনায় চরিত্র:

‘খুলুক’ শব্দটি হাদিসে নববীর বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে; এখানে তার কিছু উদাহরণ পেশ করা হল:

ক. পুণ্য অর্থে: নাওয়াস বিন সামআন আল-আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাঃ কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি জবাব দিলেন: (পুণ্য হল উন্নত চরিত্র। আর পাপ হল যা তোমার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক -তুমি তা অপছন্দ কর)।[১] হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, উত্তম চরিত্র হল পুণ্য। আর (البِر) শব্দটি সম্পর্ক, বন্ধুবাৎসল্য, সৎকর্ম, উত্তম সঙ্গ ও মেলামেশা এবং মহৎ কাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এ সবগুলোর সমষ্টিই হল উত্তম চরিত্র।[২] পূর্বোক্ত হাদিসে সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন: “হাদিসটি প্রমাণ করে যে, উত্তম চরিত্র হল অন্তঃকরণ ও হৃদয়ের প্রশান্তি।[৩] এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উত্তম চরিত্র যাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার আমলকে ধারণ করে।

খ. **প্রশংসনীয় গুণাবলী ও আমলে সালেহ অর্থে:** রাসূল সাঃ বলেছেন: (নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহান তিনি মহত্বকে পছন্দ। তিনি উন্নত চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং মন্দ চরিত্রকে ঘৃণা করেন।)[৪] আনাস রাঃ বলেন: (আমি দশ বছর রাসূল সাঃ এর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো আমাকে উহ শব্দও বলেন নি এবং কোন বিষয়ে আমাকে এটা কেন করলে, ওটা কেন কর নি, তাও বলেন নি।)[৫] রাসূল সাঃ এর চরিত্র বর্ণনায় আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলেন: (তিনি অশ্লীল ভাষী ও অসদাচারী ছিলেন না।)[৬] রাসূল সাঃ আরো বলেন: (তোমাদের মাঝে যার স্বভাব-চরিত্র ভাল সেই তোমাদের মধ্যে সব চাইতে উত্তম।)[৭]

এ সকল হাদিস প্রমাণ করে যে, আখলাকের কতক অংশ উত্তম ও প্রশংসিত। আর তা হল, যে সকল চরিত্র প্রশংসনীয় গুণাবলী, সৎকর্ম এবং মানুষের সাথে উত্তম মেলামেশার প্রতিনিধিত্ব করে।

গ. অশ্লীল স্বভাব-চরিত্র অর্থে: রাসূল সাঃ বলেন: (হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মন্দ আখলাক, মন্দ আমল এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে।)[৮] তিনি আরো বলেন: (নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহান তিনি মহত্বকে পছন্দ।

---

(১) সহীহ মুসলিম (৪/১৯৮০, হা: ১৪-২৫৫৩)।
(২) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (১৬/১১১)।
(৩) মাদারেজুস সালেকীন (২/৩১৯)।
(৪) মুস্তাদরাকে হাকেম (১/৪৮), খারায়েত্বী, মাকারেমুল আখলাক (পৃ: ৫৫), জামেউস সগীরে (১/৩৭০, হা: ১৮০০) শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৫) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৬) আরবি ‘ফুহশুন’ শব্দটি সকল মন্দ অভ্যাস বুঝাতে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং মন্দ কথা ও কাজ উভয়টির ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে। আর ‘মুতাফাহেহশ’ এর অর্থ হল, যে স্বেচ্ছাই ও স্বজ্ঞানে মন্দ কথা ও কাজ করে। আন-নিহায়া (৩/৪১৫), আল-মুফরাদাত (পৃ: ৩৭৩-৩৭৪)।
(৭) সুনানে তিরমিযি (৫/৫৩৬, হা: ৬০২৯), মুস্তাদরাকে হাকেম (১/৫৩২) এবং তিনি বলেন: হাদিসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। জামেউস সগীরে (১/২৭৮, হা: ১২৯৮) শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮) সুনানে তিরমিযি (৫/৫৩৬, হা: ৩৫৯১), মুস্তাদরাকে হাকেম (১/৫৩২) এবং তিনি তিনি বলেন: হাদিসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। জামেউস সগীরে (১/২৭৮, হা: ১২৯৮) শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

তিনি উন্নত চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং মন্দ চরিত্রকে ঘৃণা করেন।)[১] সুতরাং হাদিসে বর্ণিত (منكرات الأخلاق) ও (سفاسفها) মন্দ চরিত্র শব্দটি প্রমাণ করছে যে, চরিত্রের কিছু অংশ নিন্দনীয় ও ঘৃণিত। আর তা হল যে সকল চরিত্র ব্যক্তির খারাপ আচরণ ও হীন অভ্যাস চর্চার প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ. সহজাত ও জন্মগত স্বভাব অর্থে: এর প্রমাণ পাওয়া যায় আশাজ্জ আব্দুল কায়েস কে সম্বোধন করে বলা কথার মাঝে: (তোমার মাঝে দু'টি উত্তম স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন: ধৈর্য ও ধীরস্থিরতা। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি স্বভাব গড়ে তুলেছি না আল্লাহ আমাকে এ দু'টি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন? রাসূল সাঃ বললেন: আল্লাহই তোমাকে এ দু'টি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি বললেন: প্রশংসা করছি সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন দু'টি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।)[২] হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, উত্তম চরিত্রের কিছু অংশ সহজাত ও জন্মগত ব্যাপার; যার উপর আল্লাহ তায়ালা তার কতক বান্দাকে সৃষ্টি করে থাকেন।

হাফেয ইবনু হাজার রহঃ বলেন: "রাসূল সাঃ কে বারবার প্রশ্নটি করা এবং রাসূল সাঃ কর্তৃক তার কথাকে স্বীকৃতি দেয়া বুঝায় যে, স্বভাব-চরিত্রের কিছু অংশ জন্মগত আর কিছু অংশ অর্জনীয়"।[৩]

ঙ. অর্জনীয় স্বভাব-চরিত্র অর্থে: যে চরিত্র মানুষ চর্চা, অভ্যাস এবং প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে অর্জন করে। এ জন্য রাসূল সাঃ একজন ব্যক্তিকে উপদেশ চাওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে নির্দেশনা দিলেন এই বলে যে: (যেখানেই থাকবে তুমি আল্লাহকে ভয় করবে। মন্দ কাজের অনুবর্তীতে নেককাজ করবে; ফলে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে। আর মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে।)[৪] (সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাস ছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর।)[৫] এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার সামর্থের মাধ্যমে উত্তম গুণাবলী অর্জন করতে পারে এবং তা চরিত্রে ধারণ করতে পারে অবশেষে সে চরিত্র তার স্বভাব ও গুণে পরিণত হয়ে পড়ে। ফলে সে এর মাধ্যমে বিনিময়, প্রতিদান এবং সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করে থাকে, যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে। তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য এবং কিয়ামত দিবসে আমার নিকট হতে অনেক দূরে অবস্থান করবে বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং মুতাফাইহিক লোকজন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বাচাল ও ধৃষ্ট-দাম্ভিকদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাইহিক কারা? তিনি বললেন: অহংকারীরা।)[৬] তিনি আরো বলেন: (কিয়ামত দিবসে মুমিনের

(১) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(২) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৩) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৪৫৯)।
(৪) সুনানে তিরমিযি (৪/৩১২-৩১৩, হা: ১৯৮৭), মুসনাদে আহমাদ (৫/১৫৩), সহীহ সুনানে তিরমিযিতে (১৬১৮-২০৭০) শাইখ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
(৫) সুনানে আবু দাউদ (১/১৫০,হা: ৪৮০০), সুনানে তিরমিযি (৪/৩১৫, হা: ১৯৯৪), সুনানে ইবনে মাজাহ (১/১৯-২০, হা: ৫১) সিলসিলাতুল আহাদিসে (২৭৩) শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬) সুনানে তিরমিযি (৪/৩২৫, হা: ২০১৮), মুসনাদে আহমাদ (৪/১৯৪), শাইখ আলবানী সহীহ জামেউস সগীরে (১৫৩৫) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে বেশি ওজনের আর কোন জিনিস হবে না। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।)[১]

এখান থেকে প্রতিভাত হয় যে, নন্দিত বা নিন্দিত যে সকল গুণাবলীতে মানুষ গুণান্বিত হয় সে সকল গুণের সমিষ্টিগত নামই হল চরিত্র। সুতরাং তা যদি প্রশংসনীয় হয় তাহলে তাকে উত্তম স্বভাব-চরিত্র হিসেবে নামকরণ হয় আর যদি নিন্দিত হয় তাহলে মন্দ এবং নিকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চরিত্র হল এমন একটি রূপ যা দ্বারা একজন মানুষ যে কোনভাবে বিশেষিত হয়। আর এ কথার প্রমাণ বহন করে কুরআনের দু'টি আয়াত; যার একটি কুরআনিক চরিত্র এবং আরেকটি পূর্ববর্তীদের চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী: ﴿إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾ অর্থ: [এটা তো কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।][২] আল্লাহর বাণী: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾ অর্থ: [আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।][৩] আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা পূর্বে গত হয়েছে। অনুরূপভাবে আভিধানিক অর্থে চরিত্র মানুষের অপ্রকাশ্য রূপকে বুঝায় এবং এর ভাল ও মন্দ বিশেষণ রয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায় যে স্বভাব-চরিত্রের সাধারণ অর্থ অভিধান, কুরআন এবং হাদিসের ভাষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চতুর্থত: পারিভাষিক অর্থে চরিত্র:

ইসলামী পরিপালনে স্বভাব-চরিত্রের সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে আমি এখানে কতগুলো সংজ্ঞা উল্লেখ করব:

- চরিত্র হল মানুষের নানা গুণাবলী যার মাধ্যমে সে অন্যদের সাথে আচরণ করে; চাই তা নন্দিত বা নিন্দিত হোক। ইবনু হাজার রহঃ বলেন: ‘‘সাধারণভাবে যা প্রশংসনীয় চরিত্র তা নিজের চেয়ে অন্যের সাথে হয়; সুতরাং তুমি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে এবং প্রতিশোধ নিবে না। আর বিস্তারিতভাবে ভাল গুণাবলী হল, ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, দানশীলতা, ধৈর্য ধরা, কষ্ট সহ্য করা, দয়ার্দ্রতা, সহানুভূতি, অন্যের অভাব পূরণ, বন্ধুভাবাপন্নতা এবং কোমল আচরণ ইত্যাদি। আর নিন্দিত চরিত্র হল এ সব গুণাবলীর বিপরীত গুণসমূহ’’।[৪]
- চরিত্রকে তার উৎসসূত্রে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে ইবনু মুফলেহ চরিত্রের সংজ্ঞায় বলেন: ‘‘চরিত্রের হাকীকত হল, এটি মানুষের ভেতরের প্রতিচ্ছবি এবং এটি নিজেই তার গুণাবলী ও তাৎপর্য। এর রয়েছে ভাল ও মন্দ বিশেষণ’’।[৫] অর্থাৎ, মানুষ যে সমস্ত ভালো এবং মন্দ গুণাবলীতে বিশেষিত হয় তার সমষ্টি হল চরিত্র। এটা মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে; ফলে এটা যখন প্রকাশিত হয় তখন মানুষের বাহ্যিক অবয়বের অনুরূপ হয়। আর এরূপ উল্লেখ করেছেন ইমাম সাফারীনী রহঃ।[৬]

  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দারাজ রহঃ বলেন: ‘‘চরিত্র হল ইচ্ছার মাঝে নিহিত একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি যা প্রশংসনীয় হলে ভাল ও কল্যাণকর এবং নিন্দিত হলে মন্দ ও অন্যায় বেছে নেয়ার প্রবণতা রাখে’’।[৭] অর্থাৎ চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষের অভ্যন্তর, আর তার বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে আচরণে। এ সংজ্ঞার

---

(১) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৫০, হা: ৪৭৯৯), সুনানে তিরমিযি (৪/৩১৮-৩১৯, হা: ২০০২) এবং তিনি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, মুসনাদে আহমদ (৬/৪৪২, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫২) সহীহ সুনানে তিরমিযিতে (১৬২৮-২০৮৭) শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(২) সূরা আশ-শুআ'রা: (১৩৭)।
(৩) সূরা আল-কলম: (০৪)।
(৪) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৪৫৬)।
(৫) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরঈয়্যাহ (২/২০৫)।
(৬) আস-সাফারীনী, গিযাউল আলবাব (১/৩৬০)।
(৭) মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, দিরাসাত ইসলামিয়্যাহ (পৃ: ৮৮)।

মাধ্যমে মুহাম্মাদ দারাজ ইবনে মুফলেহ ও সাফারীনী রহিঃ এর সাথে সহমত পোষণ করেছেন। অন্য আরেকটি গ্রন্থে মুহাম্মাদ দারাজ পূর্বের সংজ্ঞার অনুরূপ সংজ্ঞা আরো বিশদভাবে ব্যক্ত করে বলেন: “চরিত্র শব্দটি সঠিক অর্থে সেই সহজাত ও অর্জিত শক্তিকে বুঝায়, যা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আচরণ প্রকাশ পায়। অন্যভাবে, চরিত্র হল আমাদের অভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের স্থির রূপ। আর তা হল প্রতিটি সৃষ্টিজীবকে আল্লাহর দেয়া বাহ্যিক গঠনের বিপরীত।[১]

ইমাম গাযালী রহিঃ বলেন: “স্বভাব-চরিত্র অন্তরের মাঝে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ, যেখান থেকে কর্মগুলো সহজে এবং অনায়াসে উদ্ভূত হয় কোন ধরণের চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছাড়াই।[২]

যে রূপটি স্বভাব-চরিত্র উদ্ভূত হওয়ার উৎস সে সম্পর্কে ইমাম গাযালী রহিঃ বলেন: “তা থেকে যদি মন্দ কর্মসমূহ প্রকাশ পায় তাহলে সে উৎস রূপটিকে মন্দ চরিত্র নামে নামকরণ করা হয়। আর আমরা তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ বলেছি; কেননা যে ব্যক্তি হঠাৎ আগত প্রয়োজনে কদাচিৎ অর্থ খরচ করে তার এ চরিত্রকে দানশীলতা বলা হয় না যতক্ষণ না এটি তার অভ্যন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়। আর ‘তা থেকে কর্মগুলো সহজে উদ্ভূত হয় কোন ধরণের চিন্তা ছাড়াই’ শর্তটি আরোপ করেছি; কেননা যে ব্যক্তি কষ্টচিত্তে সম্পদ ব্যয় করে অথবা রাগের সময় চেষ্টা করে ও সতর্কতার সাথে নিরবতা অবলম্বন করে; তার এ ধরণের চরিত্রকে দানশীলতা ও সহনশীলতা বলা হয় না।[৩]

- কোন কোন বিদ্বান ‘খুলুক’ ও ‘তাখাল্লুক’ এর মাঝে পার্থক্য করেছেন। রাগেব ইস্পাহানী রহিঃ বলেন: “‘খুলুক’ বা চরিত্র ও ‘তাখাল্লুক’ বা আচরণ এর মাঝে পার্থক্য হল, ‘তাখাল্লুক’ এর সাথে পরিশ্রম ও নিরুৎসাহ রয়েছে এবং বাইরে থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। আর ‘খুলুক’ এর সাথে স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রফুল্লতা থাকে এবং বাইরে থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় না।[৪]

আর বাস্তবে স্বভাব-চরিত্রের জন্য পূর্ব থেকে স্বভাব ধারণ ও অভ্যস্ত হওয়া অপরিহার্য। আর সেটি হল নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র। আর উদ্দেশ্য যত শক্তিশালী হবে ব্যক্তির অভ্যন্তরে আচরণ তত দ্রুত স্থিতি লাভ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিনয় প্রকাশ করে বা সাময়িক দুনিয়াবী স্বার্থে অর্থ ব্যয় করে তার এ চরিত্র হারিয়ে যাবে উদ্দেশ্য লোপ পাওয়ার সাথে সাথে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদত করা বা তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান ও সওয়াবের প্রত্যাশা করা; তার চরিত্রটি স্থায়ী হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর তা শক্তিশালী উদ্দেশের কারণে। এখান থেকে আমরা পাই যে, তারবিয়াহ ইসলামিয়াহ এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণসমূহের অন্যতম হল, এটি সেই ইসলামী আকীদা থেকে উৎসারিত যেটি সৃষ্টিজীবের পক্ষ থেকে প্রতিদানের চেয়ে সৃষ্টিকর্তার উত্তম ও স্থায়ী প্রতিদানকে শ্রেষ্ঠতর মনে করে। কেউ যদি তা প্রত্যাশা করে তার প্রতিদান ও সওয়াব অর্জিত হয়। যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে বর্ণিত হয়েছে: ﴿إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا﴾ অর্থ: [শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।][৫] আল্লাহ তায়ালা উত্তম চরিত্রের জন্য ব্যাপক প্রতিদান দিয়েছেন। রাসূল সাঃ বলেছেন: (নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে নফল সিয়াম পালনকারী এবং সালাত আদায় কারীর মর্যাদা লাভ করে থাকে।)[৬]

---

(১) মুহাম্মাদ দারাজ, দুস্তুরুল আখলাক ফিল কুরআন (পৃ: ৬০৫)।
(২) গাযালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন (৩/৫৩)।
(৩) প্রাগুক্ত (৩/৫৪)।
(৪) রাগেব ইস্পাহানী, আয-যারিয়া ইলা মাকারিমিশ শরীয়া (পৃ: ১২২)।
(৫) সূরা আল-ইনসান: (৯)।
(৬) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৫০, হা: ৪৭৯৯), ইমাম হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাক গ্রন্থে (১/১৯৫, হা: ১৮৬) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

রাগেব ইস্পাহানীর কাছাকাছি সংজ্ঞার প্রতি ইশারা করেছেন ইমাম মাওয়ারদী। তিনি (الخيم) যা জন্মগত স্বভাব বুঝায় এবং (الخلق) যা অর্জিত স্বভাব বুঝায়; এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে বলেন: জন্মগত স্বভাবকে খীম বলে আর অর্জিত স্বভাবকে খুলুক বলে।(১)

- আবার কেউ কেউ শরীয়ত ও বুদ্ধি-বিবেক এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত স্বভাবকে 'খুলুক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবুল ইয়াজিদ আল-আজমী বলেন: 'খুলুক' বা স্বভাব-চরিত্র হল এক ধরণের চর্চা ও অনুশীলন যাকে শরীয়ত ও বুদ্ধি-বিবেক মানুষের অবস্থার জন্য কল্যাণকর ও তাদের দু'টি সৌভাগ্য নিশ্চিতকারী হিসেবে মনে করে। পার্থিব জীবনে সহাবস্থানের সৌভাগ্য ও আখেরাতে সওয়াব ও নেয়ামত প্রাপ্তির সৌভাগ্য।(২)
- কতক বিদ্বান আখলাককে উত্তমতার দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইমাম হাসান বসরী রহিঃ বলেন: "উত্তম চরিত্রের হাকীকত হল: সৎকর্ম করা, কষ্টদানে বিরত থাকা এবং চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখা"।(৩) আবার কারো মতে উত্তম চরিত্র হল: "দান করা, কষ্টদানে বিরত থাকা এবং চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখা"।(৪) ইবনুল কায়্যিম রহিঃ বলেন: "উত্তম চরিত্র হল দান করা, কষ্টদানে বিরত থাকা এবং কষ্ট সহ্য করা। কারো মতে: ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা। আবার কারো মতে: মন্দ চরিত্র পরিহার করা এবং ভাল চরিত্র গ্রহণ করা"।(৫)

কাজী আয়ায রহিঃ বলেন: "উত্তম চরিত্র হল মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা, তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা, সহমর্মিতা দেখান, তাদেরকে সহ্য করা, তাদের সমস্যা দূর করা ও অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের সাথে অহংকার পরিহার করা ও জবান সংযত রাখা, তাদের প্রতি কঠোরতা ও রাগ প্রদর্শন এবং তাদের নিন্দা করা পরিহার করা"।(৬) ইবনে রজব রহিঃ বলেন: "উত্তম চরিত্র দ্বারা কখনো শরীয়তের নির্দেশিত আখলাক ধারণ করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত সে আদব গ্রহণ করা বুঝায়; যে আদব দ্বারা তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাঁরা বান্দাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন"।(৭)

ইবনে তাইমিয়া রহিঃ বলেন: "মানুষের সাথে উত্তম আচরণের সমষ্টি হল যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সালাম প্রদানের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাকে সম্মান করা ও তার জন্য দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তার প্রশংসা করা ও তাকে দেখতে যাওয়া। যে ব্যক্তি তোমাকে শিক্ষা, সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে; তাকে দান করা এবং যে ব্যক্তি তোমার প্রতি যুলুম করেছে রক্তপাত ঘটিয়ে বা সম্পদ নিয়ে অথবা সম্মান হানি করে; তাকে ক্ষমা করা। এগুলোর মাঝে কিছু ওয়াজীব আর কিছু মুস্তাহাব"।(৮)

আব্দুর রহমান আল-মায়দানী বলেন: "স্বভাব-চরিত্র হল অন্তরের মাঝে স্থিতিশীল -সহজাত বা অর্জনীয়- এমন বৈশিষ্ট্য যার প্রভাব রয়েছে আচরণে; চাই তা ভাল হোক বা মন্দ"।(৯) সুতরাং তিনি মানুষের বৈশিষ্ট্যাবলী আকস্মিক আগত প্রতিটি আচরণকে তার স্বভাব থেকে বাদ দেন; চাই সেই আচরণ ভাল হোক বা মন্দ। তাই যতক্ষণ না আচরণটি তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সে আচরণটিকে চারিত্রিক আচরণ হিসেবে গণ্য করেন না। অনুরূপভাবে আল-মায়দানী মানুষের ভাল-মন্দ সকল বৈশিষ্ট্যকে আখলাক গণ্য

---

(১) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরঈয়্যাহ (২/২০৫)।
(২) আবুল ইয়াজিদ আল-আজমী, আস-সুলুক আল-খুলুকী, মাজাল্লাতুল জুনদী (সংখ্যা: ৩৯, পৃ: ৪)।
(৩) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরঈয়্যাহ (২/২০৭)।
(৪) ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ঈমান (পৃ: ১০)।
(৫) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩১৯)।
(৬) সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৫১৭)।
(৭) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (পৃ: ২৩৯)।
(৮) মাজমুউর রাসায়েল (পৃ: ২৩৪)।
(৯) আল-আখলাক আল-ইসলামিয়্যাহ (১/১০)।

করেন। সুতরাং আখলাক মন্দ গুণাবলী ব্যতীত শুধু উত্তম গুণাবলীর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বলেন: ‘‘উত্তম চরিত্র হল অন্তরের মাঝে সহজাত ও অর্জিত একটি স্থির বৈশিষ্ট্য; যা জ্ঞানীদের নিকট প্রশংসনীয় ঐচ্ছিক আচরণের দিকে চালিত করে। যেমন: প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যাওয়া সত্ত্বেও সত্য, কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে গ্রহণ করা এবং প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে যাওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা, মন্দ ও কদর্যতাকে পরিত্যাগ করা’’।(১) মন্দ চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেন: ‘‘তা হল অন্তরের মাঝে সহজাত ও অর্জিত একটি স্থির বৈশিষ্ট্য; যা জ্ঞানীদের নিকট নিন্দনীয় ঐচ্ছিক আচরণের দিকে চালিত করে। যেমন: প্রবৃত্তি ও কমনার অনুসরণে মিথ্যা, মন্দ ও কদর্যতাকে গ্রহণ করা এবং সত্য, কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে পরিত্যাগ করা’’।(২)

বাস্তবে নিন্দিত চরিত্র মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য নয় বরং তা মানুষের ভাল বা মন্দ গ্রহণের ক্ষমতা থাকার কারণে অর্জনীয় বৈশিষ্ট্য; কেননা মানুষের ফিতরাতের মূল হল নিষ্কুলষতা। যেমনটি রাসূল সাঃ তার রবের থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: (…আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে বিচ্যুত করে দেয়।)(৩) হাদিসে বর্ণিত হুনাফা তথা একনিষ্ঠ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: মুসলিম করে, কারো মতে: পাপাচার থেকে পবিত্র করে, আবার কারো মতে: হেদায়াত কবুলের উপযুক্ত করে।(৪)

মিকদাদ ইয়ালজিন বলেন: ‘‘ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আখলাককে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে যে, আখলাক হল মানবীয় আচরণকে সুবিন্যস্তকারী কিছু নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি যাকে অহী নির্ধারণ করছে মানুষের জীবনকে সুবিন্যাস্ত করা এবং অন্যের সাথে তার সম্পর্ককে এমনভাবে নির্ধারণ করার লক্ষ্যে যেন এ বিশ্বে তার উপস্থিতির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে পারে’’।(৫)

এ সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে মিকদাদ আখলাককে সংজ্ঞায়িত করেছেন তার উৎস বিবেচনায়; যার মাধ্যমে মানবীয় আচরণ সুশৃঙ্খলিত হয়। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, মিকদাদ ইয়ালজিন আখলাক পরিভাষাকে মন্দ চরিত্র বা নিন্দিত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রয়োগকে অসম্ভব মনে করেন; কেননা ইসলামের মাঝে নিন্দিত বলে কোন কিছু নেই।

আখলাক এর কিছু প্রশংসনীয় আর কিছু নিন্দনীয়। আর উভয় প্রকার মানুষের আচরণে সমবেত হয়। এ সবগুলোর সংজ্ঞা নিম্নে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হল:

১- উত্তম চরিত্র হল: আল্লাহ প্রদত্ত মানহায অনুযায়ী ভাল উদ্দেশ্যে লালিত সমস্ত ভাল গুণ।

উপরোক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

‘সমস্ত ভাল গুণ’ শর্তের দ্বারা মন্দ গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে পরিহার করা হয়েছে।

‘ভাল উদ্দেশ্যে’ কথা দ্বারা সে সমস্ত ভাল গুণকে পরিহার করা হয়েছে যে গুলোর সাথে হারাম বা মাকরূহ নিয়ত যুক্ত হয়েছে। যেমন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা এবং সুনাম-সুখ্যাতির ইচ্ছা পোষণ করা যেন লোকেরা তাকে দানশীল হিসেবে আখ্যায়িত করে। অথবা জিহাদে বীরত্ব প্রদর্শন করা যেন লোকেরা তাকে বাহাদুর হিসেবে সম্বোধন করে।

---

(১) প্রাগুক্ত (১/১৬)।
(২) প্রাগুক্ত (১/১৬)।
(৩) সহীহ মুসলিম (৪/২১৯৭, হা: ১৩-২৮৬৫)।
(৪) নববী, শরহে মুসলিম (১৭/১৯৭)।
(৫) আত-তারবিয়াহ আল-আখলাকিয়াহ ফিল ইসলাম (পৃ: ৭৫)।

'আল্লাহ প্রদত্ত মানহায অনুযায়ী' বাক্য দ্বারা সে সমস্ত চরিত্রকে বর্জন করা হয়েছে যে সমস্ত চরিত্র নষ্ট অভিরুচী, বিকৃত চিন্তা-চেতনা এবং অন্ধ অনুসরণের প্রেক্ষিতে অনুশীলন করা হয়।

এ জন্য চারিত্রিক আচরণ সঠিক ও একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু যদি আচরণটি সঠিক হয় তবে তা খালেসভাবে আল্লাহর জন্য না হয়; তাহলে আচরণটি উত্তম বলে বিবেচিত হলেও ধারকব্যক্তি উত্তম নয় -তবে যদি তার নিয়ত ভাল হয়। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন উত্তম শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত কিন্ত এটি তার উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং নিয়তের প্রয়োজন অনুভবকারী। যেমন হাদিসে এসেছে: (একব্যক্তি নবী সাঃ এর কাছে এস বলল, একজন গনীমত লাভের জন্য, একজন প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং একজন বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরীক হল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।)[১] তিনি আরো বলেছেন: (সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব, যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ এর উদ্দেশ্যে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ এর উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিলের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে -যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।)[২]

সুতরাং আমলকারীর আমলের সওয়াব তার নেক নিয়ত অনুসারে হয়ে থাকে এবং তার আমলের শাস্তিও তার নষ্ট নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। কাজেই কারো নিয়ত যদি মুবাহ পর্যায়ের হয় তাহলে তার আমলটিও মুবাহ হিসেবে গণ্য হবে; ফলে সে কোন সওয়াব বা শাস্তি লাভ করবে না। সুতরাং আমল নেক বা ফাসেদ বা মুবাহ হওয়াটা নির্ভর করে আমলটিল নিয়তের উপর।[৩]

২-মন্দ চরিত্র হল: আল্লাহর মানহাযের বাইরে লালিত সমস্ত গুণ।

উপরোক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

'সমস্ত গুণ' শব্দযুগল নিঃশর্তভাবে সমস্ত মন্দ চরিত্র এবং নেক-নিয়ত হীন উত্তম চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর 'আল্লাহর মানহাযের বাইরে' বাক্যংশ দ্বারা সে সকল গুণাবলী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না যেগুলোকে শরীয়ত স্বীকৃতি দিয়েছে বা পালন করতে নির্দেশ দিয়েছে।

৩- চারিত্রিক আচরণ হল: সে সকল গুণাবলী যেগুলোকে একজন ব্যক্তি নিজের মাঝে অথবা অন্যের সাথে আচরণে ধারণ করে এবং তা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে; চাই সে সকল গুণাবলী সহজাত বা অর্জনীয় হোক, নন্দিত বা নিন্দনীয় হোক।

উপরোক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

---

(১) সহীহ বুখারী (২/৩০৯, হা: ২৮১০), সহীহ মুসলিম (৩/১৫১২-১৫১৩, হা: ১৪৯-১৯০৪)।
(২) সহীহ বুখারী (১/১৩, হা: ১), সহীহ মুসলিম (৩/১৫১৫-১৫১৬, হা: ১৫৫-১৯০৭)।
(৩) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম।

‘সে সকল গুণাবলী যেগুলোকে একজন ব্যক্তি ধারণ করে’ বাক্য দ্বারা মানুষের সে সকল বৈশিষ্ট্যকে পরিহার করা হয়েছে যেগুলোকে মানুষ কম অনুশীলন করে। ফলে কম অনুলীলনের কারণে সে গুলোকে সহজাত চরিত্র বলা যায় না।

‘নিজের মাঝে’ শর্ত দ্বারা কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে যা ব্যক্তির মাঝে থাকে কিন্তু অন্যের সাথে আচার-ব্যবহারে সে বৈশিষ্ট্যের সরাসরি কোন প্রভাব থাকে না। যেমন: সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং দেহের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা।

‘অথবা অন্যের সাথে’ শর্ত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, চারিত্রিক গুণাবলীর দু’টি দিক রয়েছে। একটি ব্যক্তিগত দিক, আরেকটি সামাজিক দিক। আর চারিত্রিক আচরণ উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

‘তা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে’ শর্ত দ্বারা সে চরিত্রকে পরিহার করা হয়েছে যে চরিত্রটি ব্যক্তির মাঝে অপ্রতুল বা কম দেখা যায়। যেমন: যে ব্যক্তি দানশীল হিসেবে পরিচিত, তার থেকে যদি কখনো বিপরীত চরিত্র প্রকাশ পায় তাহলে সেটিকে বিরল হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এর জন্য তাকে কৃপণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না।

‘চাই সে সকল গুণাবলী সহজাত বা অর্জনীয় হোক’ বাক্য দ্বারা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, চারিত্রিক গুণাবলীর কিছু অংশ সহজাত আর কিছু অংশ অর্জনীয়।

‘নন্দিত বা নিন্দনীয় হোক’ উক্তি দ্বারা বুঝান হয়েছে যে চারিত্রিক আচরণের কিছু অংশ প্রশংসনীয়; ফলে বল যায় যে, অমুক প্রশংসনীয় আচরণের অধিকারী। আর কিছু অংশ নিন্দনীয় ফলে বলা যায় যে, অমুক নিন্দনীয় আচরণের অধিকারী।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চরিত্রের কিছু অংশ প্রশংসনীয় আর কিছু অংশ নিন্দনীয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি প্রশংসনীয় চরিত্র ধারণ করে তাহলে তার চরিত্রটি তখনই উত্তম বলে বিবেচিত হবে যখন তার সাথে নেক নিয়ত যুক্ত হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অপ্রতুলভাবে মন্দ চরিত্র ধারণ করে তাহলে তাকে ঐ চরিত্র দিয়ে চিত্রিত করা হবে না; কেননা এটি তার স্বভাবসূলভ চরিত্র নয়। যদিও তার এ মন্দ চরিত্রের কারণে তাকে তিরস্কৃত করা হয় বা কখনো জবাবদিহি করা হয়; যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইন শা আল্লাহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শিষ্টাচার সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ

‘যাবেত’ বা নীতিমালার সংজ্ঞা:

‘যবত’ শব্দের অর্থ হল: কোন কিছুর সাথে লেগে থাকা ও তাকে আবদ্ধ করা। আর কোন কিছুকে আয়ত্ব করা হল তা দৃঢ়তার সাথে সংরক্ষণ করা।(১)

সুতরাং ‘যাবেত’ বা নীতিমালা অর্থ হল, যে কোন কিছুকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজের শর্তাধীন করে রাখে।

আর শিষ্টাচার সম্পর্কিত নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানবীয় আচরণের সীমানির্ধারণী ও শর্তারোপকারী নীতিসমূহ।

নীতিমালার প্রকারভেদ:

এই বিষয়ে এবং এর অনুরূপ বিষয়গুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশ মনোযোগের দাবী রাখে তা হল, এর উৎস, শাখা-প্রশাখা এবং এটি বোঝার পদ্ধতির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা; যাতে এর অন্বেষণকারীগণ অদূরদর্শীতার গোলকধাঁধা থেকে দূরে থাকতে পারে। ফলে যা শিষ্টাচারের অংশ নয় তাকে সে শিষ্টাচারের অন্তরর্ভুক্ত করবে না এবং যা তার অন্তর্ভুক্ত তাকে সে খারিজ করে দিবে না।

এই বিষয়টির জন্য এমন নীতিমালা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যে নীতিমালার ছায়ায় এটি চলমান; যাতে এটি বিপথগামী হয়ে ধ্বংস হয়ে না যায়। আর এই নীতিমালগুলো তিনটি পয়েন্টে সুনির্দিষ্ট করা যায়:

১- শরয়ী নীতিমালা।

২- উরফ বা প্রথাগত নীতিমালা।

৩- মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালা।

প্রথমত: শরয়ী নীতিমালা:

শরয়ী নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন ও সুন্নাহর সে সব দলীল যার দাবীর আলোকে সম্বোধিত ব্যক্তি কাজে বা কথায় সম্পাদন করতে বা বর্জন করতে বাধ্য। আর এটি পাঁচভাবে হয়ে থাকে:(২)

১- হারাম আচরণসমূহ:

(১) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (৭/৩৪০)।
(২) দেখুন: আল-জুয়াইনী, আল-ওরাকাত (পৃ: ৮), আল-ফাতুহী, আল-কাওকাবুল মুনীর (১০৫-১৩৪), মুহাম্মাদ আশ-শানক্বিতী, মুযাক্কেরাতু উসূলুল ফিকহ (পৃ: ২৫)।

আর তা হল ঐ সকল মৌখিক ও আমলগত আচরণ যা থেকে শরীয়ত প্রণেতা হারামের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন: কথায় বা কাজে মাতাপিতার অবাধ্যাচরণ অথবা মিথ্যা বলা, অন্যায় করা এবং জুলুম করা।

এর অন্তর্ভুক্ত হবে প্রজ্ঞাবান শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশের বিপরীত কর্ম সম্পাদন করা এবং ওয়াজীবের ভঙ্গিতে শরীয়ত প্রণেতা যা করতে নির্দেশ দিয়েছে তা সম্পাদন না করা।

২- মাকরূহ আচরণসমূহ:

সে সকল মৌখিক ও আমলগত আচরণ যা থেকে শরীয়ত প্রণেতা মাকরূহ তথা অপছন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষেধ করেছেন। আর তা বর্জন করা সম্পাদন করার চেয়ে উত্তম। এ পরিভাষাটি কখনো বারণকৃত বিষয়ে এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। ফলে এটি সম্পাদন করার সাথে শাস্তি সম্পর্কযুক্ত নয়।[১] যেমনঃ বাম হাতে গ্রহণ করা এবং বাম হাত দিয়ে কোন কিছু প্রদান করা।

৩- ওয়াজীব আচরণসমূহ:

যে সকল মৌখিক ও আমলগত আচরণ এর বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতা ওয়াজীবের দৃষ্টিকোণ থেকে পালনের আদেশ করেছেন। যেমনঃ মাতাপিতার সাথে সদাচার, সত্য কথা বলা, ওয়াজীব বিধান পালনে ধৈর্য ধারণ করা, আমানত বুঝিয়ে দেয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

৪- মুস্তাহাব আচরণসমূহ:

যে সকল মৌখিক ও আমলগত আচরণ এর বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতা মুস্তাহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে তা পরিত্যাগ করার কারণে কোন শাস্তি নেই; তবে তা পালন করলে সওয়াব রয়েছে। যেমনঃ ডান হাত দ্বারা কোন কিছু গ্রহণ করা।

৫- মুবাহ আচরণসমূহ:

যে সকল মৌখিক ও আমলগত আচরণ এর সাথে কোন আদেশ ও নিষেধের সম্পর্ক নেই। যেমন: মেহমানদের সামনে খাবার পরিবেশনের পদ্ধতি এবং পেশকৃত খাবারের প্রকার।

সুতরাং যদি মুবাহ কর্মের সাথে হারাম অথবা মাকরূহ যুক্ত হয়ে যায় তখন তার বিধান সে অনুযায়ী হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে মেহমানদারির পদ্ধতির সাথে হারাম বা মাকরূহ বিষয় যুক্ত হওয়া; যেমনঃ অপচয়। অথবা মুবাহ কর্মের সাথে ওয়াজীব বা মুস্তাহাব বিষয় যুক্ত হলে তখন তার বিধান তদানুসারে হবে। যেমনঃ রাস্তায় বসলে চোখ অবনত রাখা, কষ্ট না দেয়া এবং সালামের জওয়াব দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত: উরফ বা প্রথাগত নীতিমালা:

(১) মুহাম্মাদ আশ-শানক্বিতী, মুযাক্কেরাতু উসূলুল ফিকহ (পৃ: ২৫)।

উরফ বা প্রথাগত নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষ যে সকল মুবাহ বিষয় সম্পাদন বা পরিহারে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, পরিহার বা সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের প্রথার বিরোধীতাকে সমাজের স্বীকৃত আদব এর লঙ্ঘন হিসেবে দেখে।

উরফ বা প্রথার মূল শরীয়তে স্বীকৃত। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে: (মুসলিমগণ যেটাকে ভালো মনে করেন সেটা আল্লাহর নিকট ভালো। আর তারা যেটাকে মন্দ মনে করেন সেটা আল্লাহর নিকট মন্দ।)[১]

অভ্যাস ও প্রথার গুরুত্ব হল এই যে, ইসলামী ফিকহে অনেক মাসয়ালা এর উপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে কিছু আচরণগত দিকের সাথে সম্পৃক্ত; যেমন: কারিগরদের কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক রীতি, মৌখিক সম্মতি ছাড়াই মেহমানের জন্য পেশকৃত খাবার থেকে খাওয়া, প্রতিযোগিতা ও কুস্তিতে এবং পতিত ফল গ্রহণের ক্ষেত্রে পালনীয় রীতি। আর ব্যক্তি মালিকানাধীন নালা ও খাল থেকে নিজে পানি পান ও পশুকে পান করানোর ক্ষেত্রে মৌখিক অনুমতি বিবেচ্য বিষয়।[২]

অনুরূপভাবে মানুষেরা পারস্পরিক যে রীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ের পর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া এবং অবস্থা বিবেচনায় বাসায় নিমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী ও মেহমানের সম্মানার্থে এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর মেহমানকে আমন্ত্রণ করা অথবা গাড়ি ড্রাইভিং এর অনাবশ্যক এমন বিশেষ আদব যা পরিহারে কোন ক্ষতি নেই।

সামাজিক আদব ক্ষেত্র অনুযায়ী হয়ে থাকে, এজন্য আমরা বিভিন্ন রীতি প্রত্যক্ষ করে থাকি; যেমন: আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, বাণিজ্যিক রীতিনীতি, প্রশাসনিক রীতি, কর্মচারী নীতি এবং পারিবারিক রীতি। এ সকল নানাবিধ রীতিনীতি সরকার আরোপ করেনি বরং বাস্তবে চর্চার মাধ্যমে সে নিজেই আরোপ করেছে।[৩]

সামাজিক প্রথা শর্তহীনভাবে আবশ্যিক স্বভাব-চরিত্র নয় বরং তার জন্য শর্ত রয়েছে। নতুবা সামাজিক প্রথার ছদ্মাবরণে ইসলামী শিষ্টাচারের মাঝে তার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় অনুপ্রবেশ করবে। নিম্নে উরফ বা সামাজিক প্রথার শর্তসমূহ সংক্ষেপে পেশ করা হল:[৪]

১- অভ্যাস এবং প্রথাটি বহুলপ্রচলিত হওয়া।

২- আচরণের ক্ষেত্রে যে প্রথাটি মধ্যস্থতাকারী হবে তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অর্থাৎ প্রথাটি আচরণের সময়ের পূর্বেই যেন ঘটে, তারপর তার সময়ের সাথে চলতে থাকে এবং তার সাথে তুলনা করা হয়। চাই আচরণটি মৌখিক বা কর্মগত হোক।

৩- উরফ বা প্রথা যেন প্রমাণিত দলীল বা শরীয়ার অকাট্য মূলনীতির বিপরীত না হয়। অর্থাৎ সেটি যেন শরয়ী দলীল এবং ফিকহী ইজমার বিপরীত না হয়।

৪- উরফ বা প্রথাকে বিবেচনা করা হবে না এবং সেটি দলীল হিসেবে গৃহিত হবে না যদি সেটি মানুষের অভ্যস্ততার বা জানাশোনার বিপরীত হয়।

স্থায়ী ও পরবর্তনশীল অভ্যাস:

---

(১) মুসনাদে আহমাদ (১/৩৭৯)।
(২) সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের (পৃ: ৯০)।
(৩) আব্দুর রহমান আল-কাসেম, নাযরিয়্যাতুল উরফ (পৃ: ১৭)।
(৪) প্রাগুক্ত (পৃ: ৩৮৩৯)।

অভ্যাস স্থায়িত্ব ও পরবর্তনশীলতার দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত:[১]

১- স্থায়ী অভ্যাস:

স্থায়ী অভ্যাস বলেতে বুঝায় যে সকল অভ্যাস অপরিবর্তনীয়। যেমন খাদ্য, পানীয়, মর্যাদা, দেখা, কথা বলা, বলপ্রয়োগ এবং হাঁটার আসক্তির উপস্থিতি। সুতরাং এটা যদি এমন কার্যসম্পাদনের কারণ হয় যে বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতা ফায়সালা দিয়েছেন; তাহলে তা বিবেচনা করতে, তার উপর নির্ভর করতে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা করতে কোন সমস্যা নেই। যেমন: মহান শরীয়ত প্রণেতা উদ্ধতভাবে চলাচল করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ অর্থ: [যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।][২]

২-পরিবর্তনশীল অভ্যাস:

পরিবর্তনশীল অভ্যাসের কতগুলো ভালো থেকে মন্দের দিকে পরিবর্তিত হয় আর কতগুলো মন্দ থেকে ভালোর দিকে পরিবর্তিত হয়। আর মন্দ সবসময় পরিতাজ্য; কেননা এটি সত্য শরীয়া ও সুস্থ মস্তিষ্কের সাথে সাংঘর্ষিক।

আরেক দিক থেকে, একটি অভ্যাস কখনো কোন সম্প্রদায়ে নিকট উত্তম চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে আবার ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট তা নাও হতে পারে। ইমাম শাতেবী রহিঃ বলেন: "যেমন মাথা খোলা রাখা। এটির বিধান দেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পূবের দেশগুলোতে মাথা উন্মুক্ত রাখা ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের জন্য মন্দ বিষয়। তবে মাগরেবী অঞ্চলের দেশগুলোতে মন্দ বিষয় নয়। কাজেই মাথা উন্মুক্ত রাখা পূবের দেশগুলোর বাসিন্দাদের নিকট ব্যক্তির আদালতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে কিন্তু মাগরেবী অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিকট এটি প্রশ্নবিদ্ধকারী নয়"।[৩]

আবার কখনো অভ্যাসের ভালো মন্দ যুগ অনুযায়ী পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমানে অধিকাংশ আরব উপদ্বীপের পছন্দনীয় পোশাক – জুব্বা ও গুতরা- এবং তার অধিবাসীদের মধ্য হতে কারো পক্ষ থেকে উক্ত পোশাকের বিপরীত পোশাক পরিধান করা তাদের নিকট অপছন্দনীয়। কখনো এরূপ আচরণকে নিজস্ব অভ্যাস-সংস্কৃতির বিপরীত ভিন্ন পোশাক পরিধানকারীর আদলতের ক্ষেত্রে মন্দ দিক বিবেচনা করা হয়।

তৃতীয়ত: মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালা:

এটি হল, যে বিষয়ে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি এমন বিষয়ে ব্যক্তির মৌখিক ও কর্মগত আচরণ গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি। রাসূল সাঃ বলেছেন: (পূণ্য হল উত্তম চরিত্র। আর পাপ হল যা তোমার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।)[৪] ওয়াবিসা বিন মা'বাদ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমি রাসূল সাঃ এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন: তুমি আমাকে পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার

---

(১) আশ-শাতেবী, আল-মুয়াফাকাত (২/১৯৮)।
(২) সূরা লুকমান: (১৮)।
(৩) আশ-শাতেবী, আল-মুয়াফাকাত (২/১৯৮)।
(৪) সহীহ মুসলিম (৪/১৯৮০, হা: ১৪-২৫৫৩)।

নফস যে বিষয়ে প্রশান্তি লাভ করে, তোমার হৃদয় যে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়; তা-ই হল পূণ্য। আর তোমার মন যে বিষয়ে চিন্তিত হয়, তোমার অন্তরে যা দ্বিধা সঞ্চার করে; তা-ই হল পাপ। লোকেরা যদি তোমাকে কোন সিদ্ধান্ত দেয়, তবে তুমি তা গ্রহণ করবে।)[১]

এ দু'টি হাদিসে এমন বিষয় রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সত্যের প্রতি ভালোবাসা, তার প্রতি প্রশান্তি ও তা গ্রহণ করে নেয়ার সহজাত বৈশিষ্ট্যের উপর সৃষ্টি করেছেন এবং সত্যের প্রতি ভালোবাসা ও অসত্যকে ঘৃণা করা বান্দাদের স্বভাব-চরিত্রে গেঁথে দিয়েছেন।[২] রাসূল সাঃ বলেছেন: (প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।) [৩] রাসূল সাঃ হাদিসে কুদসীতে তার রবের থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ বলেন: (আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে বিচ্যুত করে দেয়।)[৪]

ইবনে তাইমিয়া রহিঃ বলেন: "অতএব জানা গেল যে, মানুষের ফিতরাতে এমন শক্তি রয়েছে যা সত্যে বিশ্বাস এবং উপকারী ইচ্ছার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে"।[৫] তিনি আরো বলেন: "অন্তরে এমন কিছু রয়েছে যা বিশ্বাস ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে বাতিলের উপর হকের অগ্রাধিকারকে অবধারিত করে। আর এটিই যথেষ্ট যে, অন্তর ফিতরাতের উপর সৃষ্ট"।[৬] সুতরাং মুমিন ব্যক্তি বুদ্ধিমান এবং সচেতন; সে তার নিষ্কলুষ ফিতরাত ও সঠিক গড়ে উঠার মাধ্যমে বুঝতে পারে যা একজন ফাসেক ব্যক্তি পারে না। "হক ও বাতিল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মুমিনের নিকট সংশয়পূর্ণ হয় না; বরং সে তার নিকট অবস্থিত নূরের সাহায্যে হককে চিনতে পারে এবং তার হৃদয় তা গ্রহণ করে নেয়। আর সে বাতিল থেকে পালিয়ে যায় এবং তা সে চিনতে পারে না"।[৭]

আর মুমিন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যে সব বিষয়ের সম্মুখীন হয় তা নিম্নোক্ত রূপে হয়ে থাকে:

যে বিষয়ে শরয়ী দলীল বা ইজমা রয়েছে; সে ক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তির করণীয় হল আল্লাহর আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا﴾ অর্থ: [আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।][৮] সুতরাং তার জন্য করণীয় হল প্রশস্ত ও সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নেয়া।

আর যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ থেকে কোন দলীল নেই এবং অনুসরণীয় সাহাবী ও উম্মতের পূর্বসূরীদের থেকে কোন বক্তব্য নেই; এমন বিষয়ে কোন সন্দেহ-সংশয় যদি ঈমানে প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী, জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলোয় উন্মুক্ত বক্ষসম্পন্ন মুমিনের অন্তরে প্রবেশ করে এবং কোন সংশয়ের প্রেক্ষিতে তার

(১) মুসনাদে আহমাদ (৪/২৮৮), সুনানে দারেমী (২/২৪৫-২৪৬), মুসনাদে আবু ইয়ালা (১৫৮৬), মুজামুল কাবীর; তাবারানী (২২/৪০৩)।
(২) দেখুন: ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম।
(৩) সহীহ বুখারী (১/৪২৪, হা: ৪/২০৪৭), সহীহ মুসলিম (৪/২০৪৭, হা: ২২-২৬৫৮)।
(৪) সহীহ মুসলিম (৪/২১৯৭, হা: ১৩-২৮৬৫)।
(৫) দারউ তাআরুদিল আকলি ওয়ান নাক্বলি।
(৬) প্রাগুক্ত।
(৭) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম।
(৮) সূরা আল-আহযাব: (৩৬)।

হৃদয়ে যদি দ্বিধা সঞ্চারিত হয়; আর এমতাবস্থায় সে যদি ছাড়ের বিষয়ে রায়পন্থী, জ্ঞান ও দ্বীনদারিতায় অনির্ভরযোগ্য এবং প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি ব্যতীত ফাতওয়া নেয়ার জন্য কাউকে না পায় -তাহলে সে তার হৃদয়ে সঞ্চারিত দ্বিধার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং দ্বিধান্বিত বিষয় পরিহার করবে। যদিও ঐ সকল মুফতিগণ বৈধতার ফাতওয়া দেয়। এমন বিষয়ে ইমাম আহমদ রহিঃ বক্তব্য রয়েছে।[১]

এমন পরিস্থিতিতে মুমিন ব্যক্তি তার হৃদয়ের দ্বিধার দিকে দৃষ্টি দিবে। হৃদয়ের যে কোন ধরণের সংকোচ থাকে ও তার প্রতি হৃদয় যদি প্রফুল্ল না থাকে এবং হৃদয়ে যদি উক্ত সংকোচ কেন্দ্রিক সন্দেহ ও পাপের ভয় সৃষ্টি হয়; তাহলে সংকোচিত ও দ্বিধান্বিত বিষয় পরিহার করবে। আর এই পরিহার করাটি কোন শরয়ী দলীলের প্রেক্ষিতে নয় তবে তা দ্বিধা, হৃদয়ে সন্দেহ এবং পাপের ভয়ের কারণে। সুতরাং একজন মুসলিমের আচরণের জন্য এটি একটি চারিত্রিক মূলনীতি।

ইমাম ইবনু রজব রহিঃ বলেন: ‘‘ওয়াবিসার হাদিস এবং তার সমার্থক হাদিস প্রমাণ করছে যে, সন্দেহ-সংশয়ের ক্ষেত্রে হৃদয় যে দিকে স্বস্তি অনুভব করে তাই সৎকর্ম ও হালাল। আর এর বিপরীত হল পাপ’’।[২]

আর এটি সূফীদের ওয়াসওয়াসা ও হৃদয়ের চিন্তা নয়; তথা এ বিষয়ে তাদের কথা শরয়ী দলীল নির্ভর নয়। বরং তা শুধুমাত্র তাদের মতামত ও অভিরুচী। পক্ষান্তরে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে হৃদয়ের দিকে প্রত্যবর্তন করা নববী দলীল ও সাহাবীদের ফাতওয়া দ্বারা প্রমাণিত।[৩]

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আর তা হল, হৃদয়ে যা নিয়ে দ্বিধার সঞ্চার হয় তা মানুষ জেনে যাওয়াকে অপছন্দ করা; যদি সে দ্বিধাকে কথা বা কাজে প্রকাশ করা হয়। কেননা মুসলিমগণ মন্দকে ভালো মনে করা বা ভালোকে মন্দ করার বিষয়ে একমত হয় না। ইবনু মাসউদ রাঃ বলেন: (মুমিনেরা যেটাকে ভালো মনে করেন সেটা আল্লাহর নিকট ভালো। আর তারা যেটাকে মন্দ মনে করেন সেটা আল্লাহর নিকট মন্দ।)[৪] এটি আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক মূলনীতি। এ প্রেক্ষিতে বল যায় যে, মনস্তাত্ত্বিক মূলনীতি দু’টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ:

১- হৃদয়ে দ্বিধার সঞ্চার হওয়া এবং অন্তর তার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া ও ঐ বিষয়ে সন্দেহ এবং পাপের ভয় সৃষ্টি হওয়া।

২- মানুষেরা বিষয়টি জেনে যাক; ভয় ও লজ্জাবশত এটি অপছন্দ করা।

---

(১) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (পৃ: ২৪০)।
(২) প্রাগুক্ত (পৃ: ২৪০)।
(৩) প্রাগুক্ত (পৃ: ২৪১)।
(৪) মুসনাদে আহমাদ (৪/২৮৮), মুজামুল কাবীর; তাবারানী (২২/৪০৩), আল-হাইছামী মাজমাউজ জাওয়য়েদ গ্রন্থে (১/১৭৭-১৭৮) বলেছেন: ইমাম আহমাদ, বাযযার, তাবারানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসের রাবীগণ ছিকাহ। ইমাম হাকেম মুস্তাদরাকে বলেছেন: হাদিসটির সনদ সহীহ তবে বুখারী ও মুসলিম তাদের গ্রন্থে সংকলন করেন নি। ইমাম যাহাবী তালখীল গ্রন্থে (৩/৭৮-৭৯) উক্ত মতের সাথে সম্মতি প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখা

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার সংজ্ঞা:

আরবি (الحد) অর্থ হল: দু'টি বস্তুর মাঝের সেই প্রতিবন্ধক যা একটিকে অপরটির সাথে মিশে যেতে বাধা দেয়।

আর কোন বিষয়ের সংজ্ঞা হল: সে বৈশিষ্ট্য যা তার সমার্থক বিষয়কে ধারণ করে এবং অন্যদের থেকে তাকে পৃথক করে।(১)

আখলাকের সংজ্ঞা হল: যে বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ভাল-মন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। যেমন: বীরত্ব; এটি একটি উন্নত চারিত্রিক গুণ। এ গুণের অধিকারী ব্যক্তি যদি বীরত্বের বৃত্তের বাইরে গিয়ে উচ্চতার দিকে থেকে তার সীমা অতিক্রম করে; তাহলে এ আচরণকে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যদি বীরত্বের সীমা থেকে নিচে চলে যায়, আত্মগোপন করে এবং করণীয় দায়িত্ব থেকে সরে পড়ে; তাহলে এটিকে কাপুরুষত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বীরত্ব প্রদর্শনে সীমা অতিক্রমের বৈশিষ্ট্যকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে বিবেচনা করা হয়। বিপরীতে বীরত্ব প্রদর্শনে অবহেলার বৈশিষ্ট্যকে কাপুরুষতা হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যদি বীরত্বের বৈশিষ্ট্যের সীমার মাঝে থাকা হয় তাহলে তাকে বীরত্ব হিসেবে নামকরণ করা হয়। এ নিয়মের উপরে বীরত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য গুণাবলীকে অনুমান করতে হবে।

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার গুরুত্ব:

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার গুরুত্ব দু'টি দিক থেকে প্রতিভাত হয়; যথা: স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার স্বয়ং একটি জ্ঞান এবং এ সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব। নিম্নে বিষয়টির স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হল:

জ্ঞানগুলোর মধ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞানটি ভালভাবে অনুধাবন করা উচিৎ তা হল আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত আল্লাহর শরীয়তের সীমারেখার শুরু ও শেষ সম্পর্কিত জ্ঞান; যেন তা কেউ অতিক্রম না করে এবং তা পালনে ত্রুটি না করে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করছেন এবং অন্যত্র সীমার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ অর্থ: [এ সব আল্লাহর সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লংঘন করো

(১) রাগেব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত (পৃ: ১০৯)।

না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম।][১] তিনি আরো বলেন: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ অর্থ: [এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ে না।][২]

এক আয়াতে তিনি সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন আর অন্যত্র তিনি সীমার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। আর তা এ জন্য যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা হল হালাল ও হারামের মাঝে পৃথককারী শেষ সীমা। কোন জিনিসের শেষ সীমা কখনো তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার হুকুম ধারণ করে। আবার কখনো কোন জিনিসের শেষ সীমা তার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে তার বিপরীত জিনিসের হুকুম ধারণ করে। প্রথম অবস্থার বিবেচনায় সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দিক বিবেচনায় সীমার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

স্বভাব-চরিত্র হল মানুষের অভ্যন্তরীণ চিত্র এবং সে যে তাকওয়া, ঈমান, ভীতি, দুর্বলতা ও অজ্ঞতা ধারণ করে তার প্রকৃত প্রকাশ। স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান লাভ করা উচিৎ; যেন সে তাতে অবহেলা না করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে বিপরীতে চলে না যায়।

জ্ঞানগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপকারী জ্ঞান হল সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান। বিশেষত শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত বিধিবিধানের জ্ঞান। সুতরাং মানুষের মাঝে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী হল সেই ব্যক্তি যে সীমারেখা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানে; যেন সে তাতে এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত না করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এমন কিছুকে তার থেকে বাদ না দেয় যা তার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সবচেয়ে মধ্যপন্থী হল সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্বভাব-চরিত্র এবং শরয়ী বিধিবিধানের সীমারেখা মেনে চলে জ্ঞানগত ও কর্মগত দিক দিয়ে।[৪]

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার প্রকারভেদ:

১- সাধারণ সীমারেখা:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সে সকল সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা যেগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব এবং যে গুলোর উপর সকল মৌখিক ও কর্মগত আখলাক পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ, সাধারণ সীমারেখা হল এমন সামগ্রিক নীতিমালা যা উত্তম চরিত্র ও মন্দ চরিত্রের সীমা নির্ধারণ করে। আর এটি চারটি কায়দা বা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

প্রথম মূলনীতি:

উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার উপর উত্তম চরিত্রের বিধান আরোপ করা হবে না। যেমন: চাটুকারিতাকে সৌজন্যমূলক আচরণের অন্তর্ভুক্ত করা এ যুক্তিতে যে, এটা পারস্পরিক আচরণের অন্যতম একটি উত্তম গুণ। অথচ মুদাহানা তথা চাটুকারিতার ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন: চাটুকারিতা

---

(১) সূরা আল-বাকারা: (২২৯)।
(২) সূরা আল-বাকারা: (১৮৭)।
(৩) ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মুহাজের (পৃ: ৩৭)।
(৪) ইবনুল কায়্যিম, আল-ফাওয়ায়েদ (পৃ: ১৫৮)।

হল ফাসেক ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং তার কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ; তাকে কোন ধরণের নিষেধ করা ছাড়াই।[১]

দ্বিতীয় মূলনীতি:

উত্তম চরিত্রের মধ্য থেকে তার কোন একককে বাদ দেয়া যাবে না এবং তার মূল বিধান বাতিল করে বিপরীতধর্মী বিধান দেয়া যাবে না। যেমন: লজ্জাশীলতার মধ্য হতে তার কিছু প্রকারকে বাদ দেয়া। উদাহরণত: অপরিচিত পুরুষের সাথে নারীর মুসাফাহা করা এবং বলা যে, এটি লজ্জাশীলতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এটি উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এ উদাহরণে লজ্জাশীলতার কিছু প্রকারকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং তার মূল নিষিদ্ধের বিধানকে বাতিল করে তাকে বৈধতার বিধান দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় মূলনীতি:

মন্দ চরিত্রের মাঝে এমন কিছু প্রবেশ করান যাবে না যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়; অতঃপর তার উপর মন্দ চরিত্রের বিধান আরোপ করা হবে। যেমন: সৌজন্যমূলক আচরণকে মন্দ আচরণের অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ আচরণকারীকে চাটুকার বলা।

অথচ সৌজন্যমূলক আচরণ মুমিনদের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হল মানুষের সামনে বিনয়ের প্রকাশ, নম্র ভাষায় কথা বলা এবং কর্কশ ভাষা পরিহার করা। কেননা এগুলো মিল-মহাব্বতের শক্তিশালী মাধ্যম। আর সৌজন্যমূলক বা কোমল আচরণের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে; যেমন: শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে জাহেল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে ফাসেকের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা; যাতে সে তার অবস্থার উপর অবিচল না থাকে। তাকে নম্র ভাষায় নিষেধ করা বিশেষত যখন তার মিল-মহাব্বত কামনা করা হয়, ইত্যাদি।[২]

চতুর্থত মূলনীতি:

মন্দ চরিত্রের মধ্য থেকে তার কোন একককে বাদ দেয়া যাবে না এবং তার মূল বিধান বাতিল করে বিপরীতধর্মী বিধান আরোপ করা যাবে না। যেমন: নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে মন্দ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত গণ্য না করা। অতঃপর এটির অবৈধ হওয়ার বিধানকে বৈধতার বিধান দিয়ে পরিবর্তন করা এবং এটিকে চারিত্রিক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা।

২- বিশেষ সীমারেখা:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রতিটি চরিত্র বা গুণের জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা। অর্থাৎ এটি বিশেষ নীতিমালার সমষ্টি যা চারিত্রিক গুণাবলীর সকল এককের পরিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(১) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৫২৮)।
(২) প্রাগুক্ত (১০/৫২৮-৫২৯)।

যেমন প্রতিটি চারিত্রিক গুণাবলীর নির্দিষ্ট পরিধি রয়েছে, যখন কোন ব্যক্তি তা অতিক্রম করে বা তাতে ত্রুটি করে; তখন সে তা পালনে ব্যর্থ হয়। আর যেহেতু চারিত্রিক গুণাবলী অসংখ্য তাই তার কিছু উদাহরণ পেশ করা যায় এবং সেগুলোর উপর অন্যগুলো অনুমান করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম রহিঃ কিছু চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি ইশারা করেছেন; আর তা হল:[১]

ক্রোধ: আর তার সীমা হল প্রশংসনীয় বীরত্ব এবং মন্দ চরিত্র ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করা। এখন যদি কেউ এর সীমা অতিক্রম করে তাহলে সে সীমালঙ্ঘন করল, আর যদি কেউ এতে ত্রুটি করে তাহলে কাপুরুষতা করল এবং মন্দ চরিত্র পরিহার করল না।

লালসা: লালসার সীমা হল পার্থিব বিষয়ে পর্যাপ্ততা এবং যথেষ্টতা অর্জন করা। যখন তা থেকে কম হয় তখন তা অপমান হিসেবে গণ্য হয় আর যখন তার থেকে বেশি হয় তখন তা লোলুপতা ও অপ্রশংসনীয় বিষয়ে আগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঈর্ষা বা হিংসা: হিংসার সীমা হল পরিপূর্ণতা অর্জনে প্রতিযোগিতা করা এবং তার সমকক্ষ ব্যক্তি তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা। তাই যখন সে এটা অতিক্রম করে তখন সে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করে, নেয়ামতপ্রাপ্তের থেকে নেয়ামত বিলুপ্তির কামনা করে এবং তাকে কষ্ট দিতে উদগ্রীব থাকে। আর যখন তা থেকে কমে যায় তখন এটি দুর্বল হিম্মত ও মনের ক্ষুদ্রতা বলে বিবেচিত হয়।

কামনা-বাসনা: কামনার সীমা হল ইবাদতের পরিশ্রম থেকে মন-মস্তিষ্ককে স্বস্তি প্রদান, উত্তম গুণাবলী অর্জন এবং সেগুলো পূরণ করার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা। যখন এটি সীমা অতিক্রম করে তখন কামাসক্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং এর অধিকারী ব্যক্তি জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে যায়। আর যখন এটি হ্রাস পায় এবং পূর্ণতা ও মর্যাদা অন্বেষণে অবসর পায় না তখন তা দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অপমান হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিশ্রাম: বিশ্রামের সীমা হল ইবাদতের প্রস্তুতি ও সৎগুণ অর্জনের লক্ষ্যে অন্তর ও সঞ্চিত শক্তিকে বিশ্রাম দেয়া। যখন এটি সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ধীরতা, অলসতা ও সময়ের অপচয় বলে গণ্য হয়। আর যখন এটি হ্রাস পায় তখন সঞ্চিত শক্তির জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়।

দানশীলতা: দু'দিক থেকে দানশীলতার সীমা রয়েছে। যখন তার সীমা অতিক্রম করা হয় তখন তা অপচয় বলে বিবেচিত হয় আর যখন তার থেকে হ্রাস পায় তখন কৃপণতা ও অবহেলা বলে গণ্য হয়।

বীরত্ব: বীরত্বের সীমা অতিক্রম করাকে পাগলামি গণ্য করা হয় আর তার সীমা থেকে কমে গেলে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা বলে বিবেচনা করা হয়। আর বীরত্বের সীমা হল অগ্রসর হওয়ার জায়গায় অগ্রসর হওয়া এবং পেছানোর জায়গায় পিছিয়ে আসা।

(১) ইবনুল কায়্যিম, আল-ফাওয়ায়েদ (পৃ: ১৫৬-১৫৮)।

গায়রত বা আত্মসম্মানবোধ: যখন গায়রতের সীমা অতিক্রম করা হয় তখন তা অপবাদ ও নির্দোষের প্রতি কু-ধারণা বলে গণ্য হয়। আর যখন তা থেকে হ্রাস পায় তখন এটাকে উদাসীনতা এবং অবাধা মেলামেশার সুযোগ করে দেয়া বলে বিবেচিত হয়।

বিনয়: বিনয়ের সীমা যখন অতিক্রম করা হয় তখন সেটি অপদস্থতা ও অপমান হিসেবে গণ্য হয়। আর যে তা পালনে ত্রুটি করে সে অহঙ্কার ও গর্বের দিকে ধাবিত হয়।

সম্মান-মর্যাদা: যখন এর সীমা অতিক্রম করা হয় তখন তা অহঙ্কার ও মন্দ চরিত্র হিসেবে গণ্য হয় আর যখন হ্রাস পায় তখন অপমান হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইবনু হাযম রহিঃ কিছু উত্তম গুণাবলীর সীমা উল্লেখ করেছেন; তন্মধ্যে:[১]

সচ্চরিত্রতা বা পবিত্রতা: এর সীমা হল চোখ অবনত রাখা এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে হারাম বস্তু থেকে দূরে রাখা। সুতরাং এটি অতিক্রম করা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার শামিল। আর আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হালালকৃত বস্তু থেকে বিরত থাকা দুর্বলতা ও অপারগতা হিসেবে গণ্য।

ইনসাফ: এর সীমা হল নিজের পক্ষ থেকে অধিকার প্রদান করা এবং নিজেরটা গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে জুলুমের সীমা হল নিজেরটা গ্রহণ করে পরের অধিকার না দেয়া। আর মহানুভবতার সীমা হল অনুগত হয়ে নিজের পক্ষ থেকে অন্যের অধিকার প্রদান করা এবং সক্ষম অবস্থায় অন্যের কাছে থাকা নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়া।

(১) ইবনে হাযম, আল-আখলাক ওয়াস সীরাহ (পৃ: ৩১-৩২)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

চারিত্রিক আচরণের মূলনীতি

চারিত্রিক আচরণের মূলনীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে বুনিয়াদের উপর মানুষের প্রশংসনীয় আচরণ গড়ে ওঠে। আর মূলনীতি ধারণ করে বদান্যতা, নিবৃত থাকা এবং সহনশীলতাকে। যেমন এর পরিচয় দিয়েছেন হাসান আল-বসরী রহিঃ নিম্নোক্ত ভাষায়: চারিত্রিক আচরণের মূলনীতি হল চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখা, উত্তম জিনিস দান করা এবং কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।[১] ইবনুল কায়্যিম রহিঃ বলেন: তা হল বদান্যতা প্রদর্শন করা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং কষ্ট সহ্য করা।[২]

সুতরাং মানুষের আচরণ অন্যের প্রতি দানশীলতার মাধ্যমে হবে; আর এটিই হল বদান্যতা, তাদের থেকে যে দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায় তা সহ্য করা; আর এটিই হল সহনশীলতা এবং তাদের ক্ষতি করা থেকে নিজেকে নিবৃত করা; আর এটিই হল কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। এগুলোই হল উত্তম চরিত্রের মূলনীতি; এর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল:

প্রথমত: বদান্যতা প্রদর্শন করা।

বদান্যতা প্রদর্শন অর্থ হল দান করা এবং মহানুভবতা প্রদর্শন করা। বদান্যতা প্রদর্শন দুইভাবে হতে পারে, তা হল, দাবী প্রত্যাহার করা ও দান করার মাধ্যমে।

১- দাবী প্রত্যাহার দুই প্রকার:

ক. অন্যের কাছে থাকা নিজের অধিকারের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ অথবা কিছু অংশ মাফ করে দেয়া। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (পূর্বযুগে এক ব্যক্তি মানুষদের ঋণ দিত এবং তার চাকরকে বলত যে, যখন তুমি কোন পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির কাছে যাবে তাকে ক্ষমা করে দেবে। হয়ত এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে -মারা গেলে- আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।)[৩] আর এটি হল অন্যের কাছে থাকা নিজের অধিকার ক্ষমা করে দেয়ার দৃষ্টান্ত।

খ. মানুষের হাতে থাকা সম্পদকে উপেক্ষা করা। অর্থাৎ মানুষের হাতে থাকা সম্পদ চাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং নিজের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা। আর এটি উদারতার চেয়ে উত্তম। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিঃ বলেছেন: মানুষের নিকট যে সম্পদ আছে তার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা দানশীলতার চেয়ে উত্তম।[৪]

---

(১) সুনানে তিরমিযি (৪/৩১৯, হা: ২০০৫)।
(২) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩২০)।
(৩) সহীহ বুখারী (২/৮২, হা: ২০২৮), সহীহ মুসলিম (৩/১১৯৬, হা: ১৩-১৫৬২)।
(৪) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩০৩)।

তবে এটি শর্তসাপেক্ষ। সুতরাং মানুষের সম্পদের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা যদি দ্বীন, শরীর অথবা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করাটাই উত্তম। যেমন: দরিদ্র অসুস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন এমন ব্যক্তির যে তাকে ওষুধ সংগ্রহে সহায়তা করবে। চিকিৎসার অভাবে যদি তার মৃত্যু বরণের আশঙ্কা তৈরি হয় তাহলে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজীব। অনুরূপভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য এমন ব্যক্তির প্রয়োজন যে তাকে জীবন বাঁচাতে খাবার দিয়ে সহায়তা করবে। যদি খাবার না চাওয়ার কারণে তার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ অর্থ: [নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।][১]

২- দানশীলতা: আর তা হল ব্যয়ের মাধ্যমে দানশীলতা। এ প্রকারের উৎস হল:

ক. জীবন।

খ. সম্পদ।

গ. মর্যাদা-খ্যাতি।

ঙ. ইলম বা জ্ঞান।

এর বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

জীবন বা আত্মদান হল: জিহাদ, মুসলমানদের সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা এবং ডুবন্ত বা অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করার ন্যায় অগ্রাধিকারযোগ্য স্বার্থে মানুষ তার জীবনকে ঝুঁকির মাঝে ফেলে উৎসর্গ করে দেয়া। আর এটি হল সর্বোচ্চ পর্যায়ের বদান্যতা।

সে আত্মত্যাগ করে যখন কৃপণ তা আঁকড়ে থাকে….আর আত্মত্যাগই হল সর্বোচ্চ ত্যাগ।

আত্মোৎসর্গের উদাহরণ হল: হানযালা বিন আবু আমের রাঃ এর শহীদ হওয়ার ঘটনা; যিনি ওহুদের যুদ্ধে নিজের জীবনকে দান করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের আগের রাতে তিনি বাসর করছিলেন। তিনি প্রত্যুষে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে গোসল না করেই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। রাসূল সাঃ তার সম্পর্কে বলেছিলেন: (তোমাদের সাথীকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছে।)[২]

সম্পদ দ্বারা দানশীলতা হল: নেক কাজে সম্পদ ব্যয় করা। যেমন: সাদাকা, ঋণ প্রদান, দান ও উপহার প্রদান করার মাধ্যমে অভাবীদের সহায়তা করা এবং মেহমান ও প্রতিবেশীকে সম্মান করা।

আর এই প্রকারের বদান্যতা প্রশংসনীয় ও কাঙ্খিত এবং প্রতিযোগীদের এতে প্রতিযোগিতা করা বাঞ্ছনীয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: (দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবারাত্র তা তিলাওয়াত করে। অপর ব্যক্তি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে আমাকে যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, তা হলে আমিও অনুরূপ করতাম, সে যেরূপ করছে। আরেক ব্যক্তি হচ্ছে সে,

(১) সূরা আল-মায়েদা: (২)।
(২) মুস্তাদরাকে হাকেম (৩/২০৪)।

যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অপর ব্যক্তি বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, সে যা করছে।)[১]

আর এটিকে ঈর্ষা নামকরণ করা হয়েছে রূপকার্থে। উমর রাঃ আবু বকর রাঃ এর সাথে দান করাতে প্রতিযোগিতা করেছিলেন।[২]

মর্যাদার মাধ্যমে বদান্যতা হল: মানুষের নিকট ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা কাজে লাগিয়ে মানুষকে সহায়তা প্রদান করা। যেমন: অভাবী এবং মাজলুমদের অধিকার ও প্রয়োজন পুনরুদ্ধারের চেষ্টার মাধ্যমে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا﴾ অর্থ: [কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর নজর রাখেন।][৩]

ইমাম মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনু যায়েদ এবং প্রমূখগণ বলেন: মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজনে সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করা। সুতরাং যে ব্যক্তি উপকারমূলক কাজে সুপারিশ করবে সে একটি অংশ পাবে আর যে ক্ষতিকর কাজে সুপারিশ করবে তারও একটি অংশ থাকবে।[৪]

মানুষকে ইলম শিক্ষা দানের মাধ্যমে বদান্যতা: দুই ভাবে হতে পারে:[৫]

ক. প্রশ্নকারীর উত্তরে যতটুকু বলা প্রয়োজন তার চেয়ে বিশদাকারে জওয়াব দেয়া এবং তার উপকারে আসে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে বলা। উত্তরে বেশি করে বলা রাসূল সাঃ এর অনুপম চরিত্রে অন্তর্গত। যেমন রাসূল সাঃ কে যখন সাগরের পানির বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের চেয়ে বেশি উত্তর দিয়েছিলেন: (সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী হালাল।)[৬]

খ. ইলম বা জ্ঞানকে মানুষের নিকট প্রশ্নাকারে উত্থাপন করা। আর এরূপ করা রাসূল সাঃ এর বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসূল সাঃ এর বাণী থেকে এর উদাহরণ হল: (তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?...)[৭] অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ কে উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেন: (হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি আল্লাহ তায়ালার বিধিনিষেধ রক্ষা করবে তাহলে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন।)[৮]

কায়িক শ্রম দিয়ে উপকার করার মাধ্যমে বদান্যতা: যেমন কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের বোঝা বহন করে দেয়ার মাধ্যমে সহায়তা করা অথবা তার গৃহের কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিস ঠিক করে দেয়া ইত্যাদি। রাসূল সাঃ বলেছেন: (প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি

(১) সহীহ বুখারী (৪/৪১১, হা: ৭৫২৮)।
(২) সুনানে তিরমিযি (৫/৫৭৪, হা: ৩৬৭৫)।
(৩) সূরা আন-নিসা: (৮৫)।
(৪) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (৫/১৯০)।
(৫) দেখুন: ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩০৫-৩০৭)।
(৬) সুনানে আবু দাউদ (১/৬৪, হা: ৮৩)।
(৭) সহীহ মুসলিম (৪/১৯৯৭, হা: ৫৯-২৫৮১)।
(৮) সুনানে তিরমিযি (৪/৫৭৫-৫৭৬, হা: ২৫১৬), মুসনাদে আহমাদ (১/২৯৩)।

মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সাদাকা রয়েছে। প্রতিদিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদাকা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সাদাকা। ভাল কথাও সাদাকা। সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদাকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদাকা।)[১]

সময় এবং আরাম বিসর্জন দিয়ে বদান্যতা: নিজের আরাম-আয়েশ মানুষের জন্য বিসর্জন দেয়া এবং নিজের আরামের উপর অন্যদের আরামকে অগ্রাধিকার দেয়া। যেমন রোগীর সাথে রাত্রিযাপন এবং তাকে আনন্দ দেয়া। বলা হয়ে থাকে:

তিনি বদান্যতার প্রেমিক, যদি কোন আবেদনকারী তার নিকট আবেদন করে…. আপনি আমাকে আপনার চোখের ঘুম দিয়ে দিন, তবে (সে তাকে ঘুম দিয়ে দিবে) আর ঘুমাবে না।

দ্বিতীয়ত: কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা:

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি অন্যকে যে সব ক্ষেত্রে কষ্ট দেয় সে সব ক্ষেত্র থেকে নিজের কষ্ট প্রদানের উসৎগুলোকে নিবৃত্ত রাখা। আর ধরনের দিক থেকে কষ্ট প্রদানের উৎসগুলো দু'ভাগে বিভক্ত:

১- বাচিক উৎস: আর তা জবানে উচ্চারণ এবং কলমে লিখে কিছু বর্ণনা করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

২- কর্মগত উৎস: এটি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন: হাত, চোখ, কান, চোখের পাতা এবং ইশারার মাধমে হয়ে থাকে।

কষ্ট প্রদানের উৎস কথা ও কাজ যে সকল বিষয়ে আপতিত হয় এবং এর ফলে মানুষ কষ্ট পায় তা হল: দ্বীন, সম্পদ, সম্মান-সম্ভ্রম, জান এবং বুদ্ধি-বিবেক। কষ্ট প্রদানের উৎস ও কষ্ট পাওয়ার ক্ষেত্রগুলোর বিশদ আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

প্রথমত: কষ্ট প্রদানের উৎসসমূহ:

১- বাচিক উৎস:

সে সকল কষ্ট যার উৎস হল বর্ণনা; চাই তা জবানে উচ্চারণ বা আঙ্গুল দিয়ে লেখার মাধ্যমে হোক অথবা উভয়ের মাধ্যমে হোক। আর জবান হল কষ্ট প্রদানের শক্তিশালী উৎস, বিশেষত যখন তার অধিকারী জবানকে মানুষের উপর লাগামহীন করে দেয়। আর নবী সাঃ জবানের ভয়াবহতা ও তা মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে - এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নবী সাঃ মুয়াজ রাঃ কে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন: (হে মুয়াজ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। মানুষকে তাদের নিজেদের জিভঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?)[২]

তিনি বলেছেন: (নিশ্চয়ই বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কথা উচ্চারন করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেক গুন বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির

(১) সহীহ বুখারী (২/৩৫৫-৩৫৬, হা: ২৯৮৯), সহীহ মুসলিম (২/৬৯৯, হা: ৫৬-১০০৯)।
(২) মুসনাদে আহমাদ (৫/২৩৬)।

কোন কথা বলে ফেলে যার পরিনতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।)[১] তিনি আরো বলেছেন: (যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চোয়ালের মাঝের বস্ত -জিহ্বা- এবং দুই পা-র মাঝের বস্ত -লজ্জাস্থান- এর যামিন হবে আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব।)[২]

একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হল সে তার জবান দ্বারা অন্য মুসলিমদের কষ্ট প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।)[৩]

হাফেজ ইবনে হাজার রহিঃ বলেন: "জিহ্বাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, এটি হল হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশকারী। অনুরূপ হল হাত; কেননা উভয়ের দ্বারা অধিকাংশ কর্ম সম্পাদিত হয়। হাতের তুলনায় হাদিসটি জিহ্বার প্রেক্ষিতে ব্যপক অর্থবোধক। কেননা জিহ্বা দ্বারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ে কথা বলা যায়, হাতের বিপরীতে। এ ক্ষেত্রে জিহ্বার সহযোগী হতে পারে লেখনী, আর এ ক্ষেত্রে তার প্রভাব ব্যাপক!"[৪]

সুতরাং ইসলামী বিধান জিহ্বার ভয়াবহতা প্রমাণ করেছে। ফলে মানুষ নিজেকে এবং সে যাদের দায়িত্বশীল তাদেরকে তরবিয়ত প্রদান করা ব্যতীত কোন উপায় অবশিষ্ট নেই।

২- কর্মগত উৎস:

আর তা হল ঐ সকল প্রদত্ত কষ্ট যার উৎস মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; যেমন: হাত, চোখ, কান ইত্যাদি।

ক. হাত: হাত দ্বারা ক্ষতি বিরাট, তার ভয়াবহতা বিশাল; যেহেতু এটা হত্যা, মারপিট এবং চুরি করার একটি মাধ্যম। আর রাসূল সাঃ হাতের ভয়াবহতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যখন তা অন্যায় কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি হাতের সঠিক ব্যবহারকে প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় হিসেবে নির্ধারণ করে বলেছেন: (প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।)[৫]

খ. চোখ: এটি কষ্ট প্রদানের উৎস যদি এর দ্বারা তুচ্ছ, হেয় এবং বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করা হয় অথবা হারাম কিছু দেখতে ব্যবহার করা হয়। যেমন: অন্যের বাড়ির গোপন বিষয় অবগত হওয়ার জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। রাসূল সাঃ তার গৃহের ছিদ্র দিয়ে উঁকিমারা ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে অবস্থায় তার হাতে একটি চিরুনী ছিল এবং তা দিয়ে তিনি মাথার চুল আচড়াচ্ছিলেন: (যদি আমি জানতাম যে তুমি উঁকি মারবে, তবে এ দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তাকানোর জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে।)[৬]

(১) সহীহ বুখারী (৪/১৮৭, হা: ৬৪৭৮)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/১৮৬-১৮৭, হা: ৬৪৭৪)।
(৩) সহীহ বুখারী (১/২০-২১, হা: ১০), সহীহ মুসলিম (১/৬৫, হা: ৬৫-৪১)।
(৪) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী।
(৫) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৬) সহীহ বুখারী (৪/১৩৮, হা: ৬২৪১)।

মানুষ তার চোখের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে; যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন: ﴿إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا﴾ অর্থ: [নিশ্চয় কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।][১]

গ. ইশারা-ইঙ্গিত: কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ, হেয়জ্ঞান এবং বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে চোখের পাতা দ্বারা ইশারা করা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ﴾ অর্থ: [দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।][২]

আরবিতে 'হাম্মায' বলা হয় যে ব্যক্তি ইশারা ও কর্মের মাধ্যমে মানুষের নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর 'লাম্মায' হল যে তাদেরকে কথার মাধ্যমে দোষারোপ করে।[৩]

ঘ. কান: কানের মাধ্যমে কষ্ট প্রদানের ধরণ হল, আড়ি পেতে ও কান পেতে অন্যের কথা শোনা এবং এর মাধ্যমে তাদের কষ্ট প্রদান করা। চাই তারা তাৎক্ষণিক কষ্ট পাক তাকে আড়ি পেতে কথা শুনতে দেখার মাধ্যমে অথবা তারা কষ্ট পাক পরবর্তীতে তার শ্রুত কথা প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে। আর মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে এ মহান আয়াতের প্রেক্ষিতে এবং কানের অপব্যবহারের কারণে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا﴾ অর্থ: [নিশ্চয় কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।][৪]

দ্বিতীয়ত: ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা কষ্ট পাওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষ যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; চাই তা তার দ্বীন, সম্পদ, সম্ভ্রম, জান বা বুদ্ধি-বিবেক এর ক্ষেত্রে হোক। এই পাঁচটি বিষয়কে একত্রে ফিকহের পরিভাষায় 'আজ-জরুরিয়্যাত আল-খামসা' তথা 'পাঁচটি প্রয়োজনীয় বিষয়' বলে অভিহিত করা হয়। এগুলোর বিশদ আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল:

১- দ্বীন: দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ধরণ হল কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধান পালনে বাঁধা দেয়া।

যেমন: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার বিষয়ে একজন ব্যক্তিকে বাঁধা প্রদান করা বা সে যে ওয়াজীব ও সুন্নাত বিধান পালন করে তা নিয়ে বিদ্রুপ করা, যেমন: টাখনুর উপর কাপড় পড়া এবং দাড়ি ছেড়ে দেয়া। ইমাম শাতেবী রহিঃ বলেন: "অস্তিত্বের দিক থেকে মৌলিক ইবাদতগুলো দ্বীনের হেফাযতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে; যেমন: ঈমান, দুই শাহাদার উচ্চারণ, যাকাত, সিয়াম, হজ ইত্যাদি"।[৫]

(১) সূরা আল-ইসরা: (৩৬)।
(২) সূরা আল-হুমাযা: (১)।
(৩) তাফসীরুস সাদী (৫/৪৫৫)।
(৪) সূরা আল-ইসরা: (৩৬)।
(৫) আশ-শাতেবী, আল-মুয়াফাকাত (২/৪)।

২- ধন-সম্পদ: নানা পদ্ধতিতে মানুষের সম্পদের উপর আক্রমণ করা; যেমন: চুরি, ধোঁকা, প্রতারণা, ঘুষ গ্রহণ অথবা সম্পদে আক্রমণ করার অন্যান্য পদ্ধতিতে। ইসলাম সম্পদের হেফাযত করেছে এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করাকে হারাম করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ অর্থ: [আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।][১] অত্র আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। এর অন্তর্ভুক্ত হল: জুয়া, প্রতারণা, আত্মসাৎ, অন্যের অধিকার অস্বীকার করা এবং সম্পদের মালিক যার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। আরো অন্তর্ভুক্ত হল শরীয়ত যা হারাম করেছে যদিও মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট; যেমন: যিনাকারী ও গণকের উপার্জন, মদ ও শুকুর বিক্রির মূল্য ইত্যাদি।[২]

নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর তোমাদের জন্য হারাম। এখানে উপস্থিত ব্যাক্তি আমার এ বাণী যেন অনুপস্থিত ব্যাক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যাক্তি হয়ত এমন এক ব্যাক্তির কাছে পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশি স্মরণ রাখতে পারবে।)[৩]

৩- বুদ্ধি-বিবেক: এর উপর আক্রমণ তিনভাবে হতে পারে:

ক. তাকে এমন স্থানে আঘাত করা যেখানে আঘাত করার ফলে তার চিন্তা-শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সে তার ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

খ. যে সব দ্রব্য বুদ্ধি-বিবেককে নষ্ট করে দেয় এমন দ্রব্য বিক্রয় ও বিপননের মাধ্যমে বিবেকের প্রতি আক্রমণ করা। যেমন: এ্যালকোহল, আফিম এবং সব ধরণের নেশাদ্রব্য। কেননা এগুলো মানুষের চিন্তা শক্তিকে নষ্ট করে দেয়, তাকে তার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যান থেকে বঞ্চিত রাখে এবং তার বিষয়গুলো অস্পষ্ট করে দেয়; ফলে সে ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না। এভাবে সে তার আচরণের মাধ্যমে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য থেকে বের হয় যায়।

নেশাদ্রব্য মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য শয়তান নেশাদ্রব্যকে মানুষের নিকট মনোমুগ্ধকররূপে উপস্থাপন করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ অর্থ: [শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না?][৪]

---

(১) সূরা আল-বাকারা: (১৮৮)।
(২) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (২/২২৫)।
(৩) সহীহ বুখারী (১/৪১, হা: ৬৭), সহীহ মুসলিম (৩/১৩০৬, হা: ৩০-১৬৭৯)।
(৪) সূরা আল-মায়েদা: (৯১)।

গ. সাংস্কৃতিক বিনাশকারী: মানুষের বিবেকের উপর আক্রমণ করা হয় ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসার, মানুষের মাঝে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি এবং ভ্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক লেখনী ও চিত্তাকর্ষক সাহিত্যের পথ ধরে বিচ্যুতি-বিকৃতিকে নানা উপায়ে সুশোভিত করার মাধ্যমে।

৪- জান: জানের উপর আক্রমণ করা হয় হত্যা, আঘাত ইত্যাদির মাধ্যমে। যুলুম ও সীমালঙ্ঘনবশত জানের উপর আক্রমণকে ইসলাম হারাম করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ অর্থ: [আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।][১]

রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, সেই মুসলিম ব্যক্তির খুন এই তিনটির একটি কারণ ছাড়া হালাল নয়: বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচারী হওয়া, প্রাণের বদলায় প্রাণ গ্রহণ, দ্বীন পরিত্যাগী মুসলিমের জামায়াত বিছিন্ন হওয়া।)[২]

৫-মান-সম্ভ্রম: মানুষের চরিত্রে কালিমা লেপনের মাধ্যমে আক্রমণ করা। আর ইসলাম মান-সম্মানে আক্রমণের সকল অবস্থাকেই নিষিদ্ধ করেছে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্ভ্রম তোমাদের জন্য হারাম।)[৩]

তৃতীয়ত: কষ্ট সহ্য করা:

কষ্টের বিপরীতে অনুরূপ কষ্ট না দেয়ার মাধ্যমে কষ্ট সহ্য করার গুণ অর্জিত হয়। আর এটি দু'ভাবে হয়ে থাকে:

১- ক্ষমা ও উপেক্ষা করার মাধ্যমে মন্দ আচরণ মোকাবেলা করা। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾ অর্থ: [আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে। নিশ্চয় তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।][৪] আল্লাহ তায়ালা আদল বা ন্যায়বিচারকে শরীয়াভুক্ত করেছেন, আর সে আদল হল কিসাস। তবে তিনি উত্তমতার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, আর সে উত্তম কাজটি হল ক্ষমা। আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমার প্রতিদান কখনো বিনষ্ট হয় না।[৫] রাসূল সাঃ বলেছেন: (সাদাকাহ করাতে সম্পদের হ্রাস হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন।)[৬]

---

(১) সূরা আন-নিসা: (৯৩)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/২৬৮, হা: ৬৮৭৮), সহীহ মুসলিম (৩/১৩০২-১৩০৩, হা: ২৫-১৬৭৬)।
(৩) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৪) সূরা আশ-শূরা: (৪০)।
(৫) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/১২৮)।
(৬) সহীহ মুসলিম (৪/২০০১, হা: ৬৯-২৫৮৮)।

আবু বকর আস-সিদ্দীক রাঃ তার খালাত ভাই মিসতাহ বিন আসাসাহ এর উপর যে সাদাকা করতেন তা বন্ধ করে দেন যখন সে আয়েশা রাঃ এর উপর ইফক তথা মিথ্যা অপবাদ রটনার ঘটনায় জড়িত হয়। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে যে পরিমাণ দান করতেন তা পুনরায় চালু করেন যখন তিনি আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী শ্রবণ করলেন: ﴿وَلَا يَأۡتَلِ أُوْلُواْ ٱلۡفَضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤۡتُوٓاْ أُوْلِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ অর্থ: [আর তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্থকে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।][১]

আর ক্ষমা করা সবসময় শুধু প্রশংসনীয়ই নয় বরং তা কখনো শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় যদি ক্ষমার কারণে কোন বিপর্যয় না ঘটে। যদি ক্ষমার পরিণতিতে কোন বিপর্যয় ঘটে তাহলে ক্ষমা না করাই হল অতি উত্তম। উদাহরণত যে ব্যক্তি মানুষের উপর যুলুম করার কারণে প্রসিদ্ধ তাকে ক্ষমা করার ফলে সে যুলুম চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হবে। আর যদি ক্ষমা করার ফলে কোন বিপর্যয় না ঘটে অথবা তা যদি মিমাংসার দিকে নিয়ে যায় তাহলে ক্ষমা করাই উত্তম।

২- মন্দ আচরণের বিপরীতে উত্তম আচরণ: আর ইসলাম এ বিষয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। হাদিসে এসেছে, নবী সাঃ বলেছেন: (হে উকবাহ বিন আমের! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তার সাথে তা বজায় রাখ, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার উপর জুলুম করেছে তুমি তাকে ক্ষমা কর।)[২]

সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে সালাম প্রদান, সম্মান করা, তার জন্য দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তার প্রশংসা করা এবং তাকে দেখতে যাওয়ার মাধ্যমে। আর যে আপনাকে বঞ্চিত করেছে তাকে শিক্ষা দেয়া, উপকার করা এবং সম্পদ দেয়ার মাধ্যমে প্রদান করা হবে। আর যে আপনার প্রতি অবিচার করেছে তার ক্ষমা হবে রক্তপণ ও সম্ভ্রমের ক্ষেত্রে। এগুলোর কতক ওয়াজীব ও কতক মুস্তাহাব।[৩] ওয়াজীব হল যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।[৪] আর মুস্তাহাব হল যে আপনার উপর যুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করা।

চতুর্থত: চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখা:

(১) সূরা আন-নূর: (২২)।
(২) মুসনাদে আহমাদ (৪/১৫৮)।
(৩) ইবনে তাইমিয়্যাহ, মাজমুউর রাসায়েল।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/৯০, হা: ৫৯৯১)।

হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ভ্রুকুটিপূর্ণ ও মলিন চেহারার বিপরীত। অর্থাৎ মুসলিম ভাইদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা। কেননা এটি মিল-মহাব্বত এবং পূণ্যের অন্যতম উৎস। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তুমি পূণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। এমন কি হোক সেটা তোমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা।)[১]

অনুরূপভাবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা হল সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যম। যেমনটি বলেছেন মুহাম্মাদ বিন হাযেম:

সুখ্যাতির অনুসন্ধানীরা তা অর্জন করতে পারেনি…যেমনটি পেরেছে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারীরা।

(১) সহীহ মুসলিম (৪/২০২৬, হা: ১৪৪-২৬২৬)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ইসলামী স্বভাব-চরিত্রের মূলভিত্তি

ভূমিকা

ইসলামী আখলাক বা স্বভাব-চরিত্র অপরিকল্পিত নীতি অথবা কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা কেন্দ্রিক গড়ে উঠা আনন্দ, অভিরুচী এবং উপভোগের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং তা কিছু মূলনীতি ও মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যেই চারিত্রিক কর্মে খালেস নিয়ত অথবা রাসূল সাঃ এর মানহাযের নিঃশর্ত অনুসরণ অনুপস্থিত থাকে সেটি ইসলামের মানদণ্ডে চারিত্রিক কর্ম হিসেবে গণ্য হয় না। অনুরূপভাবে জ্ঞাতব্য বিষয় যে, ইসলামী স্বভাব-চরিত্র সহজতা এবং আরোপণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই মূলভিত্তিগুলো ব্যতীত কোন চারিত্রিক কর্মকেই সফলতা এবং ধারাবাহিকতা দান করা হয় না; কেননা সেটি এমন ধারণা হিসেবে থেকে যায় যার বাস্তবে কোন ভিত্তি নেই এবং তার শিক্ষামূলক প্রভাব ব্যক্তি অথবা সমাজের মাঝে সঞ্চারিত হয় না।

আর ভিত্তিগুলোর অধিকতর আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

১- নিয়ত বা ইখলাস:

নিয়ত হল: অন্তরের সংকল্প।[১] আর এখানে নিয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হল: আমলের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যে, আমলটি কি এক আল্লাহর জন্য; যার কোন শরীক নেই? নাকি সেটি আল্লাহ এবং অন্যের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত?[২] কেননা ইসলামে নিয়ত হল এমন একটি স্তম্ভ ও প্রধান নিয়ামক যার উপর আমল কবুল হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। অনুরূপভাবে এ কথাটি নিশ্চিত করে যে, আচরণকে চারিত্রিক মর্যাদা দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ত হল প্রধান নিয়ামক। কেননা মানুষ কখনো এমন আমল করে যার বাহ্যিকরূপ উত্তম চরিত্রের গুণে গুণান্বিত কিন্তু তার অভ্যন্তর বাহ্যিকরূপের বিপরীত। ফলে তার আচরণকে কিভাবে চারিত্রিক মর্যাদা দেয়া হবে অতঃপর সে ঐ ব্যক্তির সমপর্যায়ে উপনীত হবে যে ব্যক্তি তার আমলকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন করেছে? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বীরত্ব হল উত্তম চরিত্রের অন্তর্গত; কিন্তু ইসলামের মানদণ্ডে তার কোন মূল্য নেই যখন সেটি আল্লাহর খালেস নিয়ত শূন্য হয়। আবু মূসা আল-আশয়ারী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (এক ব্যাক্তি নবী সাঃ এর কাছে এসে বলল, এক ব্যাক্তি গনীমত লাভের জন্য, এক ব্যাক্তি প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যাক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।)[৩] সুতরাং যার আমল বিশুদ্ধ নিয়ত শূন্য হবে তার আমল বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে এবং ইসলামের মানদণ্ডে তার কোন মূল্য নেই। এ জন্য রাসূল সাঃ ঐ দুই ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন যার নিয়ত আল্লাহকে সন্তুষ্টি করা এবং যার নিয়ত ভিন্ন কিছু অর্জন করা, যেমনটি এসেছে প্রসিদ্ধ হাদিসে: (প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং কোন ব্যক্তি কেবল তাই লাভ করবে যা সে নিয়ত

(১) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (পৃ: ২০)।
(২) প্রাগুক্ত (পৃ: ৮)।
(৩) সহীহ বুখারী (২/৩০৯, হা: ২৮১০), সহীহ মুসলিম (৩/১৫১২-১৫১৩, হা: ১৪৯-১৯০৪)।

করে। যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য হবে, আর যার হিজরত পার্থিব কোন লাভ বা কোন মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যের হিজরত বলেই গণ্য হবে।)[১] এ জন্য মানবীয় আচরণের চারিত্রিক মর্যাদা সঠিক ও বিনষ্ট হওয়া মযবুতভাবে নিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইমাম ইবনে রজব রহিঃ বলেন: ‘‘আমলের সঠিকতা ও বিনষ্টতা তাকে অস্তিত্বে আনায়নের প্রয়োজনীয় নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে’’।[২] কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় ও তাঁর মানহায অনুযায়ী কর্মের উপস্থিতি কবুলিয়াত অর্জন করে। বস্তুত আমলকারীর আমলের সওয়াব তার নেক নিয়ত অনুপাতে হয় এবং তার পরিণতিও তার খারাপ নিয়তের অনুপাতে হয়। কখনো তার নিয়ত মুবাহ বিষয়ে হতে পারে তখন তার কর্মও মুবাহ হিসেবে গণ্য হবে; ফলে তার কোন সওয়াব এবং শাস্তি হবে না। সুতরাং আমল স্বয়ং তার সঠিকতা, বিনষ্টতা এবং মুবাহ হওয়ার বিষয়টি তাকে অস্তিত্বে আনায়নের প্রয়োজনীয় নিয়তের অনুপাতে হবে।[৩]

সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি যখন আহার করে বা ঘুমায় অথবা খালেস নিয়তে দান করে তখন সেটি ইসলামের মানদণ্ডে উত্তম হিসেবে বিবেচিত হয় তার চাইতে যাতে খালেস নিয়ত অনুপস্থিত। কখনো মানুষের দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির আমল কম হতে পারে কিন্তু সেটি খালেস নিয়তে হওয়ার কারণে আল্লাহর নিকট অনেক বড়। পক্ষান্তরে কখনো কোন ব্যক্তির আমল মানুষের দৃষ্টিতে অনেক বড় হতে পারে কিন্তু ইসলামের মানদণ্ডে কোন মূল্য নেই; তাতে খালেস নিয়ত না থাকার কারণে।

নাফে বিন হাবীবকে জিজ্ঞাসা করা হল: ‘আপনি কি জানাযাতে উপস্থিত হবেন না? জবাবে বললেন: আমি নিয়ত করে নেই। তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন অতঃপর বললেন: আমি রওয়ানা হচ্ছি’। কোন কোন পূর্বসূরী বিদ্বান বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার আমলকে যেন পূর্ণতা দেয়া হয় সে যেন তার নিয়তকে সুন্দর করে; কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে প্রতিদান দেন এমনকি খাবারের লোকমাতেও যদি সে তার নিয়তকে সুন্দর করে নেয়’।[৪]

নেক নিয়তের পরিধি যখন বিস্তৃতি লাভ করে তখন শরীয়া অনুপাতে সম্পাদিত সমস্ত আচরণগত কাজকে চারিত্রিক মর্যাদাসম্পন্ন কাজে পরিণত করে; যে কাজের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান ও সওয়াব দেয়া হয়। আর এ প্রেক্ষিতেই আচরণ চারিত্রিক মর্যাদা লাভ করে, তাদের আমলের বিপরীত যারা লৌকিকতা প্রদর্শন করে যখন তারা দান করে বা বিনয় প্রকাশ করে অথবা তাদের নিয়তের উপর ইখলাসের প্রাধান্য ব্যতীত সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক আচরণ করে। এ কারণে তাদের চারিত্রিক আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় না এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্য লাভের পর তা থেমে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এ ধরণের চরিত্রকে সাময়িক স্বভাব-চরিত্র বলা হয়।

খালেস নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত চারিত্রিক আচরণের স্থায়িত্ব যা নিশ্চিত করে তা হল আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সম্পাদিত পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের গুণের স্থায়িত্ব; কেননা তাদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের উৎস হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে খালেস নিয়ত। ফলে এর উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা; দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নয় যা অর্জনে কোন এক পক্ষ লালায়িত। এমনকি সাদ বিন রবী রাঃ তিনি তার অর্ধেক সম্পদ

---

(১) সহীহ বুখারী (১/১৩, হা: ১), সহীহ মুসলিম (৩/১৫১৫-১৫১৬, হা: ১৫৫-১৯০৭)।
(২) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (পৃ: ৭)।
(৩) প্রাগুক্ত (পৃ: ৭-৮)।
(৪) প্রাগুক্ত (পৃ: ৭-৮)।

ও তার একজন স্ত্রীকে আব্দুর রহমান বিন আওফ রাঃ কে দান করে দিয়েছিলেন। তবে ইবনু আওফ রাঃ তা গ্রহণে বিরত ছিলেন এবং তার আনসারী ভাইয়ের সম্পদে লালায়িত হননি।[১] কেননা তাদের মাঝের সম্পর্ক বস্তুগত নয় বরং তা থেকে অনেক উন্নত এবং উঁচু। এটি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক যার মূল হল আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। আর বর্তমানে মুসলিমদের তাদের আমলে এবং সম্পর্কে খালেস নিয়ত প্রতিফলিত করার কতই না প্রয়োজন; যাতে উন্নত ইসলামী চারিত্রিক মূল্যবোধ অর্জিত হয়।

ইসলামী স্বভাব-চরিত্রের সাথে নিয়তের আরেকটি সম্পর্ক রয়েছে; আর তা হল, কোন ব্যক্তি অন্তরে সৎকাজের নিয়ত করে অতঃপর অক্ষমতার কারণে তা করতে সক্ষম হয় না, তদুপরি তার জন্য একটি নেকী লিখে দেয়া হয়। যেমনটি নবী সাঃ হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: (আল্লাহ তায়ালা সমুদয় সৎ ও অসৎ কর্মের হিসাব লেখেন। এরপর রাসুল সাঃ এটিকে আরও বিস্তৃত করে বলেনঃ সুতরাং যে ব্যাক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করেছে অথচ তা সম্পাদন করে নি আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সোয়াব লিখে দেন। তার ইচ্ছার পর কাজে পরিণত করলে আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুন পর্যন্ত সোয়াব লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি কোন মন্দ কর্মের অভিপ্রায় করে এবং তা কাজে পরিণত না করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সোয়াব লিখে দেন। আর অভিপ্রায়ের পর তা সম্পাদন করে ফেললে তিনি একটি মাত্র গুনাহ লেখেন।)[২]

সুতরাং নিয়তের উপর মুসলিম ব্যক্তির প্রতিটি আচরণ অথবা সে যা করার ইচ্ছা করেছে তার চারিত্রিক মূল্য নির্ভর করে। কাজেই যে ব্যক্তি অন্তরে ভাল কাজের ইচ্ছা রাখে সে মূলত উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যদি সে তা বাস্তবায়নে অপারগতার কারণে চরিত্রে রূপ দিতে না পারে। অনুরূপভাবে কেউ যদি পাপ কাজের ইচ্ছা করে অতঃপর আল্লাহর ভয়ে বা তাঁর আনুগত্যের আকাঙ্খায় অথবা তাঁর লজ্জায় সে তা থেকে সরে আসে; তাহলে সে উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করল -আর তা হল আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাশীলতা।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ত হল আমল কবুল ও তার উপর চারিত্রিক মূল্যবোধ আরোপের মূল বিষয়; যদিও কখনো কখনো তাকে আচরণে রূপ দেয়া না যায় এবং মানসিক অংশগ্রহণের সময় তা স্থগিত হয়ে যায় বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতির কারণে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিঃ বলেন: "শুধুমাত্র নিয়তের কারণে মুমিন ব্যক্তিকে সওয়াব দেয়া হয় এবং তা আমলের স্থলাভিষিক্ত হয় যদিও সে কোন অক্ষমতার কারণে আমলে পরিণত করতে না পারে। আর এটি সকল কল্যাণকর আমলের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য"।[৩]

এই জন্য সমীচীন হল, সর্বদা চারিত্রিক লালন-পালন তার দিকনির্দেশনায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ত করা ও তা খালেসভাবে এক আল্লাহর জন্য করার উপর গুরুত্ব প্রদান করবে; যাতে ব্যক্তির আমল ইসলামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং ধারাবাহিকতা ও অটলতা লাভ করে। কেননা ইসলামী চরিত্র অনুশীলনের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী হল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা; কোন বস্তুগত সাময়িক সুযোগ-সুবিধা নয় যা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়।

২- ইত্তেবা বা অনুসরণ:

(১) দেখুন: সহীহ বুখারী (৩/৩৮, হা: ৩৭৮০)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/১৮৯, হা: ৬৪৯১), সহীহ মুসলিম (১/১১৭, হা: ২০৩-১২৮)।
(৩) ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৭৬১)।

আমলটি উন্নত চারিত্রিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত উপস্থিত থাকা অপরিহার্য। আর তা হল, রাসূল সাঃ এর যথাযথ অনুসরণ, তার বৃত্তের মধ্যে থেকে ও তার দিকনির্দেশনার আলোকে আমল এবং তার মানহায থেকে বের না হওয়া যদিও নিয়তের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ থাকে।

যেই কর্মচারী তার কর্মঘন্টা মেনে চলে কিন্তু সে নির্ধারিত কাজের তুলনায় কম কাজ সম্পন্ন করে; ফলে কাজ পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা ব্যতীত নিয়মানুবর্তিতায় তার একনিষ্ঠতা তাকে একনিষ্ঠের মর্যাদা দিবে না। কেননা সে কাজের প্রধান অংশ দৈনন্দিন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য উন্নত চারিত্রিক আচরণকে সঠিক নিয়ত এবং শুধু রাসূল সাঃ এর অনুসরণের সাথে যুক্ত না করা হল ভুল। সুতরাং যে আচরণ আল্লাহর জন্য ও তাঁর মানহায অনুযায়ী নয় এবং যে আচরণ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ও রাসূল সাঃ এর মানহায অনুযায়ী; উভয়ের উপর চারিত্রিক হুকুম আরোপের জন্য পার্থক্য করা অপরিহার্য।

আর এটি দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের দাবী রাখে যাতে মানুষ সঠিক মানহাযের উপর চলতে পারে; আর তা হল রাসূল সাঃ এর অনুসরণ যেমনটি আল্লাহর বাণীতে বিবৃত হয়েছে: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ অর্থ: [রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।][১]

আদেশ ও নিষেধের এই জ্ঞান চারিত্রিক কর্মের জন্য জরুরী বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ দ্বীনী জ্ঞানকে মানবীয় প্রয়োজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। এ জন্য নবীগণের রেসালাত অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছিল বিবেকগত, সহজাতগত এবং কল্যাণমূলক জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে; যা তাদেরকে সে সকল বিষয় সম্পর্কে জানাবে যা জানতে তারা অক্ষম।[২]

ইসলামী মানহায অনুসরণ না করার পন্থাসমূহের অন্তর্গত হল বুদ্ধি-বিবেক, নিজস্ব অভিরুচী ও আকর্ষণের বিবেচনাকে ইসলামী মানহাযের প্রমাণিত বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। তদানুসারে নিজস্ব অভিরুচীর মনোভাবাপন্ন কিছু ব্যক্তির নিকট নৈতিক বাধ্যবাধকতার উৎস বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ভুল হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনার আশ্রয় না নিয়ে শুধুমাত্র আবেগীয় দিকের উপর নির্ভর করা।[৩] কেননা মানুষের বুদ্ধিগত দিক এবং উপলব্ধির বিভিন্ন শক্তির উপর শুধু নির্ভরতার পরিণতি নিরাপদ নয়। কারণ তথায় এমন মনস্তাত্ত্বিক ও অমনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ রয়েছে যা জ্ঞানকে নির্দেশনার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। ফলস্বরূপ সে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ -যেমন: কুপ্রবৃত্তি, সন্দেহ-সংশয় এবং কামনা-বাসনা- থেকে যে বুদ্ধিগত হুকুম প্রকাশিত হয়, তাতে তার প্রভাব থাকে; যা মানুষকে রাসূল সাঃ কর্তৃক আনীত হেদায়েতের মানহায অনুসরণে অতি প্রয়োজনীয় করে তোলে। যে হেদায়েতের মানহাযে কুপ্রবৃত্তি, সন্দেহ-সংশয় এবং কামনা বাসনার জাল থেকে মানবজাতির মুক্তি নিহিত রয়েছে।

আর বুদ্ধি-বিবেককে বিচারক মানা এবং তাকে শরীয়তের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ব্যক্তিকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করে; কেননা “বুদ্ধি-বিবেক কখনো অনুকরণীয় ও সঠিক চরিত্র নির্ধারণে দিশেহারা হতে পারে; যেমন

(১) সূরা আল-হাশর: (০৭)।
(২) মুহাম্মাদ আফীফী, আন-নাযরিয়্যাহ আল-খুলুকিয়্যাহ (পৃ: ১৫৭)।
(৩) প্রাগুক্ত (পৃ: ১১৩)।

সে কখনো হাকীকতে পৌঁছতে ব্যর্থ হতে পারে"। এ জন্য আসমানী নির্দেশনা প্রবৃত্তির অনুসারী ও পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করা থেকে সাবধান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا﴾ অর্থ: [আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না—যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে ও যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।][১]

কুপ্রবৃত্তি, শয়তান এবং নিজস্ব অভিরুচী কখনো মন্দ চরিত্রকে মানুষের নিকট সুশোভিত করে তোলে এই যুক্তিতে যে, এটি এক প্রকারের আধুনিকতা ও সভ্যতা; যেমন হিজাব পরিত্যাগ করা। এ প্রেক্ষিতে কোন মুসলিমের জন্য জায়েয এবং গ্রহণীয় নয় যে, সে নিজের জন্য এমন নিজস্ব অভিরুচী ও বিচ্যুত চিন্তার দায়মুক্তির নায্যতা দিবে সভ্য হওয়ার নামে অথবা ভিন্ন কোন দাবীতে; যাতে তাকে ইসলামের মানহায থেকে বের করে দেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা সঠিক মানহায বর্ণনা করা ও রাসূল সাঃ এর জবানে তা সুস্পষ্ট করার পর তার মাঝে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾ অর্থ: [আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়।][২]

রাসূল সাঃ বলেছেন: (কেউ আমাদের এই শরীয়তে নেই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।)[৩]

ইসলামী মানহায অনুসরণ না করার একটি পদ্ধতি হল আমলের ক্ষেত্রে নৈতিক গুণের প্রয়োগ না করে কথাবার্তায় নৈতিকতার ভান করা। সুতরাং এটি আল্লাহর মানহায ব্যতীত ভিন্ন কিছুর অনুসরণ, যদিও তার কথার বাহ্যিক দিক নৈতিকতাসম্পন্ন। কিন্তু সে তা বাস্তবায়ন করা থেকে দূরে থেকেছে। এই জন্য এটি তাকে চারিত্রিক মর্যাদা দেয় না। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?* তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।][৪] আয়াতে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তা তিরস্কারমূলক। অর্থাৎ তোমরা ভাল কথা কেন বল যা তোমরা কাজে পরিণত কর না? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ স্বভাবের জন্য তাদের কর্মকে চরম অসন্তোষজনক বলে নিন্দা করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকেও নিন্দা করেছেন এই বলে যে: ﴿أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ

(১) সূরা আল-কাহফ: (২৮)।
(২) সূরা আল-আহযাব: (৩৬)।
(৩) সহীহ বুখারী (২/২৬৭, হা: ২৬৯৭), সহীহ মুসলিম (৩/১৩৪৩, হা: ১৭-১৭১৮)।
(৪) সূরা আস-সফ: (২-৩)।

﴿أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ অর্থ: [তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?][১]

বনী ইসরাইলেরা মানুষদেরকে আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর তাকওয়া এবং নেককাজের নির্দেশ দিত কিন্তু তারা বিপরীত কাজ করত। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি ভাল কাজের নির্দেশ দিবে সে যেন মানুষের মাঝে তাতে সবার চেয়ে বেশি অগ্রগামী হয়।[২] তাদের বিষয়টি বাহ্যিকভাবে উন্নত নৈতিক কর্ম হলেও সেটি আমলে বাস্তবায়নের মানহায শূন্য হয়েছে; ফলে সেটি তার চারিত্রিক মর্যাদা হারিয়েছে।

এ জন্য উত্তম চরিত্র হল শরীয়ত যে বিধান নিয়ে এসেছে তার অনুসরণ করা এবং তার উপর নিজস্ব অভিরুচী, বুদ্ধি-বিবেক, কামনা-বাসনা ও সন্দেহ-সংশয়কে অগ্রাধিকার না দেয়া। বরং আমল হবে শরীয়ার মানহায অনুযায়ী। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ﴾ অর্থ: [তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে?][৩] সুতরাং আমলে সালেহ হল সৎকর্ম করা। আর সৎকর্ম হল যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ ভালবাসেন, অর্থাৎ যে বিষয়ে আবশ্যিকভাবে অথবা পছন্দনীয় মনে করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই যে বিষয়টি দ্বীনের মাঝে বিদআত বলে গণ্য তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ ভালবাসেন না। তাই সেটি সৎকর্ম এবং আমলে সালেহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যা বৈধ নয় এমন কিছু করে যেমন: অশ্লীলতা এবং যুলুম; তা সৎকর্ম এবং আমলে সালেহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪]

আর ইসলামী মানহায হল সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ। তার উপর নিজস্ব অভিরুচীকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ﴾ অর্থ: [আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।][৫]

৩-চারিত্রিক বাধ্যবাধকতা:

দ্বীন ইসলামের উৎস হল আল্লাহ তায়ালা। তিনি রাসূল সাঃ কে এ দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন সকল ধর্মের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ অর্থ: [তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ

(১) সূরা আল-বাকারা: (৪৪)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৮৮)।
(৩) সূরা আন-নিসা: (১২৫)।
(৪) ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়া (১০/১৭৩)।
(৫) সূরা আল-মায়েদা: (৩)।

সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।][১] অতঃপর এই দ্বীন আগমন করেছে যমীনে উন্নত জীবন বাস্তবায়ন করা এবং মানবজাতিকে ভ্রষ্টতার বিচ্যুতি, অন্ধকারের গোলকধাঁধা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে প্রীতি-ভালবাসার দিকে উদ্ধার করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ﴾ অর্থ: [আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নি গর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।][২]

তাই এই সত্য দ্বীন অনুসরণ করতে মানবজাতি বাধ্য; কেননা একমাত্র এই দ্বীন মানবজাতিকে বিপথগামীতা এবং ভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করতে পারে। যেহেতু এটাই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণীয় দ্বীন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ যা শরীয়তসিদ্ধ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন পথে চলবে; তার কোন কিছু গ্রহণ করা হবে না।[৩] মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ অর্থ: [আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না।][৪]

রাসূল সাঃ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তার দাওয়াত উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য। যেমন তিনি বলেছেন: (সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দেয়ার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।)[৫]

অতএব, স্বভাব-চরিত্রের ভিত্তি স্থাপনের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন যা আনুগত্য, অনুসরণ এবং মান্যতার চেতনাকে জাগ্রত করে। এই জন্য চরিত্র বিষয়ে গবেষকগণ নৈতিক বাধ্যবাধকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। যেমন একজন গবেষক বলেন: নৈতিক ব্যবস্থা বাধ্যবাধকতার স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। আর বাধ্যবাধকতা হল ব্যবহারিক প্রজ্ঞার মূল উপাদান ও হাকীকত এবং এর মাধ্যমেই দায়িত্ব বাস্তবায়িত হয়…মানবজীবনে শৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং তাদের বাস্তব জীবনে ন্যায়-ইনসাফ ছড়িয়ে পড়ে।[৬]

এ জন্য বাধ্যবাধকতা হল মূলভিত্তি যাকে কেন্দ্র করে নৈতিক ব্যবস্থা আবর্তন করে এবং যা হারানো বাস্তবিক প্রজ্ঞার হাকীকতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা কীভাবে বাধ্যবাধকতা ব্যতীত নৈতিক ভিত্তি কল্পনা করতে পারি?

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা থেকে আরোপনমূলক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا﴾ অর্থ: [আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা

(১) সূরা আস-সফ: (৯)।
(২) সূরা আলে-ইমরান: (১০৩)।
(৩) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩৮৭)।
(৪) সূরা আলে-ইমরান: (৮৫)।
(৫) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৬) কামাল ঈসা, কালিমাত ফিল আখলাক (পৃ: ১০৫)।

এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল, আর মানুষ তা বহন করল; সে অত্যন্ত যালিম, খুবই অজ্ঞ।][১]

আয়াতে বর্ণিত আমানত হল আদেশ, নিষেধ, অবশ্য পালনীয় ফরজ, দণ্ডবিধি ও ইবাদত এবং এগুলোর উপর যে সওয়াব ও শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তা কবুল করে নেয়া।[২]

আর আল্লাহ তায়ালার হিকমতের অংশ হল যে, তিনি মানবাত্মাকে ভাল-মন্দের জ্ঞান দান করেছেন যাতে সে জিজ্ঞাসাবাদ, প্রতিদান এবং হিসাবে প্রদানে প্রস্তুত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾ অর্থ: [আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুচোখ?* আর জিহ্বা ও দুই ঠোঁট?* আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দুটি পথ।][৩] তিনি আরো বলেন: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴾ অর্থ: [তারপর তাকে তার সৎকাজের এবং তার অসৎ-কাজের জ্ঞান দান করেছেন।][৪]

অর্থাৎ তাকে ভাল এবং মন্দের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।[৫] শাওকানী রহিঃ বলেন: তাকে উভয়ের অবস্থা এবং উভয়ের মাঝে যে ভাল ও মন্দের বিষয় রয়েছে তা অবহিত করেছেন।[৬] তাই যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধিকে আবশ্যক করে নিবে সফলতা এবং কৃতকার্যতা তার ভাগ্যে জুটবে। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ততা তাদের জন্য যারা কলুষিত অন্তরের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴾ অর্থ: [সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে।* আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।][৭] অর্থাৎ সফলকাম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং তাকে মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র করেছে। আর বিফল সেই ব্যক্তি যে সুপথ পরিত্যাগ করে পাপাচারে নিমজ্জিত হয়েছে এবং আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে।

তাই চারিত্রিক বাধ্যবাধকতা মানুষের নিকট জন্ম নেয় তার প্রতি ঐশ্বরিক নজরদারির উপলব্ধি, আত্মসমালোচনা, দায়িত্বের অনুভূতির পথ ধরে এবং মানসিক এই প্রত্যয়ের মাধ্যমে যে, মহৎ গুণই হল সর্বোত্তম গুণ ও নীচতা হল সবচেয়ে খারাপ গুণ। যেমনটি প্রতিভাত হবে নিম্নের বিশদ আলোচনা থেকে:

ক. পর্যবেক্ষণ বা নজরদারি:

ইসলামে চারিত্রিক বাধ্যবাধকতার একটি দিক হল একজন মুসলিমের এই অনুভূতি লালন করা যে, প্রতিটি মুহূর্তেই সে আল্লাহ তায়ালার নজরদারির মাঝে আছে। আর এই নজরদারির ভিত্তি হল আল্লাহ সম্পর্কে জানা এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানা। তিনি চোখসমূহের খেয়ানত, অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে এবং সংগোপনে

---

(১) সূরা আল-আহযাব: (৭২)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৫৩০)।
(৩) সূরা আল-বালাদ: (৮-১০)।
(৪) সূরা আল-শামস: (৮)।
(৫) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৫৩০)।
(৬) ফাতহুল কাদীর (৫/৪৪৯)।
(৭) সূরা আল-শামস: (৯-১০)।

আলাপকারী দু'জনের কথোপকথন সম্পর্কে জানেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ﴾ অর্থ: [চোখসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন।](১) তিনি আরো বলেন: ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ﴾ অর্থ: [আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন না। এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ট জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।](২)

এই পর্যবেক্ষণের বিষয়টি মানুষের নিকট ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে। আর ভয়-ভীতি মুমিন ব্যক্তিকে গভীর নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে চারিত্রিক দায়িত্ব পালনে তাকে উদগ্রীব করে তোলে।(৩) এই ভয়-ভীতি মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর আনুগত্য করতে, তাঁকে ভয় করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রস্তুত করে তাঁর আদেশ মেনে ও তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে; কেমন যেন সে তাকে দেখছে। আর এটাই হল ইহসানের অর্থ যার পরিচয় রাসূল সাঃ দিয়েছেন: (আল্লাহর ইবাদত এমন নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। আর তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও, তবে জানবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।)(৪) এটি দায়িত্ববোধের অনুভূতির সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট এবং গভীরতম স্তর যা মুমিনকে নৈতিক গুণাবলী মেনে চলতে ও ত্রুটিপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে।

খ. আত্মপর্যালোচনা:

ইসলামী চারিত্রিক বাধ্যবাধকতা প্রতিফল এবং হিসাবনিকাশের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয় যা ভাল প্রতিদান ও শাস্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। চাই সেটি দুনিয়াতে শাস্তি, শরয়ী দণ্ড এবং তাওফীক না পাওয়ার মাধ্যমে হোক অথবা পরকালে জান্নাত ও তার নেয়ামত লাভ বা জাহান্নাম ও তার উষ্ণতায় প্রবেশের মাধ্যমে হোক। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ٣٧ وَءَاثَرَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ٣٨ فَإِنَّ ٱلۡجَحِيمَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ٣٩ وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ﴾ অর্থ: [সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে।* এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।* জাহান্নামই হবে তার আবাস।* আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে।* জান্নাতই হবে তার আবাস।](৫) এই প্রতীক্ষিত নেয়ামতই

(১) সূরা গাফির: (১৯)।
(২) সূরা আল-মুজাদালা: (৭)।
(৩) মুহাম্মাদ আফীফী, আন-নাযরিয়্যাহ আল-খুলুকিয়্যাহ (পৃ: ৯৭)।
(৪) সহীহ বুখারী (১/৩৩, হা: ৫০), সহীহ মুসলিম (১/৩৬, হা: ১/৮)।
(৫) সূরা আন-নাযিআত: (৩৭-৪১)।

মুমিনের বিবেককে উজ্জীবিত করে এবং চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত লাভের আশায় আল্লাহর সীমারেখা মান্য করা ও সে সীমা অতিক্রম না করার মধ্য দিয়ে তার সমস্ত অনুভূতিকে পরিপূর্ণ করে। ভীতি প্রদর্শনকারী শাস্তি ব্যতিরেখেই; যা মন্দ আচরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনে মুসলিমকে বাধ্য করে।

আরো অনেক ইসলামী দিকনির্দেশনা রয়েছে যা বিবেককে উজ্জীবিত করে এবং আবেগকে জাগিয়ে তোলে যেন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলে এবং নিজের কর্মের ব্যাপারে আত্মপর্যালোচনা করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّحۡضَرٗا وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوٓءٖ تَوَدُّ لَوۡ أَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُۥٓ أَمَدَۢا بَعِيدٗاۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥ﴾ অর্থ: [যেদিন প্রত্যেকে সে যা ভাল আমল করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে- যদি তার এবং এর মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকত আল্লাহ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন।][১]

সওয়াব এবং শাস্তি ব্যক্তির মাঝে আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর ভয় প্রোথিত করে দেয় এবং এই ভয় নৈতিক বাধ্যবাধকতার কার্যক্রমকে বৃদ্ধি করে, তাকে শক্তিশালী করে ও তার সুস্পষ্টতা, দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বতা বৃদ্ধি করে। বিশেষত যখন সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং যখন তথায় এমন প্রলোভন থাকে যা ব্যক্তিকে ঘিরে রাখে, তার অনুভূতি, ঝোঁক ও আবেগকে জাগিয়ে তোলে। এমতাবস্থায় ভয়-ভীতির ভূমিকাই হল পরিস্থিতির মিমাংসাকারী।[২]

প্রতিফল এবং সওয়াব ব্যক্তিকে আত্মপর্যালোচনা করতে শেখায় যে কাজ করতে সে সংকল্পবদ্ধ তা শুরু করার পূর্বেই। যদি সে কাজটি করে ফেলে তাহলে ব্যক্তি তার ভুল-ত্রূটি স্মরণ করে আত্মপর্যালোচনা করে যাতে সে নিজের অপরাধ বুঝতে পারে অতঃপর ক্ষমা প্রার্থ করে, তাওবা করে এবং মন্দ আচরণে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে। এই আত্মপর্যালোচনা মানুষের সর্বদা সতর্ককারী হিসেবে কাজ করে যাতে সে আল্লাহর সীমারেখার নিকট অবস্থান করে। সুতরাং অন্তরের চেতনা, আত্মপর্যালোচনা এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি মুমিনের হৃদয়ে দায়িত্বশীলতার গভীর বোধ সৃষ্টি করে।

সুতরাং ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার সময়, যৌবন, উপার্জন ও তার সম্পদ ব্যয় সম্পর্কে। সে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (কোন বান্দার পদদ্বয় কিয়ামতের দিন এতটুকুও সরবে না যতক্ষণ না তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কিভাবে তার জীবনকালকে অতিবাহিত করেছে, তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কি আমল করেছে, কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে ও কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং কি কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে।)[৩]

আর আল্লাহ তায়ালা মুমিন ব্যক্তিকে তার আমল, উপার্জন এবং দুনিয়া থেকে আখেরাতে কী প্রেরণ করেছে; তার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম

(১) সূরা আলে-ইমরান: (৩০)।
(২) মুহাম্মাদ আফিফী, আন-নাযরিয়্যাহ আল-খুলুকিয়্যাহ (পৃ: ৯৭)।
(৩) সুনানে তিরমিযি (৪/৫২৯, হা: ২৪১৭) এবং তিনি হাদিসটিকে ‘হাসান সহীহ’ বলেছেন।

পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।][১]

গ. দায়িত্বশীলতা:

প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পরিবার, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, কর্মচারী এবং ছাত্র সহ প্রমূখের যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন; এ বিষয়ে তার জবাবদিহিতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সে তার দায়িত্ব পালন করবে উত্তম চরিত্র অর্জনে আদব শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যাকে গৃহ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সামাজিক তরবিয়তি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়েছেন সে এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি শিষ্টাচার মেনে চলবে অন্যকে তা মেনে চলতে বাধ্য করার পূর্বেই। আর এ দায়িত্বশীলতার কথা রাসূল সাঃ বর্ণনা করে বলেছেন: (তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূল সাঃ আরো বলেছেনঃ পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকেই তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।)[২]

আর ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ অর্থ: [প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।][৩] অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে তার আমলের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।[৪] আর চোখ, কান এবং ইন্দ্রীয়ের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ অর্থ: [আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।][৫]

ঘ. বুদ্ধিবৃত্তিক তৃপ্তি:

ইসলাম বুদ্ধি-বিবেক ও তাকে সম্বোধন করার বিষয়টি এড়িয়ে যায় নি; কেননা বুদ্ধি-বিবেক হল ইসলামী বিধান আরোপের কেন্দ্রবিন্দু এবং এটা তার অধিকারীকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করে। বলা হয়: আকল তথা বিবেককে বিবেক বলা হয় এ জন্য যে, সে তার অধিকারীকে ধ্বংসস্থলে পতিত হওয়া থেকে আটকে রাখে। উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন: মানুষের মূল হল তার বুদ্ধি-বিবেক, তার মর্যাদা হল তার দ্বীন এবং তার ব্যক্তিত্ব হল তার চরিত্র। ইসলাম মানুষকে সম্বোধন করে তার বিবেকের দিকে লক্ষ্য করে; যেন মন্দ আচরণের কদর্যতা তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়। আর তা সে সমস্ত উত্তম গুণাবলীর সাথে তুলনা করার মাধ্যমে যা সহজাত বৈশিষ্টসম্পন্ন ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

---

(১) সূরা আল-হাশর: (১৮)।
(২) সহীহ বুখারী (১/২৮৪-২৮৫, হা: ৮৯৩), সহীহ মুসলিম (৩/১৪৫৯, হা: ২০/১৮২৯)।
(৩) সূরা আল-মুদ্দাসসির: (৩৮)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৪৭৬)।
(৫) সূরা আল-ইসরা: (৩৬)।

كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ অর্থ: [বলুন, মন্দ ও ভাল এক নয় যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। কাজেই হে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।][১] অর্থাৎ, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা জেনে রাখ যে, উপকারী সামান্য হালাল জিনিস ক্ষতিকর অধিক পরিমাণ হারাম জিনিস অপেক্ষা উত্তম। তোমরা হারাম থেকে বেঁচে থাক এবং তা পরিহার কর। হালাল বস্তুতে পরিতৃপ্ত হও এবং হালালে সন্তুষ্ট থাক।[২]

সন্তোষজনক বাধ্যবাধকতার আরেকটি দিক হল, কুরআন গীবতকে এমনভাবে চিত্রিত করে যা বিবেককে সম্বোধন করে গীবতের কদর্যতা বুঝাতে সক্ষম হয় এবং একই সময়ে মানুষের সহানুভূতিকে তার ভাইয়ের দিকে ধাবিত করে; যাতে গীবতের প্রভাবক চিত্রায়ণের মাধ্যমে তার মূলোৎপাটন করা যায়। যেমন: গীবতকারীকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে সাদৃশ্য প্রদান। আর এটি এমন কর্ম যা মানুষেরা ঘৃণা করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।][৩]

চারিত্রিক বাধ্যবাধকতার সুক্ষ্ম মানদণ্ড রয়েছে আর তা হল, আচরণের প্রতি আস্থা। কেননা অন্তর যদি আশ্বস্ত না হয় তাহলে ভয়-ভীতি ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয় এবং চারিত্রিক আচরণের জন্য বক্ষ উন্মুক্ত হয় না; এই বিশ্বসে যে, এতে পাপ নিহিত রয়েছে এবং মানুষেরা কর্মটি সম্পর্কে জেনে যাক এ বিষয়ে অনিচ্ছা তৈরি হয়। এ ধরণের বিষয়গুলো মুসলিম ব্যক্তি পরিহার করবে রাসূল সাঃ এর দিকনির্দেশনার প্রেক্ষিতে; যেখানে তিনি বলেছেন: (আর পাপ হল যা তোমার অন্তরে সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তুমি তা অপছন্দ কর।)[৪]

আর এ জন্য শরীয়তের আলোকে বুদ্ধি-বিবেক হল জ্ঞানের অবস্থানস্থল।

৪. চারিত্রিক সহজতা:

বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম হল মানবজাতির প্রতি রহমত স্বরূপ; যা তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করে, তাদের জীবনকে সুবিন্যস্ত করে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের সম্পর্ক ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। যাতে করে তাদের আচরণ বিশৃংখল অবস্থা থেকে উন্নত হয়ে সেই প্রকৃত মানবিক পর্যায়ে উপনীত হয়; যা মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন। ফলে তিনি তাঁর রাসূলকে

(১) সূরা আল-মায়েদা: (১০০)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/১০৭-১০৮)।
(৩) সূরা আল-হুজুরাত: (১২)।
(৪) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ অর্থ: [আর আমি তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।][১] ইবনে কাসীর রহিঃ বলেন: "আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মুহাম্মাদ সাঃ কে বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রহমতটিকে গ্রহণ করে নিল এবং এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করল সে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হল। আর যে তাকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করল সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হল"।[২]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনের চারিত্রিক গুণাবলীর মাঝে কোন কঠিনতা এবং সংকীর্ণতা থাকবে; এটি প্রায় অসম্ভব। দ্বীনের চারিত্রিক গুণাবলী হল ঐ ব্যক্তির জন্য রহমত স্বরূপ যে ইসলামের মানহায ও আদর্শ অনুসরণ করে চলে।

সুতরাং ইসলামী আদর্শের পুরোটাই মহান আদর্শ; যা ইসলামী শিষ্টাচারকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে তা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যের অনুকূল হওয়ার কারণে। ইসলামী চরিত্র ব্যক্তিকে তার সহজাত চরিত্র থেকে মুক্ত করে না বরং তাকে সেই সঠিক মানহায অনুপাতে সুবিন্যস্ত করে যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং তাকে এমন নেতাতে পরিণত করে যে তার আশা-আকাঙ্খা ও সহজাত বৈশিষ্ট্যকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়, না তার দাস হতে নির্দেশনা দেয়। এ জন্য ইসলামী দিকনির্দেশনা মানুষের সহজাত স্বভাবের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে, দ্বীনী বিধান আরোপকালে তাকে অস্বীকার করে না অথবা তা থেকে তাদের মুক্ত করে না। যেমন কুরআনুল কারীম সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছে যে, মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হল সম্পদের মোহ, উপকার ও কৃপণতা প্রীতি, দুর্বলতা, হতাশা এবং অস্থিরতা।

সম্পদের প্রতি মোহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا﴾ অর্থ: [আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালবাস।][৩]

আর উপকার প্রীতি যার মূল হল ধন-সম্পদ, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ﴾ অর্থ: [আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।][৪]

কৃপণতা প্রীতির বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا﴾ অর্থ: [আর মানুষ তো খুবই কৃপণ।][৫]

---

(১) সূরা আম্বিয়া: (১০৭)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/২১০)।
(৩) সূরা আল-ফাজর: (২০)।
(৪) সূরা আল-আদিয়াত: (৮)।
(৫) সূরা আল-ইসরা: (১০০)।

হতাশা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ﴾ অর্থ: [আর যদি আমি মানুষকে আমার কাছ থেকে রহমত আস্বাদন করাই ও পরে তার কাছ থেকে আমি তা ছিনিয়ে নেই তবে তো নিশ্চয় সে হয়ে পড়ে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ।](১)

ত্বরা প্রবণতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولًا﴾ অর্থ: [মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে খুব বেশী তাড়াহুড়াকারী।](২)

যুলুম ও অজ্ঞতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ অর্থ: [সে অত্যন্ত যালিম, খুবই অজ্ঞ।](৩)

অস্থিরতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ অর্থ: [নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে।](৪)

কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾ অর্থ: [নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।](৫)

আল্লাহ তায়ালা এই সহজাত চরিত্রকে সুবিন্যস্ত করেছেন, ফেলেও রাখেন নাই এবং ধ্বংসও করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ ইসলাম সহবাসের ক্ষমতাকে নষ্ট করে নাই বরং চরিত্র ও বংশের হেফাযত এবং মানুষকে চারিত্রিক রোগ থেকে রক্ষার নিমিত্তে তাকে সুবিন্যস্ত করেছে। যেমন ইসলাম যিনাকে হারাম করেছে পক্ষান্তরে একজন থেকে চারজন পর্যন্ত নারীকে বিবাহ করার অনুমোদন দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ﴾ অর্থ: [তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার।](৬)

আল্লাহ তায়ালার দয়ার অন্তর্গত হল, তিনি বিবাহকে করেছেন শান্তি, ভালবাসা এবং প্রশান্তির মাধ্যম। যেমন তিনি বলেন: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً

(১) সূরা হুদ: (৯)।
(২) সূরা আল-ইসরা: (১১)।
(৩) সূরা আল-আহযাব: (৭২)।
(৪) সূরা আল-মা'আরিজ: (১৯)।
(৫) সূরা আলে-ইমরান: (১৪)।
(৬) সূরা আন-নিসা: (৩)।

﴿وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾ অর্থ: [আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।][১]

উস্তায সাইয়্যেদ কুতুব বলেন: "তবে মানুষ খুব কমই আল্লাহর এ নেয়ামতের কথা স্মরণ করে যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তাদের অন্তরে এই সহমর্মিতা ও অনুভূতি স্থাপন করেছেন, এ সম্পর্ককে তাদের অন্তরের শান্তি, শরীরের আনন্দ, জীবনের ও জীবিকার স্থিতি, স্বামী-স্ত্রীর জন্য বন্ধুত্ব এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রশান্তিদায়ক করেছেন"।[২] এই সঠিক চারিত্রিক আচরণ, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর বংশধারা ও ইজ্জত রক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; তার মাঝে সংকীর্ণতা কোথায়?

জাগতিক উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য ক্ষতিকারক লেনদেন ইসলাম হারাম করেছে, যেমন: সুদ। আর তাদের জন্য শরীসম্মত ব্যবসা হালাল করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ অর্থ: [অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।][৩] সুতরাং ইসলাম জাগতিক উপার্জনের সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিনিয়ে নেয় নি, বরং তাকে পরিপাটি করেছে মহান আদর্শের কাঠামোর মাঝে।

অনুরূপভাবে ইসলামী চরিত্রের সহজতা পরিস্ফুটিত হয় মানুষ, প্রাণী এবং উদ্ভীদের অপরিহার্য অনুষঙ্গ খাবার ও পানীয়ের মাঝে। সুতরাং ইসলামী চরিত্র মানুষকে খাবারের নেয়ামত এবং তার স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত করেনি। বরং সে তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে অপচয় না হয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ অর্থ: [তোমরা অপচয় কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।][৪] সাধারণভাবে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ﴾ অর্থ: [আর আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।][৫]

বিধান আরোপের ক্ষেত্রে ইসলামী মানহাযে মানুষের প্রতি এমন কোন দায়িত্ব নেই যা করতে সে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ অর্থ: [আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।][৬] অর্থাৎ, তিনি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। আর

(১) সূরা আর-রুম: (২১)।
(২) ফী যিলালিল কুরআন (৫/২৭৬৩)।
(৩) সূরা আল-বাকারা: (২৭৫)।
(৪) সূরা আল-আ'রাফ: (৩১)।
(৫) সূরা আল-কাসাস: (৭৭)।
(৬) সূরা আল-বাকারা: (২৮৬)।

এটি হল সৃষ্টিজীবের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া এবং করুণা।[১] তিনি আরো বলেন: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ অর্থ: [সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।][২]

ইবনে কাসীর রহিঃ বলেন: অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা ও সামর্থ্য অনুযায়ী। রাসূল সাঃ বলেছেন: (হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না বরং তোমরাই ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়। আর কম হলেও আল্লাহর কাছে স্থায়ী আমল সর্বাধিক পছন্দনীয়।)[৩] তিনি আরো বলেছেন: (আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক এবং যা তোমাদের আদেশ করেছি যথাসম্ভব তা পালন কর।)[৪] ইমাম নববী রহিঃ বলেন: "এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এবং এর মাঝে অগণিত বিধিবিধান রয়েছে"।[৫] আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (রাসূল সাঃ আমার নিকট আগমন করে বললেন: আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি রাতে নফল নামায পড়ছ এবং দিনে রোযা রাখছ?'' আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি নামায পড় এবং নিদ্রাও যাও, রোযা রাখ এবং ছেড়েও দাও। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে, তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে, তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে।)[৬]

এখান থেকে ইসলামী মানহাযে এবং মানব জীবন সুশৃঙ্খল করনে নৈতিক সহজতা এবং ইসলামী উদারতার বিষয়টি ফুটে উঠে। বিপরীত দিকে মানব রচিত মতবাদে, যেমন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা মনে করে যে, সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করা সহজাত বাসনা পরিত্যাগ করা ব্যতীত সম্ভব নয় অথবা পশ্চিমারা যেমন স্বেচ্ছাচারিতার মাঝে ব্যতীত সুখ খুঁজে পায় না।

ইসলামী চরিত্রের সহজতার দিক হল, এটি মানুষের ভুল-ভ্রান্তিকে অস্বীকার করে না। এ জন্য সে তার জন্য তাওবা ও ইস্তেগফারের দরজা উন্মুক্ত রাখে যেন সে তার ভুলের কারণে সর্বদা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় না ভোগে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ অর্থ: [বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।][৭]

আমাদের উপর আবশ্যক হল ভুল-ভ্রান্তিতে না জড়াতে প্রচেষ্টা জারি রাখা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সকল পরিস্থিতিতে কর্তব্যের সঠিক রূপটি আমরা অর্জন করি বরং আমরা যেন অবিরাম প্রচেষ্টা করি যাতে ইসলামী সংবিধান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আমরা তার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলতে

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৩০৫)।
(২) সূরা আত-তাগাবুন: (১৬)।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/৬৭, হা: ৫৮৬১), সহীহ মুসলিম (১/৫৪০-৫৪১, হা: ২১৫-৭৮২)।
(৪) সহীহ মুসলিম (৪/১৮৩০, হা: ৬১৩৪)।
(৫) নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (৯/১০২)।
(৬) সহীহ বুখারী (৪/১১৫-১১৬, হা: ৬১৩৪)
(৭) সূরা আয-যুমার: (৫৩)।

পারি।[১] হানযালাহ আল-উসাইদী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম: (হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূল সাঃ বললেন, সে কি কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। -এ কথা শুনে- রাসূল সাঃ বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! -সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না- কিছু সময় -ইবাদতের জন্য- ও কিছু সময় -সাংসারিক কাজের জন্য-। তিনি এ কথা তিনবার বললেন।)[২]

ইসলামী শিষ্টাচারিতায় এই উদারতা এবং সহজতা বিদয়াতীদের মানহাযের বিপরীত; যারা মনে করে সুলুকের পথ হল প্রথমত সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, অন্তরকে দুনিয়া মুক্ত করা এবং পরিবার, সম্পদ, সন্তান ও দেশের চিন্তা ঝেড়ে ফেলা।

আল্লাহ আমাদের যে জ্ঞানার্জন, আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান এবং সন্তান লালন-পালনের আদেশ দিয়েছেন -এগুলো পালন করতে বাঁধা দেয় মানুষ ও জ্ঞানার্জনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির প্রতি অবহেলা।

ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ﴾ অর্থ: [আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই কেবল তাকে ভয় করে।][৩] ইলম-ই হল আল্লাহর ভয়-ভীতি অর্জন ও তাঁর সন্তোষজন পন্থায় ইবাদত করার পথ। আর লালন-পালনের দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।][৪] দাওয়ার ক্ষেত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ﴾ অর্থ: [আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।][৫]

সুতরাং মানুষ কীভাবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, সহজতাকে কঠিন করে এবং সরলকে জটিল করে?

এ প্রেক্ষিতে আমরা ইসলামে চারিত্রিক সহজতাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে চিহ্নিত দেখতে পায়:

১- ইসলামী আদবসমূহ মানুষের মনুষ্যত্বের বাইরে নয় এবং তাদের সক্ষমতার উর্দ্ধে নয়।

---

(১) মুহাম্মাদ দারাজ, দুস্তুরুল আখলাক (পৃ ৪৪৫)।
(২) সহীহ মুসলিম (৪/২১০৬-২১০৭, হা: ১২-২৭৫০)।
(৩) সূরা ফাতির: (২৮)।
(৪) সূরা আত-তাহরীম: (৬)।
(৫) সূরা আলে-ইমরান: (১০৪)।

২- একজন মুসলিম তার ব্যক্তিগত সক্ষমতা ও সামর্থ্যের মধ্যে ইসলামী শিষ্টাচার ও আদব পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ:

শিষ্টাচার ও চারিত্রিক গুণাবলী

দ্বীন ইসলামের বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অন্তর্গত হল, এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক শিষ্টাচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ; যা ব্যক্তির চারিত্রিক পরিপালন নিশ্চিত করে।

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী রহঃ আদবকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন(১); সেগুলো:

১- আল্লাহর সাথে আদব।

২- রাসূল সাঃ ও তার আনীত শরীয়তের সাথে আদব।

৩- সৃষ্টিজীবের সাথে আদব।

এই অনুচ্ছেদে আমি ইসলামী পরিপালন সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচার ও চারিত্রিক গুণাবলীকে বিভক্ত করব:

প্রথমত: আল্লাহ তায়ালার সাথে আদব।

দ্বিতীয়ত: রাসূল সাঃ এর সাথে আদব।

তৃতীয়ত: মাতা-পিতার সাথে আদব।

চতুর্থত: রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে আদব।

পঞ্চমত: প্রতিবেশির সাথে আদব।

ষষ্ঠত: চারিত্রিক গুণাবলী:

লজ্জাশীলতা।

ধৈর্য।

সত্যবাদিতা।

বিনয়।

সহমর্মিতা ও দয়া।

আমনতদারিতা।

(১) মাদারেজুস সালেকীন (২/৩৯১)।

প্রথমত: আল্লাহর সাথে আদব:

চারিত্রিক পরিপালনের গুরুত্বপূর্ণ ও মহত্তম দিক হল ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর একনিষ্ঠ অনুসরণ এবং কথা ও কাজে আল্লাহর প্রতি খালেস নিয়তের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ভয়, আশা, মহাব্বত এবং ইখলাসের উপর বেড়ে উঠবে। যা নিষ্কলুষ সহজাত স্বভাবকে বিকশিত করবে, তার জন্য সরল পথকে উন্মুক্ত করবে এবং ভ্রষ্টতার পথ থেকে বিরত রাখবে; ফলে সে আল্লাহর সাথে আদব রক্ষাকারী হিসেবে বেড়ে উঠবে।

আল্লাহর সাথে বান্দার আদবের অন্যতম দিক হল, সে আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করবে; কেননা এটি তাওহীদের ওয়াজীব বিষয়ের অন্তর্গত। রাসূল সাঃ আল্লাহর থেকে বর্ণনা করেন: (আমি সেই রূপই যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে।)(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে তাকে তিনি তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেন: ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَيۡءٖۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِۗ﴾ অর্থ: [একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, আমাদের কি কোন কিছু করার আছে? বলুন, সব বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারে।](২)

আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা রাখার অন্তর্গত হল এ বিশ্বাস রাখা যে, তিনি তার বিষয়ে অবগত, তার সম্পাদিত কর্ম এবং তার অন্তর যে কুমন্ত্রণা দেয়; সে ব্যাপারে তিনি জানেন। "সু-ধারণার ভিত্তি হল আল্লাহর রহমত, তাঁর মর্যাদা, অনুগ্রহ, ক্ষমতা, জ্ঞান ও সুন্দর বাছাই এবং তাঁর উপর ভরসাকারীর শক্তি সম্পর্কে জানার উপর। সুতরাং উক্ত বিষয় সম্পর্কে যখন জানা পূর্ণতা পাবে আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা তখন ফলপ্রসূ হবে"(৩)।

রবের সাথে বান্দার আদবের অন্তর্ভুক্ত হল, সে তাকে ভালবাসবে; কেননা "তাঁকে ভালবাসা দ্বীন ইসলামের মৌল বিষয় যার উপর ইসলামের চাকার অক্ষ ঘুরছে। কাজেই আল্লাহর ভালবাসার পূর্ণতার মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা পায় এবং তা হ্রাসের কারণে মানুষের তাওহীদ হ্রাস পায়"(৪)। আর ভালবাসা রাসূল সাঃ এর আনুগত্য এবং তার আনীত বিধিবিধানের অনুসরণ দাবি করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ অর্থ: [বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।](৫) এটাকে মহাব্বতের আয়াত নামে অভিহিত করা হয়(৬)।

রাসূল সাঃ বলেছেন: (তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া। একমাত্র আল্লাহ জন্যই কাউকে ভালবাসা এবং

(১) সহীহ বুখারী (৪/৩৮৪, হা: ৭৪০৫), সহীহ মুসলিম (৪/২১০২)।
(২) সূরা আলে-ইমরান: (১৫৪)।
(৩) শাইখ সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ, তাইসীরুল আজিজিল হামীদ, (পৃ: ৩৩২)।
(৪) আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ, ফাতহুল মাজীদ (পৃ: ৩৩২)।
(৫) সূরা আলে-ইমরান: (৩১)।
(৬) আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ, ফাতহুল মাজীদ (পৃ: ৩৩২)।

কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা।)[১] হাদিসের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ আন্তরিকভাবে বান্দার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হবে অন্যদের থেকে। যেমন কিছু হাদিসে এসেছে: (তোমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে আল্লাহকে ভালবাস।) সুতরাং বান্দা তার সবকিছু দিয়ে এক আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে যেন তিনিই একমাত্র প্রিয়জন এবং উপাস্যতে পরিণত হন। আর সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভালবাসবে তাঁর ভালবাসার অংশ হিসেবে। যেমন সে নবীগণ, রাসূলগণ, ফেরেশতাগণ এবং নেককার বান্দাদের ভালবাসবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালবাসার প্রেক্ষিতে। এটি আল্লাহ যা ভালবাসেন তা ভালবাসা, যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা, তাঁর সন্তুষ্টিকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দেয়া, সাধ্যনুযায়ী তাঁর সন্তোষজনক কাজে চেষ্টা করা এবং তাঁর অপছন্দনীয় বিষয় পরিহার করাকে আবশ্যককারী। আর এগুলো হল খাঁটি ভালবাসার আলামত ও তার আবশ্যিক অনুষঙ্গ।

আল্লাহর সাথে বান্দার আদবের অন্তর্ভুক্ত হল, সে তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে এবং তাঁর নিকট প্রতিদান প্রত্যাশা করবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾ অর্থ: [তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।][২]

"আর আল্লাহর ভয় হল দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ মাকাম"।[৩]যখন সে ভয় করবে তখন সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না বরং সৎকাজের মাধ্যমে তা সে প্রত্যাশা করবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ﴾ অর্থ: [তিনি বললেন, যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার রবের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?][৪]

কাজেই আল্লাহর প্রতি বিনয় ও ভয় এবং সাথে তাঁর রহমত ও ভালবাসা প্রত্যাশার মাধ্যমে বান্দার আদব বজায় রাখা অপরিহার্য। "কেননা যে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভালবেসে ইবাদত করে সে যিন্দিক, যে শুধুমাত্র প্রাপ্তির আশায় তাঁর ইবাদত করে সে মুরজিয়া, যে শুধুমাত্র ভীত হয়ে তাঁর ইবাদত করে সে হারুরী[৫], আর যে ভালবেসে, ভীত হয়ে, প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁর ইবাদত করে সে হল একত্ববাদী মুমিন"[৬]।

আল্লাহর সাথে বান্দার আদবের অন্তর্ভুক্ত হল, সে তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, তাঁর স্মরণকারী এবং রহমানের মুনাজাতে হৃদয় পূর্ণকারী হবে[৭]। আর এটি ইত্তেবার দাবী রাখে যে, তুমি তাঁর ইবাদত করবে যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের খেয়াল-খুশি

(১) সহীহ বুখারী (১/২২, হা: ১৬), সহীহ মুসলিম (১/৬৬, হা: ৬৭/৪৩)।
(২) সূরা আল-আম্বিয়া: (৯০)।
(৩) আব্দুর রহমান আলুশ-শাইখ, ফাতহুল মাজীদ (পৃ: ৩৪৪)।
(৪) সূরা আল-হিজর: (৫৬)।
(৫) যিন্দিক: যে ব্যক্তি কুফুরী গোপন করে এবং বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে।
মুরজিয়াহ: যারা বিশ্বাস রাখে যে, ঈমান আনার পরে পাপ করলে কোন ক্ষতি হয় না যেমন কুফরী অবস্থায় সৎকাজ কোন উপকারে আসে না।
হারুরী: আলী রাঃ সালিশি বিচার মেনে নেওয়ার কারণে যারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। হাশিয়াতু কিতাবিল উবূদিয়্যাহ, ইবনুল কায়্যিম (পৃঃ ২৭)।
(৬) ইবনে তাইমিয়াহ, আল-উবূদিয়্যাহ (পৃঃ ৩৭)।
(৭) মুহাম্মাদ আল-আজুররী, আখলাকুল কুরআন (পৃঃ ১২৮)।

অনুযায়ী নয় এবং তোমার অভ্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়[১]। দাসত্বের আদবের অন্তর্ভুক্ত হল, আল্লাহ সকল কিছুর প্রতিপালক ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এ বিশ্বাস রেখে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে তার অভিমুখী হয়ে, সকল প্রকার ইবাদত তাঁকে প্রদান করে, মহান আল্লাহর কথায় সাড়া দিয়ে এককভাবে তাঁর ইবাদত করা এবং একমাত্র তাঁর অভিমুখী হওয়া: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾ অর্থ: [বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।* তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।][২]

দাসত্বের যে আদবের উপর তরবিয়ত অর্জনকারীদের গড়ে তোলা শিক্ষক ও দায়ীদের কর্তব্য: তা হল, ওজু, সুন্দরভাবে তেলাওয়াত, গভীর চিন্তা-ভাবনা, নিরবতা এবং কুরআন পাঠ করা শুনলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার এ নির্দেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তাঁর কিতাবের সাথে আদব বজায় রাখা: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ অর্থ: [আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।][৩]

নিজের মধ্যে আল্লাহর নজরদারি ও তাঁর ভয় গ্রোথিত করা, বিশ্বাস রাখা যে তিনি ছোট-বড় সবকিছুর উপর অবগত এমনকি আসমান ও জমীনে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন কিছু। তিনি জানেন চোখসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ অর্থ: [আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন—তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।][৪]

তিনি আরো বলেন: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ وَنَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهِۦ نَفۡسُهُۥۖ وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ﴾ অর্থ: [আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর।][৫]

আল্লাহ তায়ালা লুকমানের অসীয়তে বলেন যখন সে তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল: ﴿يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ

---

(১) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩৯১)।

(২) সূরা আল-আন'আম: (১৬২)।
(৩) সূরা আল-আ'রাফ: (২০৪)।
(৪) সূরা আল-হাদিদ: (০৪)।
(৫) সূরা ক্বাফ: (১৬)।

﴿ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ﴾ অর্থ: [হে আমার প্রিয় বৎস, নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার পরিমাণ হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ][১]

দ্বিতীয়ত: রাসূল সাঃ সহ সকল নবীগণ আঃ এর সাথে আদব:

নবীগণের সাথে আদবের বিষয়টি ছোট-বড় মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট হয় যখন সে জানতে পারে নবীগণের অবস্থা, তাঁদের কর্ম এবং তাঁদের রবের রেসালাতের বাণী পৌঁছে দিতে যে কষ্ট-ক্লেশ ও অসুবিধা তাঁরা সহ্য করেছেন। আর এ জন্য নবীগণের জীবনের প্রতিটি অংশে বিরতি দিয়ে, তাঁদের চরিত্র ও নৈতিকতার বিশদভাবে বর্ণনা করে, মানুষের সাথে তাঁদের সদ্ব্যবহার, উত্তম কথপোকথন, বিনয়-নম্রতা, দয়াদ্রতা, অনুগ্রহ এবং দাওয়াত পৌঁছানোর পথে মানুষের পক্ষ থেকে প্রদেয় কষ্টের উপর তাঁদের ধৈর্যের বিষয়টি পরিষ্কার করে শিক্ষক বা মুরুব্বীকে তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করতে হবে।

নবী সাঃ এর সাথে আদবের অন্তর্ভুক্ত হল, হৃদয়ে তাঁর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া তাঁর নির্দেশনা বাস্তবায়নার্থে; যেমন তিনি বলেছেন: (তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান এবং সব মানুষের অপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র হই।)[২] আর রাসূল সাঃ এর মহাব্বত তাঁর সুন্নাত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত জীবনবিধান অনুসরণ করা এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা ও শরীয়ত বহির্ভূত কোন কিছুকে তাতে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবী রাখে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ অর্থ: [রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।][৩]

তিনি আরো বলেন: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾ অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।][৪] রাসূল সাঃ এর মহাব্বত যখন তার নামোল্লেখ করা হয় তখন তার উপর দরূদ ও সালাম পাঠের দাবী রাখে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾ অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোয়া-ইস্তেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।][৫]

---

(১) সূরা লুকমান: (১৬)।
(২) সহীহ বুখারী (১/২২, হা: ১৫), সহীহ মুসলিম (১/৬৭, হা: ৭০-৪৪)।
(৩) সূরা আল-হাশর: (০৭)।
(৪) সূরা আল-আহযাব: (২১)।
(৫) সূরা আল-আহযাব: (৫৬)।

“এ আয়াত থেকে উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট উর্ধ্বজগতের অধিবাসীগণের মাঝে তাঁর বান্দা এবং নবীর মর্যাদার বিষয়ে তাঁর বান্দাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণের নিকট নবীর প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া- ইস্তেগফার করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিম্নজগতের অধিবাসীদের তার উপর দরুদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন; যেন তার প্রশংসা উর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় জগতের বাসিন্দাদের থেকে ধ্বনিত হয়”।(১)আর যে ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর উপর দরুদ পাঠ করে না তাকে তিনি কৃপণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন: (কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার নিকট আমার উল্লেখ করা হল কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পাঠ করল না।)(২) আনুগত্য ও অনুসরণকে আবশ্যককারী এই মহাব্বতের তরবিয়ত অর্জিত হবে তার সীরাত নিয়ে গভীর ও চিন্তাশীল পর্যালোচনা এবং তার সমগ্র জীবনে ছড়িয়ে থাকা শিক্ষা ও চারিত্রিক গুণাবলী আহরণ করার মাধ্যমে। আর পরিপালনের পদ্ধতির অন্যতম হল যে কোন তরবিয়তি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক, মুরুব্বী বা দাঈ ব্যক্তি উপস্থাপন করবে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কেরাম তার সাথে আদব বজায় রেখে কীভাবে আচরণ করতেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।* হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।* নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।](৩) তিনি আরো বলেন: ﴿لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ﴾ অর্থ: [তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহবানের মত গণ্য করো না।](৪)

শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতী রহঃ বলেন: “অর্থাৎ যখন তোমরা তাকে আহ্বান করবে তখন তোমাদের আহ্বান যেন সম্মান, শ্রদ্ধা বিহীন না হয়; যেমন তারা একে অপরের সাথে করে থাকে। সুতরাং তোমরা বলো না: হে মুহাম্মাদ! বরং তোমরা বলবে: হে আল্লাহর রাসূল। আর তোমরা তার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলবে না বরং নিচুস্বরে কথা বলবে”।(৫) রাসূল সাঃ এর মৃত্যুর পরেও তার সাথে আদবের ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে; তাই আমরা শুধু তার নামোল্লেখ করব না। বরং তার সাথে রেসালাতের মর্যাদার বিষয়টি যুক্ত

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৫১৪)।
(২) সুনানে তিরমিযি (৫/৫১৫, হা: ৩৫৪৬) এবং তিনি হাদিসটিকে আনাস রাঃ হতে ছাবেতের সূত্রে গরীব বলেছেন। মুসনাদে আহমাদ (১/২০১), শাইখ আলবানী সহীহুল জামেউস সগীর গ্রন্থে (১/৫৫৭, হা: ২৮৭৮) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৩) সূরা আল-হুজুরাত: (০১-০২)।
(৪) সূরা আন-নূর: (৬৩)।
(৫) মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীতী, তার থেকে লেখেছেন আহমদ কাদেরী (পৃ: ২০৭)।

করে ইয়া রাসূল্লাহ বলব এবং তার উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করব। তার সাথে আদবের অন্তর্ভুক্ত হল কারো কথাকে তার কথার উপর অগ্রাধিকার দিবো না; কেননা যখন কোন বিষয়ে রাসূল রাঃ এর সুন্নাত স্পষ্ট হবে তখন তা অনুসরণ এবং অন্য সকল কিছুর উপর অগ্রধিকার দেয়া ওয়াজিব হবে -সে যেই হোক না কেন! আর এটি হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে আবশ্যক আদব এবং এটি বান্দার সৌভাগ্য ও সফলতার প্রতীক। পক্ষান্তরে এটি ছুটে গেলে মিলবে না স্থায়ী সৌভাগ্য ও অনন্ত সুখ”।(১)

সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র এবং রাসূল সাঃ এর ভালবাসায় তাদের আত্মত্যাগের অন্যতম হল, তাদের কেউ প্রত্যাশা করে যে তাকে হত্যা করে রক্ত প্রবাহিত করা হলেও রাসূল সাঃ যেন সামান্য কষ্ট না পান; যদিও তা কাঁটার আঘাত হয়। খোবাইব রাঃ এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মুশরিকগণ তাকে শূলে চড়িয়ে তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করে বলল, তোমার স্থানে মুহাম্মাদ থাকুক এটা কি তুমি চাও? জবাবে সে বলল: না, মহান আল্লাহর শপথ! আমার মুক্তির বিনিময়ে তার পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হোক; এটিও আমি চাই না।(২)

নবী সাঃ এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র এমনই ছিল এবং এ চরিত্রের উপরই সন্তানদের গড়ে তোলা উচিৎ।

তৃতীয়ত: মাতা-পিতার সাথে আদব।

ইসলামী চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হল একজন ব্যক্তি তার মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে জানবে যা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য সন্তানদের উপর ওয়াজীব করেছে। আর তা হল, তাদের আনুগত্য করা, ভালবাসা, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী হয় না এমন কাজে তাদের সন্তুষ্টি তালাশ করা, তাদের সাথে নম্র আচরণ করা ও ভালবাসা দেখানো, সমবেদনা ও সহানুভূতি জানানো এবং তাদের কোন কথা ও কাজের কারণে চিৎকার না করা ও উফ শব্দ না বলা; আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সাড়া দানের প্রেক্ষিতে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا﴾ অর্থ: [আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।* আর অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।](৩)

সায়্যেদ কুতুব বলেন: "এই কোমল কথামালা এবং অনুপ্রেরণাদায়ক চিত্র দিয়ে কুরআনুল কারীম সন্তানদের হৃদয়ে সদ্ব্যবহার এবং দয়ার আবেগ জাগরিত করে। বার্ধক্যের সম্মান রয়েছে এবং বার্ধক্যের দুর্বলতার একটি বার্তা রয়েছে। আর (عندك) বা 'তোমার জীবদ্দশায়' শব্দটি বার্ধক্য এবং দুর্বলতার অবস্থায় ঠাই ও আশ্রয়ের

(১) আব্দুর রহমান আস-সাদী, তাফসীরুল কারীমির রহমান (৫/৬৭)।
(২) কান্ধালভী, হায়াতুস সাহাবা (পৃ: ৫২৫)।
(৩) সূরা আল-ইসরা: (২৩-২৪)।

তাৎপর্যকে যথাযথভাবে চিত্রিত করে। আর দেখাশোনা এবং আদবের পর্যায়সমূহের মধ্য হতে প্রথম পর্যায় হল, সন্তানের পক্ষ থেকে এমন কোন শব্দ উচ্চারণ না করা যা অসন্তোষ ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে এবং যা তাদের প্রতি অবহেলা এবং দুর্ব্যবহার বুঝায়। আদবের সর্বোচ্চ পর্যায় হল: মাতা-পিতার সাথে সন্তানের কথাবার্তা সম্মান ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ হবে"।[১]

এ জন্য রাসূল সাঃ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের নানা বিষয়ে ধৈর্য ধারণকে জিহাদ হিসাবে গণ্য করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (এক ব্যক্তি নবী সাঃ এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তাদের খেদমত করতে চেষ্টা কর।)[২]

মাতা-পিতাকে পাওয়া বিরাট অর্জন এবং লাভজনক ব্যবসা স্বরূপ; কেননা তারা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের চাবিকাঠি যে তাদের আনুগত্য করে ও তাদের দেখাশোনা করে। আর যে ব্যক্তি তাদের উভয়কে বা একজনকে পেল অথচ জান্নাত ও তার নেয়ামত লাভের জন্য তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করল না; সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হল। এ বিষয়টি হেদায়েত ও রহমতের রাসূল সাঃ বর্ণনা করে বলেন: (তার নাক ধুলিমলীন হোক, আবার তার নাক ধুলিমলীন হোক, আবার তার নাক ধুলিমলীন হোক। জিজ্ঞাসা করা হল, কার হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, এরপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করল না।)[৩]

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার বিরাট নেককাজ। আর সদ্ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার বেশি; যেহেতু সে বেশি কষ্ট সহ্য করে "এবং বেশি যন্ত্রণা, ক্লেশ, রাতজাগা এবং জটিলতার সম্মুখীন হন। মায়েরা তিনটি কঠিন কষ্ট সহ্য করেন যা পিতারা সহ্য করেন না। তন্মধ্যে প্রথমটি হল গর্ভধারণের কষ্ট। দ্বিতীয়টি হল প্রসব বেদনার কষ্ট। আর তৃতীয়টি হল সন্তানকে দুধ পান করানো এবং লালনপালন করার কষ্ট"।[৪]মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ﴾ অর্থ: [আর আমি মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।][৫]

আবু হুরায়রা রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট এস জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা হকদার ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপর তোমার পিতা।)[৬] "এ হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, মায়ের প্রতি মহাব্বত ও দয়া পিতার চেয়ে তিনগুণ বেশি হবে; কেননা রাসূল সাঃ মায়ের বিষয়টি তিনবার

---

(১) সায়্যেদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন (৪/২২২১)।
(২) সহীহ বুখারী (২/৩৫৯,হা: ৩০০৪), সহীহ মুসলিম (৪/১৯৭৫, হা: ৫/২৫৪৯)।
(৩) সহীহ মুসলিম (৪/১৯৭৮, হা: ১০/২৫৫১)।
(৪) আব্দুল্লাহ আব্দুর রহীম, মিনাল আদাব ওয়াল আখলাক (পৃ: ৪৫)।
(৫) সূরা লুকমান: (১৪)।
(৬) সহীহ বুখারী (৪/৮৬, হা: ৫৯৭১), সহীহ মুসলিম (৪/১৯৭৪, হা: ১/২৫৪৮)।

উল্লেখ করেছেন আর পিতার বিষয়টি একবার উল্লেখ করেছেন। আর এর রহস্য সম্পর্কে ইবনু বাত্তাল রহিঃ যেমনটি বলেছেন: ‘‘তিনটি জিনিস পিতার থেকে মা আলাদাভাবে সম্পাদন করে: সেগুলো হল, গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসবের কষ্ট এবং সন্তানকে দুধ পান করানো কষ্ট। এ তিনটি জিনিস মা একাই সম্পাদন এবং কষ্ট করে থাকে। অতঃপর বাবা সন্তান লালনপালনে অংশগ্রহণ করে থাকে’’।[১]

মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্বের কারণে সন্তান যতই তার মাতা-পিতার প্রতি অনুগত ও অনুগ্রহ করুক না কেন সে তাদের প্রতিদান দিতে পারে না; তবে সে উভয়কে যদি ক্রিতদাস অবস্থায় পেয়ে তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: (কোন সন্তান তার পিতার হক পরিশোধ করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি তার পিতাকে ক্রিতদাস হিসেবে পায় এবং তখনই তাকে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দেয়।)[২] ইমাম নববী রহঃ বলেন: ‘‘তার প্রতি অনুগ্রহ বা অধিকার আদায় করে তার প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয় তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা ব্যতীত’’।[৩]

এ জন্য তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের সাথে আদব বজায় রাখা ওয়াজীব; আর আদবের অন্তর্ভুক্ত হল: তাদের নাম ধরে না ডাকা। বরং তাদেরকে বাবা, মা বলে সম্বোধন করা। তাদের নিকট নিজেকে ছোট বুঝাতে কণ্ঠের আওয়াজে কোমলতা প্রকাশ করা। তারদের পূর্বে আসন গ্রহণ না করা, আহার না করা এবং হাঁটার সময় পিতার আগে আগে না চলা; কেননা এগুলো খারাপ আদব এবং নিন্দিত চরিত্রের অন্তর্গত। ‘‘আবূ হুরায়রা রাঃ একজন ব্যক্তিকে অন্য আরেকজনের পশ্চাদে চলতে দেখলেন। তিনি বললেন: লোকটি কে? তিনি বললেন: আমার পিতা। আবূ হুরায়রা রাঃ বললেন: পিতার নাম ধরে ডাকবে না, তার পূর্বে আসন গ্রহণ করবে না এবং তার সামনে সামনে হাঁটবে না’’।[৪]

এই ইসলামী দিকনির্দেশনা থেকে মুরুব্বী বা শিক্ষক মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত একটি তরবিয়তি প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারেন এবং একটি ভাল উদাহরণের মাধ্যমে বাস্তব পদ্ধতি পেশ করতে পারেন যা দ্বারা পিতা-মাতার সাথে তার আচরণ, তারা বেঁচে থাকলে তাদের সাথে উত্তমভাবে বসবাস এবং তারা মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করার মাধ্যমে সদাচরণের বিষয়টি চিহ্নিত হবে। যাতে এটি একটি বাস্তব নমুনা এবং ভাল উদাহরণ হয়ে থাকে তরবিয়তের ময়দানে। অন্য দিক থেকে, সে তার সন্তানদের মাতা-পিতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে উত্তম বসবাসের শিক্ষার উপর গড়ে তুলবে।[৫]

চতুর্থত: ‘আরহাম’ বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে আদব:

আভিধানিক অর্থে (الرحم) রেহেম হল: আত্মীয়তার মাধ্যম। আর রেহেম শব্দের মূল অর্থ সন্তান জন্মের স্থান বা গর্ভাশয়।[৬]

---

(১) মুহাম্মাদ আস-সাফারীনী, গিযাউল আলবাব (১/৩৮৬)।
(২) সহীহ মুসলিম (২/১১৪৮, হা: ২৫/১৫১০)।
(৩) নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (১/১৫৩)।
(৪) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরইয়িয়্যাহ (১/৪৫৩)।
(৫) আস-সাফারীনী, গিযাউল আলবাব (১/৩৭৩-৩৯৩)।
(৬) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১২/২৩২)।

পারিভাষিক অর্থে: "কোন ব্যক্তির বাবা-মায়ের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ককে রেহেম বলে। সুতরাং তাদের প্রতি সুনির্দিষ্ট এবং অতিরিক্ত অধিকার আবশ্যক হবে"।[১] আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হল: "বংশীয় ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণ, সহমর্মিতা, অনুগ্রহ প্রদর্শন করা এবং তাদের অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়া; যদিও তারা বাড়াবাড়ি ও দুর্ব্যবহার করে। আর এর বিপরীত হল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা"।[২]

ইবনু আবি হামজাহ বলেন: "সাধ্যানুযায়ী উপকার করা এবং অপকার দূরীভূত করা উদ্দেশ্য।"।[৩]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হল: আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা।

আত্মীয়দের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক অনুসারে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত ও ছিন্ন হয়। আর আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্ককে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন এমন শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে; যা সম্পর্ককে শক্তিশালী ও বিকশিত করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ অর্থ: [আর আত্মীয়-স্বজনকে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না।][৪]

কাযী ইয়ায রহঃ বলেন: "সাধারণভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজীব এবং তা ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ নেই। তিনি বলেন: অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দয়ে। তবে সম্পর্ক রক্ষার অনেক স্তর রয়েছে যার একটি অপরটি চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তার সর্বনিম্ন স্তর হল একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে পরিহার করা এবং কথা বলার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করা যদিও তা সালামের মাধ্যমে হয়। এটি সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হয়; তন্মধ্যে কিছু ওয়াজীব আর কিছু মুস্তাহাব। কেউ যদি সম্পর্কের কিছু দিক রক্ষা করে কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে ছিন্নকারী বলা হয় না। আর কেউ যদি সে যা করতে সক্ষম এবং তার পক্ষে যা করা উচিত তা করতে ত্রুটি করে তবে তাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা হয় না"।[৫]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে অন্যকে পরিদর্শন করা, দুঃখ-কষ্টে ও আনন্দ-উল্লাসে অর্থ ও শ্রম দিয়ে পরস্পরে অংশগ্রহণ, উপহার প্রদানের মাধ্যমে সহানুভূতি জানান এবং তাদের অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়ার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক অর্জিত হয় ও বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ۝١٩ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ۝٢٠ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ﴾ অর্থ: [আপনার রব হতে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে

(১) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (১৬/১৬৪)।
(২) সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৫৩১)।
(৩) প্রাগুক্ত (৪/১৫৫৩)।
(৪) সূরা আল-ইসরা: (২৬)।
(৫) নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (১৬/১১৩)।

কি তার মত যে অন্ধ? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকসম্পন্নগণই।* যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না।* আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।][১]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হল তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়া, সম্মান করা, উপহার দেয়া, তাদের মাঝে যারা দরিদ্র তাদের দান করা, অসুস্থদের দেখাশোনা করা, তাদের আনন্দে-উৎসবে অংশ নেয়া, তাদের দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দেয়া এবং সে সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যে সকল ক্ষেত্রে তারা আত্মীয়তার কারণে অন্যদের চেয়ে বেশি হক্বদার। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হল তাদেরকে পরিহার করা, সাধ্য থাকার পরও দেখা-সাক্ষাৎ না করা, তাদের আনন্দ-উৎসবে অংশ না নেয়া, তাদের দুঃখে-কষ্টে সান্ত্বনা না দেয়া এবং যে সকল ক্ষেত্রে তারা অধিক হক্বদার সে সকল ক্ষেত্রে অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়া।[২] মহান আল্লাহ বলেন: ﴿فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ وَأَعۡمَىٰٓ أَبۡصَٰرَهُمۡ﴾ অর্থ: [সুতরাং অবাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে সম্ভবত তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।* এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, ফলে তিনি তাদের বিধির করেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করেন।][৩]

সুতরাং ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মর্যাদা অনেক বড় এবং এর গুরুত্ব অনেক বেশি। যেহেতু এ সম্পর্কে নবী সাঃ হাদিসে এমন বক্তব্য এসেছে যা তার গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হল সম্পর্ক রক্ষাকারীর প্রতি আল্লাহ তায়ালার দানের কারণ। পক্ষান্তরে তা ছেদ করা আত্মতীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছেদের দিকে নিয়ে যায়। সহীহ মুসলিমে এসেছে নবী সাঃ বলেছেন: (আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।)[৪] এ হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হল আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব, তা রক্ষার ফযিলত এবং তা ছিন্নকারীর গুরুত্বর পাপ বুঝান।[৫]

অনুরূপভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা প্রশস্ত রিযিক ও জীবনে বরকত লাভের অন্যতম দ্বার। নবী সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে।)[৬]

পঞ্চমত: প্রতিবেশীর সাথে আদব:

আভিধানিক অর্থে (الجار) বা প্রতিবেশী:

(১) সূরা আর-রাদ (১৯-২১)।
(২) আব্দুর রহমান আল-মায়দানী, আল-আখলাক আল-ইসলামিয়্যাহ (২/৩৬-৩৭)।
(৩) সূরা মুহাম্মাদ (২২-২৩)।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/৯৫-৯৬, হা: ৬০২৪) সহীহ মুসলিম (৪/২০০৩-২০০৪, হা: ৭৭/২৫৯৩)।
(৫) নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (১৬/১১২)।
(৬) সহীহ বুখারী (৪/৮৯, হা: ৫৯৮৫) সহীহ মুসলিম (৪/১৯৮২, হা: ২০/২৫৫৭)।

'লিসানুল আরব' অভিধানে এসেছে: প্রতিবেশী সেই ব্যক্তি যার গৃহ আপনার গৃহের পাশে অবস্থিত। প্রতিবেশীর অন্য আরো অর্থ হল: স্থাবর সম্পত্তিতে অংশীদার, মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ, সাহায্যকারী এবং ব্যবসায় অংশীদার ব্যক্তি।(১)

পারিভাষিক অর্থে (الجار) বা প্রতিবেশী: প্রতিবেশীর আভিধানিক অর্থ পারিভাষিক অর্থ থেকে ভিন্ন নয়।

"বিজ্ঞজনেরা প্রতিবেশিত্বের সীমা নির্ধারণে মতভেদ করেছেন। ইমাম আওজায়ী রহঃ বলেন: চতুর্দিক থেকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত হল প্রতিবেশী। ইমাম যুহরীও এমনটিই বলেছেন"।(২)

মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ﴾ অর্থ: [আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও কোন কিছুকে তার শরীক করো না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দুর-প্রতিবেশী।](৩)

ইবনে হাজার রহঃ বলেন: "নিকট প্রতিবেশী হল যাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর দূর প্রতিবেশী হল নিকট প্রতিবেশির বিপরীত। এটিই অধিকাংশের মত"।(৪)

এ কথা থেকে উদ্দেশ্য হল প্রতিবেশী দুই প্রকার: প্রথমত এমন প্রতিবেশী যাদের সাথে আত্মীয়তা ও প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। দ্বিতীয়ত এমন প্রতিবেশী যাদের সাথে শুধুই প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক রয়েছে।

পূর্ববর্তী অর্থসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রতিবেশী ঘরের নিকটবর্তী এবং আল্লাহর পরে তার জন্য সাহায্যকারী হওয়ার দরুন অংশীদারের সমপর্যায়ের। যদি বিপদাপদ তাকে বেষ্টন করে এবং দুর্যোগ তাকে শঙ্কিত করে তাহলে আল্লাহর পরে সে যার নিকট সর্বপ্রথম সাহায্য চায় সে হল তার প্রতিবেশী; কেননা সে সবচেয়ে কাছের মানুষ। যদি তাদের স্বভাব-চরিত্র ইসলামী আদর্শের অনুরূপ হয় তাহলে প্রতিবেশিত্বের উপর ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সদুপোদেশ ও দান-উপহার প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এর মাধ্যমে ছোট-বড় সকলেই প্রভাবিত হয়। আর যদি তাদের স্বভাব-চরিত্র ইসলামী আদর্শের বিপরীত হয় তাহলে বিরোধ বিরাজ করে, তাদের সম্পর্কের উপর মতভেদ আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাদের প্রত্যেকে অন্যের অধিকার ও অনুভূতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। আর এভাবেই এটি ছোটদের মাঝে প্রসারিত হয় ফলে তারা প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও দুর্ব্যবহার করার অভ্যাসের উপর বেড়ে উঠে।

সুতরাং প্রতিবেশের সম্পর্কের জন্য এমন কাউকে প্রয়োজন যে তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিবে যাতে প্রতিবেশের পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব কল্যাণ ও বরকতের প্রভাবে পরিণত হয় এবং তা সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। আর ইসলামই একমাত্র মানহায যা তার ঐশ্বরিক মানহাযের সাথে নিশ্চিত করে, যদি প্রতিবেশের সম্পর্ক বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সমাজের সর্বত্র উত্তম চরিত্র বিরাজ করবে এবং সবাই শান্তি, ভালবাসা এবং সম্প্রীতির সাথে বসবাস করবে।

(১) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (৪/১৫৪)।
(২) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (৫/১২১)।
(৩) সূরা আন-নিসা: (৩৬)।
(৪) ইবনে হাজার ফাতহুল বারী (১/৪৪১)।

ইসলামে প্রতিবেশের বিরাট মর্যাদা রয়েছে, কারণ “আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নবীর জবানে প্রতিবেশকে রক্ষা ও তার অধিকার আদায় এবং দায়-দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ তায়ালা প্রতিবেশের বিষয়টি মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরেই উল্লেখ করেছেন”।[১] যেমনটি পূর্বের আয়াতে এসেছে এবং অনেক নববী নির্দেশনাতেও প্রতিবেশির প্রতি অসিয়তের কথা এসেছে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেন: (জিবরীল আঃ সর্বদা আমাকে প্রতিবেশির ব্যাপারে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হয় যে, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন।)[২]

সুতরাং প্রতিবেশ প্রতিবেশির প্রতি সদ্ব্যবহার, অনুগ্রহ, উত্তমভাবে মেলামেশা, সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করা, তার সন্তানদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করা এবং তাকে সদুপোদেশ দেয়া, তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা সহ আরো অন্যান্য ইসলামী শিষ্টাচারের প্রয়োজন বোধ করে; যার মধ্য হতে গুটিকয়েক বিষয় নিম্নে স্পষ্ট করা হল:

১- গভীর জ্ঞানার্জন, শিক্ষা গ্রহণ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে পারস্পরিক সহায়তা করা; কেননা এর মধ্য দিয়ে সমন্বিত সামাজিক বিকাশ সাধিত হয় এবং এতে রয়েছে প্রশংসনীয় ইসলামী শিষ্টাচার গ্রহণের সুযোগ। নবী সাঃ প্রতিবেশীদের জ্ঞানার্জন এবং একে অন্যকে উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দিতেন। ইমাম হাইছামী স্বীয় গ্রন্থে হাদিস বর্ণনা করেন, নবী সাঃ একদা আলোচনা করলেন। তিনি কতিপয় লোকের উত্তম প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন: “লোকেদের কী হয়েছে যে তারা প্রতিবেশীদের বিধিবিধান সহ প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেয় না, তাদের উপদেশ দেয় না এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না! লোকদের কী হয়েছে যে তারা প্রতিবেশীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, গভীর জ্ঞানার্জন করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না”।[৩]

আর এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম রা: ছিলেন নববী দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইলম অর্জনে উমর রাঃ এর আগ্রহের অংশ হল যে, তিনি তার প্রতিবেশির সাথে পালাক্রমে রাসূল সাঃ এর কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করতেন। ইবনু আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, নিশ্চয় উমর রাঃ বলেন: (আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনী উমাইয়্যা ইবনু যায়দের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি ছিল মদিনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত। আমরা দু’জনে পালাক্রমে রাসূল সাঃ এর খিদমতে হাজির হতাম। তিনি একদিন আসতেন আর আমি একদিন আসতাম। আমি যেদিন আসতাম সেদিনের অহী প্রভৃতির খবর নিয়ে তাকে পৌঁছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন।)[৪]

প্রতিবেশের আবশ্যিক অনুষঙ্গের অন্তর্গত হল: হৃদ্যতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, কল্যাণ কামনা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ।

২- কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা:

প্রতিবেশের কর্তব্য এবং অধিকারসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম হল: প্রতিবেশীকে নিজে এবং বাচ্চাদের দ্বারা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা; চাই হাত বা জিহ্বা অথবা ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে হোক। কেননা আবূ হুরায়রা রাঃ

(১) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (৫/১২০)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/৯৪, হা: ৬০১৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০২৫, হা: ১৪০/২৬২৪)।
(৩) নূরুদ্দীন আল-হাইছামী, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ (১/১৬৪)।
(৪) সহীহ বুখারী (১/৪৯, হা: ৮৯)।

হতে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি বলল: (হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা বেশি বেশি সালাত আদায় করে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা অল্প সিয়াম রাখে, দান-খয়রাত করে ও সালাত আদায় করে। আর সে পাত্র ভর্তি পনির সাদকা করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতে যাবে।)[১] রাসূল সাঃ বলেছেন: (আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।)[২]

নবী সাঃ ঐ ব্যক্তির মুমিন হওয়াকে অস্বীকার করেছেন যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না। এটি প্রতিবেশীর অধিকার ব্যাপক হওয়া বুঝানোর ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

নবী সাঃ বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন: (যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।)[৪]

এগুলো হল নববী তরবিয়তি দিকনির্দেশনা, যা নির্দেশ করে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া এবং তার বিরাট অধিকারের উপর। আর প্রতিবেশের আচরণ গ্রহণ করা হল জান্নাতের পথ। কাজেই পরিবার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হল পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে এ আদবসমূহকে বিকশিত করা।

৩- **প্রতিবেশির সাথে সহনশীল আচরণ করা** তার কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে। তার প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ান এবং ছোটখাট বিষয়েও তাকে সহাযোগিতা করা; যেমন প্রতিবেশীকে তার বাড়ির দেয়ালে খুঁটি বসাতে অনুমতি দেয়া। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে বাঁধা না দেয়।)[৫]

এই হাদিসটি প্রতিবেশীর অধিকারের বড়ত্ব এবং উত্তম আখলাকের সাথে তার সঙ্গে মেলামেশার গুরুত্বের উপর নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে এই মেলামেশার আচরণগত প্রভাব রয়েছে যা প্রতিবেশী ছাড়াও উঠতি প্রজন্মের উপর প্রতিফলিত হয়।

প্রতিবেশীর অধিকার শুধু কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাই নয়; বরং কষ্ট সহ্য করা, তার প্রতি সদয় হওয়া, প্রথমে তাকে সালাম দেয়া, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, বিপদে তাকে সান্ত্বনা দেয়া, উৎসবে তাকে অভিনন্দন জানানো, তার আঘাতকে উপেক্ষা করা, তার গৃহে উঁকি না দেয়া, তার ঘরের দেয়ালে খুঁটি গেড়ে তাকে বিরক্ত না করা, তার নর্দমায় পানি না ঢালা, তার উঠানে মাটি নিক্ষেপ না করা, তাকে পর্যবেক্ষণে না রাখা, প্রতিবেশীর

---

(১) মুসনাদে আহমদ (২/৪৪০)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/৯৪, হা: ৬০১৬), সহীহ মুসলিম (১/৬৮, হা: ৭৩/৪৬)।
(৩) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৪৪২)।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/৯৪,হা: ৬০১৮), সহীহ মুসলিম (১/৬৮, হা: ৭৪/৪৭)।
(৫) সহীহ বুখারী (২/১৯৫, হা: ২৪৬৩), সহীহ মুসলিম (৩/১২৩০, হা: ১৩৬/১৬০৯)।

সতরের কোন অংশ প্রকাশ পেলে তা গোপন রাখা, তার কথা কান লাগিয়ে না শোনা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা।[১]

৪- **প্রতিবেশীকে দান করা ও হাদিয়া প্রদান করা**: আর তা হল প্রতিবেশীকে ঘরে প্রস্তুতকৃত খাবার প্রদান করা; এর ফলে ভালবাসা ও উত্তম আচরণ তৈরি হয় এবং অভাব ও মন্দ দূরীভূত হয়। "এক প্রতিবেশী কখনো তার আরেক প্রতিবেশীর পাতিলের খাবারের সুঘ্রাণে কষ্ট পেতে পারে। কখনো তার ছোট সন্তান-সন্ততি থাকতে পারে; ফলে তাদের বাসনা জাগ্রত হয় এবং তাদের অভিভাবকের জন্য বিষয়টি বড় কষ্টকর হয়। বিশেষত তাদের অভিভাবক যদি দরিদ্র অথবা বিধবা হয় তখন তাদের কষ্ট, যাতনা এবং আফসোস তীব্রতর হয়"।[২] আবূ যার রাঃ কে বলে নবী সাঃ প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখার বিষয়ে মুসলিম জাতিকে নির্দেশনা দিয়েছেন: (হে আবূ যার! তোমরা যখন তরকারি রান্না করো তখন পানি একটু বেশি করে দিও এবং প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রেখ।)[৩]

প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ ঈমানের পূর্ণতার অন্তর্ভূক্ত। আর জাহেলী যুগের লোকেরাও তা সংরক্ষণ করত। অসীয়ত পালিত হবে সাধ্যানুযায়ী প্রতিবেশীর প্রতি নানা অনুগ্রহ করার মাধ্যমে; যেমন হাদিয়া প্রদান, সালাম দেয়া, হাস্যজ্জ্বোল মুখে সাক্ষাৎ করা, অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়া এবং তার প্রয়োজন পূরণ করা ইত্যাদি। আর তাকে সকল প্রকার শারীরিক মানসিক কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।[৪]

এটাই যদি জাহেলী যুগের লোকদের চরিত্র হয় যারা ছিল মূলত কাফের তাহলে মুসলিমরা প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের আদর্শ গ্রহণ করার অধিক উপযুক্ত; কেননা এটি তাদের দ্বীন ইসলামের বিধান যার প্রতি আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর সুন্নাতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

প্রতিবেশের অধিকার পাবে সর্বাধিক নিকটবর্তী প্রতিবেশী। আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। তাদের মধ্য হতে আমি কাকে হাদিয়া প্রদান করব? তিনি বললেন: এ দু'জনের মাঝে যার দরজা তোমার বেশি নিকটে।)[৫] অনুরূপভাবে একজন মুসলিমের জন্য শোভনীয় হল, যে কোন খাবার প্রতিবেশীকে দিতে দ্বিধান্বিত না হওয়া। নবী সাঃ বলেছেন: (কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হলেও।)[৬] ইবনে হাজার রহঃ বলেন: "অর্থাৎ, এক প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীকে হাদিয়া দিতে তুচ্ছ মনে না করে যদিও অধিকাংশ সময় হাদিয়া প্রদানকৃত বস্তুটি উপকার লাভের অযোগ্য হয়। হাদিসটির অর্থ এমন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, একটি বিষয়ে নিষেধ করে তার বিপরীত বিষয় করার নির্দেশ বুঝান। আর সে নির্দেশিত বিষয় হল পারস্পরিক হৃদ্যতা এবং ভালবাসা। যেন তিনি বলেছেন: এক প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর সাথে হাদিয়া প্রদানের মাধ্যমে হৃদ্যতা বজায় রাখে

(১) ইবনু কুদামা আল-মাকদেসী, মুখতাসারু মিনহাজিল কাসেদীন (পৃ: ১১৬)।
(২) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (৫/১২১)।
(৩) সহীহ মুসলিম (৪/২০২৫, হা: ১৪২/২৬২৫)।
(৪) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৪৪২)।
(৫) সহীহ বুখারী (২/১২৯, হা: ২২৫৯)।
(৬) সহীহ বুখারী (৪/৯৪, হা: ৬০১৭), সহীহ মুসলিম (২/৭১৪, হা: ৯০/১০৩০)।

যদিও প্রদেয় বস্তুটি তুচ্ছ হয়। এ বিষয়ে ধনী-গরীব সমান। বিশেষ করে নারীদের নিষেধ করা হয়েছে কেননা তারা ভালবাসা ও ঘৃণা উৎপন্ন হওয়ার পাত্রী”।[১]

পরিবার তার সদস্যদের নিকট যে খাবার বা ফলমূল রয়েছে তা প্রতিবেশীদের দেয়ার শিক্ষার উপর গড়ে তুলবে; যাতে তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

হাদিয়া হল হৃদ্যতার বাহক। এটি ভালবাসা অনায়ন করে, সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এবং প্রতিবেশীদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। হাদিয়া প্রদান উত্তম চরিত্র, ভাল স্বভাব এবং প্রশংসনীয় আচরণের অন্তর্ভূক্ত। নবী সাঃ বলেছেন: (তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পরিক সম্প্রীতি লাভ করবে।)[২] আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: (আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু’জন প্রতিবেশী রয়েছে। তাদের মধ্য হতে আমি কাকে হাদিয়া প্রদান করব? তিনি বললেন: এ দু’জনের মাঝে যার দরজা তোমার বেশি নিকটে।)[৩]

এ ধরণের নববী হাদিস পরিবারের সদস্যদের নিকট ব্যাখ্যা করা, তাদের অনুমতি প্রার্থনা ও তাদের নিকট প্রবেশের আদব বর্ণনা করার মাধ্যমে এবং প্রতিবেশীদের সতর বা গোপন বিষয় অবগত হওয়া, তাদের গোপন আলাপ শোনা, তাদের নিকট যা আছে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া অথবা যা দেখেছে তা বর্ণনা করা থেকে তাদেরকে সতর্ক করার মাধ্যমে পরিবারের লালন-পালন ভূমিকা রাখে এর সদস্যদের প্রতিবেশীদের ভালবাসতে, তাদের সহযোগিতা করতে এবং তাদের প্রতি সৌজন্যশীল হতে। যদিও তারা এমন বিষয়ে সংবাদ দেয় যা তারা প্রত্যক্ষ করেছে বা শ্রবণ করেছে; তাদেরকে চুপ থাকার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাদেরকে বুঝাতে হবে যে এরূপ আচরণ প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। কেননা এতে তাদের গোপনীয়তা প্রকাশের বিষয় রয়েছে। অন্যদিকে, মাতা-পিতা তাদের প্রতিবেশীদের একান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করবে না। যেমন এরূপ বলা: তুমি তাদের কী করতে দেখলে? বা তাদেরকে কী বলতে শুনলে? বা তাদের নিকট কিছু দেখেছ কি? কেননা এ ধরণের প্রশ্ন বাচ্চাদেরকে পরবর্তী সাক্ষাতের সময় বিষয়গুলো অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে উৎসাহিত করে এবং সে সংবাদ দেয়া শুরু করবে তাকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই।

আর কিছু পরিবার যে খারাপ চারিত্রিক লালন-পালনের সমস্যায় ভুগছে তন্মধ্যে একটি হল, যা তাদের সন্তানদেরকে প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশীর সন্তানদের সাথে আক্রমণাত্মক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপ বিষয় শিশুর মাঝে আক্রমণাত্মক আচরণের জন্ম দেয় ফলশ্রুতিতে সে অন্যদের সাথে একই ধরণের আচরণ করে।[৪]

ইসলামী লালন-পালনের পদ্ধতিতে প্রয়োজন হল, সন্তানদেরকে প্রতিবেশীর অধিকার এবং প্রতিবেশীর পরিবার, সম্মান ও সম্পদের ক্ষতি না করা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। আর সমীচীন হল প্রতিবেশীর পরিবারের দিকে দৃষ্টি না দেয়া, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা, তাদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা ইত্যাদি ইসলামী পরিপালনীয় আদব সম্পর্কে সন্তানদের সচেতন করা।

ষষ্ঠত: চারিত্রিক গুণাবলী:

---

(১) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৪৪৫)।
(২) মুসনাদে আবি ইয়ালা (১১/৯, হা: ৬১৪৮)। শায়খ আলবানী জামেউস সগীরে (৩০০৪) হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।
(৩) সহীহ বুখারী (২/১২৯, হা: ২২৫৯)।
(৪) আব্দুল হামিদ হাশেমী, আল-মুরশিদ ফি ইলমিন নাফস (পৃ: ৩০৮)।

-লজ্জাশীলতা।

আভিধানিক অর্থে (الحياء) বা লজ্জা হল: শালীন ও লজ্জিত হওয়া। ভাষাবিদ ইস্পাহানী বলেন: ‘‘লজ্জা হল নিকৃষ্ট কাজ থেকে নিজেকে সংযত রাখা’’।[১]

পারিভাষিক অর্থে লজ্জা হল: এমন স্বভাব যা নিকৃষ্ট কাজ পরিহারে উৎসাহিত করে এবং হকদারের অধিকার প্রদানে অবহেলাকে প্রতিরোধ করে।[২]

লজ্জাশীলতা দুই প্রকার: জন্মগত; যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্জনীয়; যা মানুষ অর্জন করে থাকে, হয় উপদেশ ও শিক্ষার মাধ্যমে অথবা অন্যদের সাথে মেলামেশা ও তার ফলে মন্দকে মন্দ মনে করা, পঙ্কিলতাকে পঙ্কিল মনে করা ও ভালকে ভাল মনে করার দ্বারা যে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয় তার মাধ্যমে অথবা নৈতিক অবক্ষয় ও লজ্জাহীনতার শাস্তির ভয়ের মাধ্যমে। ইবনে মুফলেহ বলেন: ‘‘একাধিক বিদ্বান বলেছেন, সকল সৎকাজের ন্যায় লজ্জা কখনো অর্জনীয় হতে পারে। আবার কখনো তা সহজাত হতে পারে। লজ্জাকে শরীয়া মোতাবেক ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন আমল ও নিয়ত’’।[৩] অনুরূপ উক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন ইবনে রজব রহঃ, তিনি বলেন: ‘‘লজ্জা দুই প্রকার: প্রথমত: যা সহজাত ও জন্মগত, অর্জনীয় নয়। এটি হল সর্বোত্তম আখলাকের অন্তর্গত যা আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে দান করেন এবং যার উপর তাকে সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত: যা অর্জনীয়। যেমন আল্লাহ সম্পর্কে জানা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তিনি তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী ও তাদের বিষয়ে অবগত এবং চোখসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন; ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা। এটি ঈমানের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বরং এটি ইহসানের সর্বোত্তম স্তরের অন্তর্ভুক্ত’’।[৪] কেননা উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি তা অর্জন করেছে আল্লাহর আনুগত্য এবং ভালবাসার আশায়। আর ঈমানের অন্তর্গত হল আল্লাহর জন্যই লজ্জশীলতা অর্জন করা। এর মাধ্যমে লজ্জা হল ঈমানের মূলের অন্তর্ভুক্ত; কেননা রাসূল সাঃ বলেছেন: (ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখার রয়েছে অথবা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তম শাখা হল ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাহ’’ বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানে একটি বিশেষ শাখা।)[৫]

সুতরাং অর্জনযোগ্য লজ্জাশীলতা লাভ করার জন্য তরবিয়তি প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সেই সাথে আল্লাহর নজরদারির বিষয়টি স্মরণ রাখা; যাতে আল্লাহ তাকে পাপাচারে লিপ্ত অবস্থায় দেখার বিষয়ে সে লজ্জিত হয়। আর এ জন্য শরীয়ত অনুযায়ী লজ্জা অর্জন, জ্ঞান এবং নিয়তের প্রয়োজন অনুভব করে। এ কারণেই লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাঃ ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বাধিক লজ্জাশীল এবং পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী; এমনকি আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাঃ বলেন: (পর্দার ভেতরে কুমারীদের চেয়েও নবী সাঃ বেশি লাজুক ছিলেন। যখন তিনি অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন তখন আমরা তার চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম।)[৬]

---

(১) আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত (পৃ: ১৪০)।
(২) সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৬০৬)।
(৩) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরইয়্যাহ (২/২২৬-২২৭)।
(৪) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (পৃ: ১৯০)।
(৫) সহীহ বুখারী (১/২০, হা: ৯), সহীহ মুসলিম (১/৬৩, হা: ৫৮/৩৫)।
(৬) সহীহ বুখারী (৪/১১০, হা: ৬১০২), সহীহ মুসলিম (৪/১৮০৯-১৮১০, হা: ৬৭/৩২২০)।

লজ্জাশীলতার বিরাট ফযিলত রয়েছে এবং আচরণে এর ব্যাপক প্রভাবে রয়েছে; কেননা এর পরিধি মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। যেমন: তার গৃহে, তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে মেলামেশায়, তার আমলে, তার বাজার-ঘাটে যাতায়াতে এবং তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলাপচারিতায়। এ জন্য লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণকর; যেমনটি বলেছেন রাসূল সাঃ (লজ্জার সবটাই কল্যাণকর।)[১] লজ্জার ফযিলতের অন্তর্ভুক্ত হল যে এটি আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়। যেমন রাসূল সাঃ বলেছেন: (নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বড় লজ্জাশীল ও পর্দাশীল। তিনি লজ্জাশীলতা এবং পর্দা করাকে বেশি পছন্দ করেন। তাই তোমাদের কেউ গোসল করতে গেলে সে যেন পর্দা অবলম্বন করেন।)[২] লজ্জা শুধু মানুষকে কল্যাণের দিকেই পরিচালিত করে এবং শুধু কল্যাণই আনায়ন করে।

কিছু মানুষ লজ্জাকে ভুলভাবে বুঝে থাকে; ফলে সে সত্যকথা বলার ক্ষেত্রে লাজুকতাকে এবং অসৎকাজে নিরবতাকে লজ্জা মনে করে থাকে। অথচ এটি হল কাপুরুষতা এবং সকল অকল্যাণের চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে লজ্জাশীলতা হল সকল কল্যাণের চাবিকাঠি এবং জান্নাতের পথ। সুতরাং যে লাজুকতা তার সীমা অতিক্রম করে অসৎকাজে বাঁধা প্রদান এবং সত্যকথা বলার সময় নিরবতা অবলম্বনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়; তা লজ্জার কোন অংশ নয়। বরং তা হল সত্যকথা বলায় ত্রুটি, দুর্বলতা, ভয় এবং কাপুরুষতা। ‘‘এ কারণে লাজুকতা নিন্দিত; যেহেতু এর মাঝে সীমালঙ্ঘনের বিষয় রয়েছে। এ দৃষ্টিকোন থেকে পূর্বের বিদ্বানগণ লাজুকতাকে দুর্বলতা এবং তা কখনো রিযিক নষ্টের কারণ হতে পারে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন: ‘লাজুকতা রিযিক প্রাপ্তিতে বাঁধা প্রদান করে’। বেজায়গায় ব্যক্তির লজ্জাশীলতার প্রকাশ দুর্বলতা’’। ইমাম সানআনী রহঃ বলেন: ‘‘তুমি যদি বল যে লজ্জা তো কখনো কখনো ব্যক্তিকে অসৎকাজে বাঁধা প্রদান থেকে নিবারণ করে; যা হল আবশ্যকীয় বিষয় পালনে ত্রুটি হিসেবে গণ্য, তাহলে ‘লজ্জা শুধু কল্যাণই আনায়ন করে’ এ কথার ব্যাপক অর্থ পূর্ণতা পায় না! সানআনী রহঃ বলেন, এর জওয়াবে বলা যায় যে, হাদিসে বর্ণিত লজ্জা দ্বারা শরয়ী লজ্জা উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকীয় বিষয় পরিহার করা থেকে যে লজ্জার সৃষ্টি হয় তা শরয়ী লজ্জা নয়; বরং তা অক্ষমতা ও নীচতা। আর শরয়ী লজ্জার সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে তাকে লজ্জা হিসেবে অভিহিত করা হয়’’।[৩] এ জন্য অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে লজ্জাশীলতা হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, যেমন: সত্যকথা বলা থেকে নিরবতা পালন করা। অনুরূপভাবে লাজুকতার খারাপ দিক হল এটি তার অধিকারীকে শিক্ষা লাভ এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মুজাহিদ রহঃ বলেন: ‘‘লাজুক এবং অহংকারী ব্যক্তি ইলম অর্জন করতে পারে না’’।[৪]এ জন্য আনসারী মহিলারা দ্বীনের আবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনে লজ্জা করত না। ফলে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ তাদের প্রশংসা করে বলেন: (আনসারদের মহিলারা কতই না ভাল! লজ্জা তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখে না।)[৫]

কাজেই মানবজাতির কল্যাণ হল হৃদয়ে আল্লাহর ব্যাপারে ভয়-ভীতি ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা এবং তিনি তাদেরকে এমন কাজ ও কথার অবস্থায় দেখবেন যা তিনি অনুমোদন করেন না -এ ব্যাপারে লজ্জা করা। যুন নূন বলেন:

(১) সহীহ মুসলিম (১/৬৪, হা: ৬১/৩৭)।
(২) সুনানে আবু দাউদ (৪/৩০২, হা: ৪০১২), নাসায়ী (১/২০০, হা: ৪০৬), শাইখ আলবানী সহীহুল জামেউস সগীরে (১/৩৬১, হা: ১৭৫৬) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৩) সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৬০৬)।
(৪) সহীহ বুখারী (১/৬৩)।
(৫) সহীহ বুখারী (১/৬৩), সহীহ মুসলিম (১/২৬১, হা: ৬১/৩৩২)।

“লজ্জাশীলতা হল হৃদয়ে শ্রদ্ধার উপস্থিতি এবং তোমার রবের নিকট অতীত কৃতকর্মের ব্যাপারে ভীত হওয়া”।[১]

সুতরাং লজ্জা মানুষকে কথা ও কাজে মন্দকে পরিহারে দিকে পরিচালিত করে যাকে লজ্জা করা হয় তার নির্দেশ পালন ও তার থেকে লজ্জা পাওয়ার অংশ হিসেবে। আর যাকে সবচেয়ে বেশি লজ্জা পাওয়া হয় তিনি হলেন সেই সত্ত্বা যিনি মানুষকে অগণিত নেয়ামত প্রদান করেছেন এবং অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং কারো থেকে যদি লজ্জাশীলতার পরিপন্থী কোন কিছু প্রকাশ পায় ফিরে আসবে এবং তাওবা করবে। আল্লাহর ভয়হীন লজ্জা ব্যক্তির থেকে চলে যায়, যখন সে মানুষের থেকে দূরে থাকে অথবা অপরিচিত জনদের মাঝে থাকে। তাই লজ্জার উৎস হওয়া উচিৎ আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর ভয়।

-ধৈর্য:

আভিধানিক অর্থে ধৈর্য হল: অস্থিরতা ও অধৈর্যতার বিপরীত। অস্থিরতা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আর ‘তাসাব্বুর’ অর্থ হল ধৈর্য ধারণ করা।[২]

পারিভাষিক অর্থে ধৈর্য হল: হৃদয়ের গুণাবলীসমূহের মধ্য হতে একটি উত্তম গুণ যা অসুন্দর কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আত্মার একটি শক্তি যার মাধ্যমে এর অবস্থা সংশোধিত হয় ও বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। উমর বিন উসমান আল-মাক্কী রহঃ বলেন: “ধৈর্য হল আল্লাহর সাথে অবিচল থাকা এবং তাঁর দেয়া বিপদাপদগুলো প্রশস্ত হৃদয়ে ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ করা”।[৩]

আর আল্লাহ তায়ালা সে সকল ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন যারা সহনশীলতা, ক্রোধ সংবরণ ও অস্থিরতা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করে এবং ধৈর্য ধারণের সাথে সাথে তারা বলে ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ূন’। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ﴾ অর্থ: [আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।* যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।* এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।][৪]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য ধারণ, অন্তরকে ধৈর্য ধারণে উদ্দীপ্ত করণ এবং অপছন্দনীয় ও অনাকাঙ্খিত বিপদাপদে অস্থির না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম

---

(১) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/২৭০)।
(২) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (৪/৪৩৮-৪৩৯)।
(৩) ইবনুল কায়্যিম, উদ্দাতুস সাবেরীন (পৃ: ১৭)।
(৪) সূরা আল-বাকারা (১৫৫-১৫৭)।

হতে পার।][১] হাসান বসরী রহঃ বলেন: "মুসলিমদেরকে তাদের জন্য মনোনীত দ্বীন ইসলামের উপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা যেন সুসময়ে, দুরাবস্থায়, কষ্টে এবং সুখে তা পরিত্যাগ না করে; যাতে তারা মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করে। তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা ধৈর্যের সাথে সে সকল শত্রুদের মোকাবেলা করে যারা তাদের ধর্মকে গোপন রাখে। এরূপ উক্ত করেছেন একাধিক সালাফ"।[২] মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا﴾ অর্থ: [আর আপনি নিজকে ধৈর্যের সাথে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি দুনিয়ার জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না।][৩]

ধৈর্য হল কল্যাণ ও সফলতার বাহন এবং চারিত্রিক গুণাবলীর স্তম্ভ ও কেন্দ্রবিন্দু। কারণ সমস্ত উত্তম গুণাবলী ধৈর্যের উপর তাদের স্থিতিশীলতার জন্য নির্ভর করে। আর কোন ব্যক্তি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার ধৈর্যের ভিত্তি মজবুত হয়। সত্যবাদিতার জন্য একজন ব্যক্তিকে সঠিক কথা বলার উপর ধৈর্য ধরতে হয় যদিও সে জানে যে, এতে তার কিছু বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। বিনয়-নম্রতার জন্য আত্মা ও প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা এবং আত্ম-অহংকার থেকে ধৈর্যের প্রয়োজন। অশ্লীল কথাবার্তা এবং বিকৃত আচরণ পরিহারে লজ্জাশীলতার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। আর সকল চারিত্রিক গুণাবলীকেই এর উপর অনুমান করতে হবে। এ জন্য হৃদয়ে ধৈর্যের স্থিতিশীলতা এবং তার অভ্যস্ততা চারিত্রিক অর্জন এবং শ্রেষ্ঠ লাভ; কেননা সকল উত্তম শিষ্টাচার তার উপরই নির্ভর করে।

এটি কোন অন্যায় নয় যে, কল্যাণের সকল গুণাবলী, সৎকর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী, ইবাদতের অবস্থাসমূহ এবং চারিত্রিক উত্তম গুণাবলী ধৈর্যের সাথে সম্পৃক্ত, ধৈর্যের দিকে প্রত্যাগমনকারী, ধৈর্যের উপর নির্ভরকারী এবং ধৈর্যের সাথে প্রবাহমান; আমরা যেভাবেই ভাবি না কেন ও যে অবস্থাতেই লক্ষ্য করি না কেন! কেননা ধৈর্য হল কেন্দ্র যার উপর সকল প্রশংসনীয় কর্ম ঘূর্ণায়মান। 'ধৈর্য হল এমন একটি গুণ যা আমাদেরকে কষ্টসাধ্য অন্যান্য গুণাবলীর বোঝা বহন করতে সক্ষম করে তোলে'।[৪]

সুতরাং যে তার চরিত্রকে উন্নত করতে চায় তার জন্য নিজেকে ধৈর্যের উপর গড়ে তোলা আবশ্যক; যাতে সে মন্দ আচরণ থেকে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং বাতিল রীতিনীতি ও আচারের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে। তার জন্য আরো আবশ্যক হল সে বর্জন ও গ্রহণ দু'দিক থেকে ধৈর্য ধারণ করবে; বর্জনের ধৈর্য হল চরিত্র বিনষ্টকারী বিষয় পরিহার করা, আর গ্রহণের ধৈর্য হল উত্তম গুণাবলীকে নিত্যসঙ্গী করা। ধৈর্যের ক্ষেত্রগুলো অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য পাঁচটি বিধানের আলোকে নিম্নোক্ত প্রকারভেদ উল্লেখ করছি:

১- ওয়াজীব ধৈর্য: এটি তিন প্রকার: প্রথম-হারামবস্তু পরিহারে ধৈর্য ধারণ। দ্বিতীয়- ওয়াজীব আদায়ে ধৈর্য ধারণ। তৃতীয়- বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ।

---

(১) সূরা আলে- ইমরান (২০০)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৪৫৪)।
(৩) সূরা আল-কাহফ (২৮)।
(৪) আহমাদ আব্দুর রহমান, আল-ফাযায়েল আল-খুলুকিয়্যাহ (পৃ: ১৬৪)।

২- মুস্তাহাব ধৈর্য: আর তা হল মাকরূহ বিষয় পরিহারে, মুস্তাহাব আদায়ে এবং অপরাধীর অপরাধের বিপরীতে অনুরূপ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ।

৩- নিষিদ্ধ ধৈর্য: আর তা হল হিংস্র জন্তু, সাপ, আগুন অথবা পানি যা ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে চায় তার উপর ধৈর্য ধরা বা মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকা।

৪- মাকরূহ ধৈর্য: যেমন মুস্তাহাব কর্ম পরিহার করা এবং মাকরূহ বিষয়ে জড়িত হওয়া।

৫- মুবাহ ধৈর্য হল: যে সকল বিষয় করা বা বর্জনের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে এমন কর্ম পরিহার করা।

ধৈর্য হল উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যার বিশদ বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে। যে ব্যক্তি তা অর্জন করল সে সৌভাগ্যের দরজায় প্রবেশ করল আর যে তা বর্জন করল সে দুর্ভাগ্যের দরজায় প্রবেশ করল। কেননা অপরাধ এবং মন্দ চরিত্রের কারণ হল তা থেকে বিরত না থাকা। এ জন্য যে আল্লাহর ইবাদতে ধৈর্য ধারণ করে সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে। যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চাইতে উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেয়া হয়নি।)[১]

ধৈর্যের চরিত্রে অংকৃত হওয়া দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত; যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ﴾ অর্থ: [আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।][২] সৎ আমলের সাথে ধৈর্য ধারণ করার উপর আল্লাহ তায়ালা বিশাল প্রতিদান এবং ক্ষমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ﴾ অর্থ: [কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।][৩]

আর ধৈর্যশীলগণ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ অর্থ: [আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহু ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।][৪]

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ আল্লাহ ইবাদতে ধৈর্যধারণকারীদের সালাম দিবে এবং অভিবাদন জানাবে যে দিন তারা স্থায়ী শান্তির নিবাস জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ﴾ অর্থ: [এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম

(১) সহীহ বুখারী (১/৪৫৫, হা: ১৪৫৯), সহীহ মুসলিম (২/৭২৯, হা: ১২৪/১০৫৩)।
(২) সূরা আশ-শুরা: (৪৩)।
(৩) সূরা হুদ: (১১)।
(৪) সূরা আল-আনফাল: (৪৬)।

কতই না উত্তম!][১] অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম এবং অভিবাদন অবতীর্ণ হোক তোমাদের সেই ধৈর্যের বিনিময়ে যা তোমাদেরকে এই সুউচ্চ মর্যাদায় ও মূল্যবান জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে।[২]

ধৈর্যের সুফলের অন্তর্ভুক্ত হল এ বিশাল প্রতিদান যা রাসূল সাঃ আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। আনাস বিন মালেক রাঃ বলেন, আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি: (আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি জিনিসের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে দান করব জান্নাত। তিনি দু'টি জিনিস দ্বারা ব্যক্তির চক্ষুদয়কে উদ্দেশ্য করেছেন।)[৩] রাসূল সাঃ বলেছেন: (যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবয করে নিয়ে এলে? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফল কবয করে নিয়ে এলে? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলে, আপনার প্রশংসা পাঠ করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ূন পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নামকরণ কর বায়তুল হামদ বা প্রশংসালয়।)[৪] সে যদি ধৈর্য ধারণ না করে অস্থির হত তাহলে সওয়াব তার হাতছাড়া হয়ে যেত। আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে। সুতরাং ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহর সওয়াব বিশাল; কেননা তিনি তাদেরকে কল্যাণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশেষিত করেছেন। তিনি বলেন: ﴿وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ অর্থ: [আর এটি শুধু তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যশীল। আর এর অধিকারী তারাই হবে কেবল যারা মহাভাগ্যবান।][৫] তিনি আরো বলেন: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ﴾ অর্থ: [আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া তা কেউ পাবে না।][৬] ধৈর্যের বিপরীত হল ক্রোধান্বিত ও বিরক্ত হওয়া থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ না করার মাধ্যমে অস্থির হওয়া। আর এটি হল নিন্দিত স্বভাব যা ক্রোধকে উস্কে দেয়। আত্মা যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন বন্ধনমুক্ত এবং লাগামহীন হয়ে পড়ে। এর ফলে তার কথাবার্তায় তেজ, ভর্ৎসনায় ক্ষিপ্রতা ও কঠোরতা এবং কর্মে বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ পায়। "সুতরাং অধৈর্যতা হল (আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন) একটি নিন্দনীয় চরিত্র যা ভাষাকে কর্কশ করে, হৃদয়কে দুর্বল করে, স্বভাবের দুর্বলতা প্রমাণ করে এবং শরীয়া লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করে"।[৭]

ধৈর্য নেতিবাচক একটি বৈশিষ্ট্য নয়। আর ধৈর্যের অর্থ হল, যা প্রতিকার করা যায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করা; এটি একটি ভুল উপলব্ধি এবং ভ্রান্ত ধারণা। বরং ধৈর্য যেমন পাপাচার থেকে বিরত হওয়া এবং খারাপ কাজ

---

(১) সূরা আর-রাদ: (২৪)।
(২) আব্দুর রহমান আস-সাদী, তাইসীরুল কারীমীর রহমান (২/৪৬৯)।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/২৫, হা: ৫৬৫৩)।
(৪) সুনানে তিরমিযি (৩/৩৪১, হা: ১০২১), মুসনাদে আহমদ (৪/৪১৫), শাইখ আলবানী আল-জামেউস সগীরে (১/১৯৯, হা: ৭৯৫) হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।
(৫) সূরা ফুসসিলাত: (৩৫)।
(৬) সূরা আল-কাসাস: (৮০)।
(৭) মুহাম্মাদ আহমদ, আল-খুলুক আল-কামেল (৪/২৮৫)।

থেকে দূরে থাকার একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা বুঝায় অনুরূপভাবে প্রায়শই তা একটি ইতিবাচক আমলগত প্রচেষ্টাও বুঝায়। সুতরাং ধৈর্য হল কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে আত্মার জন্য যা ক্ষতিকর; তা থেকে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

-সত্যবাদিতা।

আভিধানিক অর্থে সত্যবাদিত হল: মিথ্যার বিপরীত।(১)

পারিভাষিক অর্থে সত্যবাদিতা হল: কোন বিষয় সম্পর্কে বাস্তবতার নিরিখে সংবাদ প্রদান করা।(২)

কারো মতে সত্যবাদিতা হল: প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ দিক সমান হওয়া।(৩)

এখান থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে সত্যবাদিতা চরিত্র হল: প্রত্যেক কথা, কাজ ও বিশ্বাস যা বাস্তবতার অনুকূল হয় ও অনুযায়ী হয়।

আর সত্যবাদিতা হল উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম যার গুণে নবীগণ গুণান্বিত এবং আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে তাদের প্রশংসা করেছেন, তিনি বলেন: ﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا﴾ অর্থ: [আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইবরাহীমকে; তিনি তো ছিলেন এক সত্যনিষ্ঠ নবী।](৪)

তিনি বলেন: ﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِدۡرِيسَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا﴾ অর্থ: [আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইদরীসকে, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী](৫)

তিনি আরো বলেন: ﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيًّا﴾ অর্থ: [আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী](৬)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেকে সত্যবাদিতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।](৭)

---

(১) ফিরোজ আবাদী, আল-কামুস আল-মুহীত (৩/২৫২)।
(২) আব্দুল লতীফ মুহাম্মাদ, আল-আখলাক ফিল ইসলাম (পৃ: ১৭০)।
(৩) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/২৮৫)।
(৪) সূরা মারইয়াম: (৪১)।
(৫) সূরা মারইয়াম: (৫৬)।
(৬) সূরা মারইয়াম: (৫৪)।
(৭) সূরা আত-তাওবা: (১১৯)।

“অর্থাৎ তোমরা সত্য বল এবং সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধর; ফলে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে এবং তিনি তোমাদের কঠিন বিষয়ে নিষ্কৃতির পথ বের করে দিবেন”।[১] বস্তুত সত্যবাদিতা হল কল্যাণ ও নাজাতের বাহন এবং সৌভাগ্যের মাধ্যম। পক্ষান্তরে মিথ্যা হল ধ্বংশ ও বিনাশের বাহন। “মানুষের হতবুদ্ধিতা এবং দুর্দশার কারণ হল তাদের এই সুস্পষ্ট মূলনীতি থেকে অন্যমনস্কতা এবং তাদের নিজেদের ও চিন্তাধারার উপর মিথ্যা ও বিভ্রমের আধিপত্যের বিস্তার; যা তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং যে সত্য মেনে চলা আবশ্যক তা থেকে বিপথে পরিচালিত করেছে”। অর্থাৎ বিশ্বাস, কথা এবং আচরণে মিথ্যার মাঝে তাদের বসবাস করার কারণে তাদের নিশানা, চিন্তাধারা এবং নষ্ট শিক্ষানীতির মাধ্যমে তারা বিশ্বে মিথ্যা রটনাকারীতে পরিণত হয়েছে। এ জন্য সর্বোত্তম প্রবেশ ও নিষ্কৃতি হল সত্যবাদিতা। আর আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে এটি প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا﴾ অর্থ: [আর বলুন, হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করান সত্যতার সাথে এবং আমাকে বের করান সত্যতার সাথে এবং আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।][২]

আর সত্যবাদিতা যেমন কথার মাধ্যমে হয় অনুরূপভাবে কাজ, বিশ্বাস এবং বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমেও হয়। সুতরাং কথার মাঝে সত্যবাদিতা হল কথার উপর জিহ্বার স্থিরতা যেমন কাণ্ডের মাথার উপর মুকুল স্থির থাকে। আর অবস্থার মাঝে সত্যবাদিতা হল ইখলাসের উপর অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম স্থির থাকা এবং শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করা। এর মাধ্যমে বান্দা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা সত্যসহ আগমন করেছে।[৩]

সত্যবাদিতার উদ্দীপক হল বুদ্ধি-বিবেক, দ্বীন, ব্যক্তিত্ব এবং প্রশংসা প্রীতি।

-বুদ্ধি-বিবেক: এটি মিথ্যা অপছন্দ করাকে অবধারিত করে; বিশেষত মিথ্যা উপকার করে না এবং ক্ষতি প্রতিহত করে না। পক্ষান্তরে বুদ্ধি-বিবেক ভাল কিছু করার দিকে আহ্বান জানায় এবং মন্দ বিরত রাখে।

-দ্বীন: শরীয়ত মিথ্যাকে নিষিদ্ধ করেছে যদিও তা কল্যাণ বয়ে আনে অথবা অকল্যাণ প্রতিহত করে। আর বুদ্ধি-বিবেক নিষিদ্ধ করেছে যা কল্যাণ আনায়ন করে না বা অকল্যাণ প্রতিহত করে না। সুতরাং বিবেক যা প্রয়োজন বোধ করে শরীয়ত তার চেয়ে মিথ্যা নিষিদ্ধের ন্যায় অতিরিক্ত বিধান সহ আগমন করেছে।

-ব্যক্তিত্ব: এটি মিথ্যাকে প্রতিহত করে এবং সত্যবাদিতার উপর উদ্বুদ্ধ করে।

-প্রশংসা প্রীতি: প্রশংসা প্রীতি এবং সত্যবাদিতার খ্যাতি মিথ্যাকে প্রতিহত করে যাতে তার কথাকে প্রত্যাখ্যান না করা হয় এবং সে তিরস্কৃত না হয়।[৪]

তবে বিবেক, ব্যক্তিত্ব এবং প্রশংসা প্রীতির সত্যবাদিতা যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যবাদিতার জন্য দ্বীনের আবশ্যকীয়তা দ্বারা সমর্থিত না হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি সত্য থেকে আত্মগোপন করে যদি সে ধারণা করে মিথ্যার মাঝে

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (২/৪১৪)।
(২) সূরা আল-ইসরা: (৮০)।
(৩) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/২৮১)।
(৪) আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন (পৃ: ২৬২-২৬৩)।

কল্যাণ রয়েছে। সত্যবাদিতার সর্বোত্তম উদ্দীপক হল দ্বীন; কেননা তা আচরণে এবং মূলনীতিতে অবিচলতা বপন করে। সত্যবাদিতা হল পরিপক্কতা ও শক্তিশালী ঈমানের নিদর্শন। কোন কোন বিদ্বান বলেন: "কোন ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান বলা যাবে না যতক্ষণ না সে তিনটি বিষয় পূর্ণ করে: সন্তোষ ও ক্রোধের অবস্থায় নিজের পক্ষ থেকে হক আদায় করা, মানুষের জন্য তাই পছন্দ করা যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং সচেতনতার সময় তার পদস্খলন দৃষ্টিগোচর হবে না। আবুল আতাহিয়্যাহ বলেন: "যার থেকে সত্য হারিয়ে যায় তার মতামত হারিয়ে যায়"।[১]এই গুণগুলো অর্জন করতে পারে শুধুমাত্র মযবুত ঈমান ও সৎ নিয়তের অধিকারী ব্যক্তি; কেননা যে নিজের পক্ষ থেকে অধিকার প্রদান করে তাকে ক্রোধ পরাজিত করতে পারে না যাতে সে যুলুম করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মিথ্যা বলে। আর যে ব্যক্তি মানুষের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে, সে ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমানে অধিকারী; কেননা রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।)[২] আর সচেতনতার সময় যার কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হয় না সে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজেদের উপর আল্লাহকে পর্যবেক্ষক মনোনীত করেছে; ফলে আল্লাহ তাকে কোন মন্দ কাজে লিপ্ত দেখবে -এ ব্যাপারে সে লজ্জাবোধ করে। এ সবগুলোর উৎপত্তিস্থলই হল আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতা।

যে বিষয়টি সত্যবাদিতার নীতির প্রতি মানব সমাজের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রমাণ করে তা হল, সামাজিক সম্পর্ক ও মানুষের লেনদেনের এক বিরাট অংশ সত্য কথা ও কাজের উপর নির্ভর করে; কেননা মানুষের অভিপ্রায়গুলো শুধুমাত্র সত্য আচরণ ও স্বচ্ছ নিয়তের মাধ্যমেই জানা যায়। যদি সত্য কথার উপর বিশ্বাস না থাকত তাহলে মানুষের অধিকাংশ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেত। এটি তরবিয়তের দায়িত্বকে গুরুত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য করে তুলেছে; কেননা এটি এ কর্তব্যের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তার তরবিয়তি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজে উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। আর এর জন্য সর্বোত্তম উপায় হল, সে তরবিয়তের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া যে তরবিয়ত শিক্ষার্থীদের মাঝে দৃঢ় সংকল্প রোপন করে দেয়। কেননা সর্বদা সত্যবাদিতা মেনে চলতে কঠিন ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প, শক্তিশালী ঈমান এবং সত্যবাদিতার কারণে আপতিত বিপদ সহনের ক্ষমতার প্রয়োজন হয়।

আর যা এই অভিপ্রায়কে শক্তিশালী করে এবং তাকে সত্যবাদিতার উপর গড়ে তোলে তা হল, সেই প্রতিদান যা সত্যবাদীদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং সেই শাস্তি যা মিথ্যাবাদীদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। যেমনটি এসেছে রাসূল সাঃ এর হাদিসে: (সত্য আকড়িয়ে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য; কেননা সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে, আর নেকী জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করলে ও সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে এবং মিথ্যার উপর সংকল্পবদ্ধ হলে তার নাম আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।)[৩] ইমাম সানআনী রহিঃ তরবিয়তের ক্ষেত্রে এ হাদিস থেকে যে ফায়দা অর্জিত হয় তার প্রতি ইশারা করেছেন এই বলে: "প্রশিক্ষণ ও অর্জনের মাধ্যমে নন্দিত ও নিন্দিত বৈশিষ্ট্যগুলো চলমান থাকে"।[৪] কাজেই পরিবার ও সমাজের তরবিয়তি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল, সত্যের প্রতি উৎসাহ ও তার প্রতিদান দেয়া এবং মিথ্যার শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে চারিত্রিক এ গুণটি সদস্যদের মধ্যে বপন করা।

(১) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরইয়্যাহ (১/৪১)।
(২) সহীহ বুখারী (১/২১, হা: ১৩), সহীহ মুসলিম (১/৬৭, হা: ৭১/৪৫)।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/১০৯,হা: ৬০৯৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০১২-২৫১৩, হা: ১০৫/২৬০৭)।
(৪) সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৬০৩)।

-বিনয়:

আরবি (التواضع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: অবনত বা নীচু হওয়া।[১]

পারিভাষিক অর্থে: নিজেকে নম্র রাখা এবং আত্মপ্রতারণা থেকে দূরে থাকা।[২] কারো মতে: সত্যের সামনে বান্দার নত হওয়া।[৩] আবার কেউ বলেছেন: বিনয় হল অহংকার না করা।[৪]

বিনয় হল একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; যেটিকে ইবনুল কায়্যিম রহিঃ তিনভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথমত- দ্বীনের প্রতি বিনয়: আর তা হল, রাসূল সাঃ যা নিয়ে আগমন করেছেন তার আনুগত্য করা, তার নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তিনটি বিষয়ে স্বীকৃতি দেয়া:

১- তিনি যে বিধানসহ আগমন করেছেন তার বিরুদ্ধে বিপরীত কিছু দাঁড় করাবে না।

২- দ্বীনের কোন দলীলকে অভিযুক্ত করবে না যে সেটির নির্দেশনা বাতিল অথবা ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ এবং তার বিপরীত বিষয়টি দ্বীনের দলীলের চেয়েও অধিক পূর্ণাঙ্গ।

৩- দলীলের বিপরীতে অন্তরে, কথায় এবং কাজে কখনো ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের মধ্য থেকে যাকে নিজের বান্দা হিসেবে পছন্দ করেছেন তাকে তুমি ভাই হিসেবে পছন্দ করবে, তোমার শত্রুর অধিকার অস্বীকার করবে না এবং ওজর পেশকারীর ওজর গ্রহণ করবে।

তৃতীয়ত: সর্বদা হকের অনুসরণ করা; সুতরাং হক প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই নিজের মতামত এবং সুবিধা থেকে সরে আসা।[৫]

আর বিনয়ের সর্বোত্তম স্থান হল আল্লাহর ইবাদতে, তাঁর ভয়ে এবং তাঁর ভালবাসায় বিনয় প্রকাশ করা। সুতরাং একজন ব্যক্তি বশ্যতা স্বীকার, অবনত হওয়া, আমলে বাস্তবায়ন করা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধবস্তু থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতি বিনয়ী হবে। অপদস্থতা এবং নীচতা ব্যতিরেখে তার মুসলিম ভাইদের সাথে বিনয়ী হবে; কেননা "বিনয়ের একটি সীমারেখা রয়েছে, যখন তা অতিক্রম করা হয় তখন তা অপদস্থতা ও নীচতা হিসেবে গণ্য হয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি বিনয় প্রদর্শনে অবহেলা করে সে অহংকার এবং গর্বের দিকে চালিত হয়"।[৬] আর বিনয় কে নীচতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা একটি ভুল ব্যাখ্যা। যেমন অত্যাচারী এবং ধনীদের সামনে নীচতা প্রকাশ করা বিনয় নয়; কেননা সক্ষমতা, স্বেচ্ছাধীনতা এবং সত্যের প্রভাবের সাথে বিনয় সম্পৃক্ত। বিনয় বলা হয় যখন তা সক্ষম ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি লোভ বা

(১) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (৮/৩৯৭)।
(২) আহমাদ, মাওসুআতু আখলাকিল কুরআন (১/৬৮)।
(৩) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩৪৬)।
(৪) সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৬০৯)।
(৫) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩৪৭-৩৫১)।
(৬) ইবনুল কায়্যিম, আল-ফাওয়ায়েদ (পৃঃ ১৫৮)।

ভয়ের বশবর্তী হয়ে অথবা কোন ব্যক্তির ভয়ে তার সামনে নীচতা প্রকাশ করে তাহলে সেটা বিনয় নয়। “আর নিন্দিত বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত হল, কোন ধনী ব্যক্তির সামনে বিনয় প্রকাশ করা তার সম্পদের জন্য”।[১]

প্রত্যাশিত বিনয় হল গরীব-মিসকীনদের সাথে বসা, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা যদিও তারা কম মর্যাদাসম্পন্ন হয়, সমমর্যাদাসম্পন্ন বা তার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষদের দেখতে যাওয়া, গরীব-মিসকীন ও ছোট-বড় মানুষের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা এবং চলাচল, প্রবেশ, প্রস্থান ও আরোহণে প্রবীনদের অগ্রাধিকার দেয়া। ইবনু মাসউদ রাঃ বলেন: “বিনয় হল মজলিসের সম্মানিত স্থানের চেয়ে নীচু স্থানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম দেয়া”। সুলায়মান বিন দাউদ আঃ বনী ইসরাঈলের মজলিসের সবচেয়ে নীচু স্থানে বসতেন এবং বলতেন: মিসকীনদের মাঝে একজন মিসকীন উপবিষ্ট।[২] বিনয়ের আরো অন্তর্ভুক্ত হল, শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে মূর্খের সাথে কোমল আচরণ করা, মুসলিমদের প্রতি নম্রতার পক্ষপট অবনমিত করা এবং তাদের সাথে কঠোরতা পরিহার করা।

বিনয় হল সর্বোত্তম নবীগণের বৈশিষ্ট্যাবলী। আর উত্তম আদর্শ নবী সাঃ এর পদাঙ্ক অনুকরণ এবং তার চারিত্রিক গুণাবলী অনুসরণের মাঝে নিহিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম গুণাবলীর উপর গড়ে তুলেছেন, তিনি বলেন: ﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ অর্থ: [এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি আপনার পক্ষপুট অবনত করে দিন।][৩]

রাসূল সাঃ ছিলেন তার সর্বোত্তম উদাহরণ; মহান আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে বলেন: ﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾ অর্থ: [আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।][৪]

রাসূল সাঃ এর সুবাসিত জীবনী এবং তার পবিত্র সুন্নাহ বিনয়ের প্রতি উৎসাহিত করে; কেননা তিনি আল্লাহ তায়ালার রাসূল হিসেবে বলেছেন: (হে মানব সকল! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি না যে তোমরা আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার চেয়ে অধিক মর্যাদা দিবে।)[৫]

(১) আস-সাফারীনী, গিযাউল আলবাব (২/২৩২)।
(২) প্রাগুক্ত (২/২৩১)।
(৩) সূরা আশ-শুআ'রা: (২১৫)।
(৪) সূরা আলে-ইমরান: (১৫৯)।
(৫) মুসনাদে আহমদ (৩/১৫৩-২৪১), শাইখ আলবানী রহিঃ সিলসিলাতুল আহাদিস সহীহাহতে (১৫৭২) হাদিসটিকে ‘ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ’ বলেছেন।

তিনি আরো বলেছেন: (তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন মারইয়াম এর পুত্র ঈসা আঃ সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।)[১]

রাসূল সাঃ এর বিনয়ের অন্যতম হল তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন; ফলে তাদের উপর রাসূল সাঃ এর স্নেহ, মায়ার ছাপ পড়ত যা তাদের যন্ত্রণা লাঘব করত। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ বলেন: (বিদায় হজের বছর আমি একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রাসূল সাঃ আমার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য আসতেন।)[২]

যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের বিনয়ের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তার একটি পরিমাপক প্রয়োজন যার মাধ্যমে সে তার আচরণকে পরিমাপ করে জানতে পারবে তার বিনয়ের পরিমাণ ও তার স্তর। আর সর্বোত্তম পরিমাপক যা দ্বারা মানুষ তার আচরণকে পরিমাপ করতে পারে তা হল, রাসূলগণের সর্দার মুহাম্মাদ সাঃ এর চরিত্র। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের জন্য অনুসরণীয় নমুনা এবং উত্তম আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ।][৩]

মানব জীবনের শুরু এবং শেষ পরিণতি, বিনয়ীদের গুণাবলী ও মানুষের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং জমীনে উদ্ধত বা ফাসাদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নয় এমন বিনয়ীদের জন্য আল্লাহ যে প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন তা সর্বদা পর্যালোচনার পথ দিয়ে বিনয় আগমন করে। "আলী রাঃ এর নিকট দু'জন ব্যক্তি একে অপরের সাথে বড়াই করছিল। তিনি বললেন: তোমরা কি ক্ষয়শীল দেহ নিয়ে বড়াই করছ? যদি তোমাদের কোন নেক আমল থাকে তাহলে তা তোমাদের মূল সম্পদ। তোমাদের যদি উত্তম চরিত্র থাকে তাহলে তা তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। তোমাদের যদি তাকওয়া থাকে তাহলে তা তোমাদের জন্য মহত্ত্বের বিষয়। নতুবা গাধা তোমাদের চেয়ে অধিক উত্তম এবং তোমরা কারো চেয়ে উত্তম নও"।[৪]

বিনয়ের পদ্ধতির অন্তর্গত হল সর্বদা এ কথা স্মরণ করা যে, ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং নিঃশেষ হয়ে যাবে; বিশ্বপালনকর্তার চেহারা ব্যতীত। যেমন তিনি বলেছেন: ﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ﴾ অর্থ: [ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর।* আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।][৫] সুতরাং শেষ পরিণতি ও গন্তব্যস্থল সম্পকে অবগতি এবং সর্বদা এ বিষয়টির স্মরণ জীবন্ত অন্তরকে বিনয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যদি ধন-সম্পদের উপর বড়াই করা হয় তাহলে এর পরিণতি হল একটি অপরটির পূর্বে ক্ষয় হয়ে যাওয়া, যদি সুস্বাস্থ্যের জন্য অহংকার করা হয় তাহলে জেনে রাখা উচিত যে শরীরের গন্তব্যস্থল হল মাটি, আর পদের অহংকার করা হলে জেনে রাখা উচিত হবে যে, তা একদিন তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চলে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিঃ বলেন: "ধনাঢ্যতা হৃদয়ে,

(১) সহীহ বুখারী (২/৪৮৯-৪৯০, হাঃ ৩৪৪৫)।
(২) সহীহ বুখারী (১/৩৯৯, হাঃ ১২৯৫)।
(৩) সূরা আল-আহযাব: (২১)।
(৪) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরইয়্যাহ (২/২১০)।
(৫) সূরা আর-রহমান: (২৬-২৭)।

মহত্ত্ব তাকওয়ায় এবং সম্মান-মর্যাদা বিনয়ে।”।[১] বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত হল, চলাচলের ক্ষেত্রে বিনয়ীদের বর্ণনা এবং তাদের মূর্খদের নির্বুদ্ধিতা উপেক্ষা করা সংক্রান্ত মহান আল্লাহর বাণীকে স্মরণ করা: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا﴾ অর্থ: [আর রাহমান-এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, সালাম।][২]

এগুলো হল আল্লাহর বান্দাদের গুণসমূহ; কেননা তারা অহঙ্কার, বড়াই, দম্ভ এবং ঔদ্ধত্য ব্যতীত জমীনে চলাফেরা করে। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তারা জমীনে রোগীদের ন্যায় চলাফেরা করে; না ছল করে, আর না অহঙ্কার করে। আর রাসূল সাঃ যখন চলতেন তখন মনে হত যেন তিনি ঢালবিশিষ্ট জায়গা হতে নিচে অবতরণ করছেন এবং যেন তার জন্য জমীন সংকুচিত করে দেয়া হচ্ছে। কোন কোন সালাফ দুর্বল ও কৃত্রিমভাবে চলাফেরাকে অপছন্দ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, উমর রাঃ একদা এক যুবককে ধীরগতিতে হাঁটতে দেখলেন। তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ? সে বলল: না, হে আমীরুল মুমিনীন! তিনি তার ছড়ি উঠিয়ে তাকে শক্তিমত্তার সাথে চলার নির্দেশ দিলেন। আর বিনম্রভাবে চলাফেরা দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাতে স্থিরতা এবং গাম্ভীর্য বজায় রাখা।[৩]

বিনয়ের পন্থার অন্তর্ভুক্ত হল, যারা যমীনে উদ্ধত হতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে মর্যাদা এবং প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন; এ বিষয়টি স্মরণ করা। আর তাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর আনুগত্য এবং তার জন্য বিনয়ী হওয়া। ফলে তারা তাঁর অহঙ্কার নিয়ে বিবাদ করে না। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ﴾ অর্থ: [এটা আখেরাতের সে আবাস যা আমরা নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।][৪] সুতরাং এই উপদেশ ও ধারাবাহিক পর্যালোচনা অন্তরে বিনয়ের স্থান উন্মুক্ত করে দেয় এবং এতে বিনয়ের প্রতি ভালবাসা রোপন করে।

-সহমর্মিতা ও দয়া:

আভিধানিক অর্থে (الرحمة) দয়া হল: কোমলতা ও সদয়তা। লোকেরা একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আরবিতে “تراحم القوم” বলা হয়। আবার রহমত ‘ক্ষমা’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৫]

আর (الرفق) কোমলতা হল: কঠোরতার বিপরীত।[৬]

---

(১) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরইয়্যাহ (২/২৩১)।
(২) সূরা আল-ফুরকান: (৬৩)।
(৩) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৩৩৬-৩৩৭)।
(৪) সূরা আল-কাসাস: (৮৩)।
(৫) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১২/২৩০)।
(৬) প্রাগুক্ত (১০/১১৮)।

পারিভাষিক অর্থে (الرحمة) দয়া হল: হৃদয়ের নম্রতা যাকে কষ্ট স্পর্শ করে যখন ইন্দ্রিয় অথবা মস্তিষ্ক অপর ব্যক্তির মাঝে কষ্টের উপস্থিতি দেখতে পায়। অথবা তাকে আনন্দ স্পর্শ করে যখন ইন্দ্রিয় অথবা মস্তিষ্ক অপর ব্যক্তির মাঝে আনন্দের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।[১]

কোমলতার সাথে দয়ার এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে একে অপর থেকে পৃথক হয় না। সুতরাং যে অন্যের প্রতি দয়া অনুভব করে সে তার সাথে ব্যবহারে কঠোর না হয়ে কোমল হবে। কেননা কোমলতা তাকে দয়ার দিকে পরিচালিত করে।[২]

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, দয়ার উৎস হল উচ্ছ্বসিত অনুভূতি এবং অভ্যন্তরীণ আবেগপূর্ণ উপলব্ধি। সুতরাং দয়া যখন হৃদয়ে সক্রিয় হয় তখন মানুষের আচরণে মিথস্ক্রিয়া ও মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণরূপে আবেগপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশিত হয়। ফলে আচরণে ও ব্যবহারে সহমর্মিতা এবং করুণা প্রকাশিত হয়। ইমাম ইস্পাহানী রহিঃ বলেন: “দয়া হল এমন কোমলতা যা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি সদ্ব্যবহারের দাবী করে। কখনো দয়া শুধুমাত্র কোমলতা বুঝাতে ব্যবহার হয় আবার কখনো কোমলতা মুক্ত সদ্ব্যবহার বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়: আল্লাহ অমুকের প্রতি দয়া করুন”।[৩] অর্থাৎ দয়া যখন আচরণে রূপ নেয় তখন সেটি কোমলতা বা সহমর্মিতা হয়ে যায়। আর যখন এটা শুধু অনুভূতি হয় এবং তার সাথে ইতিবাচক আচরণ যুক্ত না হয় তখন এটা শুধু মানসিক সমবেদনায় রূপ নেয়।

সুতরাং সহমর্মিতার উৎস হল রহমত বা দয়া। মানুষ যখন সহমর্মী হয় তখন সে দয়াশীল হয়। সুতরাং রহমত বা দয়া হল সে উৎসশক্তি যা মানুষকে পরস্পর সহযোগিতা এবং একতার দিকে ধাবিত করে। “সুতরাং রহমত বা দয়া হল এমন শক্তি যা সদস্যদেরকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে এবং তাদেরকে প্রবণতা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক পরিবারে পরিণত করে”।[৪] রহমত ব্যক্তিকে মানুষের কষ্ট অনুভব করতে, তা দূরীভূত করতে উদ্যোগী হতে এবং তাদের ভুলে আফসোস করতঃ তাদের জন্য হেদায়েত কামনা করতে শেখায়। এ জন্য সে তাদের প্রতি আগ্রহ থেকে উৎপন্ন আন্তরিক কাজের মাধ্যমে প্রচেষ্টা করে।

রহমত বা দয়া আল্লাহ তায়ালার সিফাতসমূহের মধ্য হতে একটি সিফাত; মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٍ﴾ অর্থ: [আর আমার দয়া- তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে।][৫] তিনি আরো বলেন: ﴿وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمًا﴾ অর্থ: [আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।][৬] আর এই রহমত বা দয়া দুনিয়া ও আখেরাতে মুমিনদের জন্য। দুনিয়াতে এইভাবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই হকের দিকে হেদায়েত দিয়েছেন যাকে অন্যরা ভুলে রয়েছে এবং তাদেরকে সেই পথের সন্ধান দিয়েছেন যেই পথ থেকে অন্যরা বিচ্যুত হয়েছে। আর আখেরাতে তাদের প্রতি দয়ার অর্থ হল, মহাভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে।

---

(১) আব্দুর রহমান আল-মায়দানী, আল-আখলাক আল-ইসলামীয়্যাহ (২/৫)।
(২) প্রাগুক্ত (২/৩১৫)।
(৩) রাগেব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (পৃ: ১৯১)।
(৪) মুহাম্মাদ আহমাদ, আল-খুলুক আল-কামেল (৪/২৭৩)।
(৫) সূরা আল-আ'রাফ: (১৫৬)।
(৬) সূরা আল-আহযাব: (৪৩)।

আল্লাহ তায়ালা এই মহৎ চারিত্রিক গুণে গুণান্বিতদের প্রশংসা করে বলেন: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ١٧ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ﴾ অর্থ: [তদুপরি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য ধারণের, আর পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া অনুগ্রহের।* তারাই সৌভাগ্যশালী।](১) অর্থাৎ তারা মানুষদেরকে উপদেশ দিয়েছে তাদের অভাবগ্রস্তদের খাবার প্রদান, তাদের মূর্খদের শিক্ষা দেয়া, সার্বিকভাবে তাদের প্রয়োজন পূরণ, দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণে তাদের সহযোগিতা করা এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করা হয় তা তাদের জন্য অপছন্দ করার ব্যাপারে। ওরাই হল তারা, যারা বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেছে; যদি তাদের মাঝে দয়ার গুণের সাথে সূরা বালাদে উল্লেখিত গুণগুলো পূর্ণতা পায়।(২)

মানুষের প্রতি সহমর্মিতা হল সেই চারিত্রিক আচরণ যা মানুষের দয়ার সুপ্ত ইচ্ছাকে উন্মুক্ত করে। এটি মানুষের মাঝে সমবেদনা ও সম্প্রীতির প্রকৃত সমার্থক শব্দ। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন অন্যকে দরিদ্রতা ও অভাবে কষ্ট করতে দেখে তখন তার হৃদয় ঐ ব্যক্তির প্রতি কোমল হয়; ফলে সে তার প্রতি করুণা করে এবং তার অবস্থার প্রতি সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা করে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে। আর যদি তাকে বিপথে চলে যেতে দেখে তাহলে তার অবস্থা দেখে হৃদয় বিগলিত হয়। ফলে সে তাকে নসীহা করে এবং তাকে হেদায়েত ও সংশোধনের পথ দেখায়; যাতে তাকে ধ্বংসের গহ্বর থেকে উদ্ধার করতে পারে। আর এটি তার অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দয়ার মর্ম উপলব্ধি ও অনুভব করার ক্ষেত্রে তারতম্য হওয়ার কারণে মানুষের কাছে দয়ার হালতের তারতম্য হয়। কিছু মানুষ মনে করে যে, দয়া শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদেরকে তারা ভালবাসে; যেমন সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজন এবং তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য নয় যারা করুণা এবং দয়ার যোগ্য। ফলে তাদের দুঃখ-কষ্টে সে কোন প্রকারের মানসিক অংশগ্রহণ অনুভব করে না। কখনো কারো দয়ার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে বংশ, গোত্র এবং শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, আবার কারো দয়া করুণা ও রহমতযোগ্য প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে।(৩) নিশ্চয় স্বার্থপরতার সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে সুপরিসর ও বিস্তৃত বৃত্তের দিকে মানুষের প্রস্থান এবং শুধু নিজেকে ভালবাসার কাঠামো থেকে অন্যদেরকে ভালবাসার সুপরিসর কাঠামোর দিকে মানুষের যাত্রা হল মহান চারিত্রিক উন্নতি।

রহমতের বৃত্ত বিস্তৃত হয়ে তার সকল মর্মকে তুমি মূর্ত হতে দেখবে রাসূল সাঃ এর চরিত্রে, তার উপদেশ ও নির্দেশনায় এবং তার নসীহত ও কওমের লোকদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কষ্টের উপর তার ধৈর্যধারণে। আল্লাহ তায়ালা তাকে রহমত হিসেবে বর্ণনা করে বলেন: ﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾ অর্থ: [আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা

(১) সূরা আল-বালাদ: (১৭-১৮)।
(২) তাফসীরুল কারীম, সা'দী (৫/৪১৮-৪১৯)।
(৩) আব্দুর রহমান আল-মায়দানী, আল-আখলাক আল-ইসলামীয়্যাহ (২/৫)।

করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।][১]

এ জন্য আমরা রাসূল সাঃ হাদিসসমূহকে পায় ক্রমাগতভাবে নম্রতা ও সহমর্মিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে। যেমন তিনি বলেছেন: (যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহও তাকে দয়া করেন না।)[২] তিনি আরো বলেন: (নম্রতা যে কোন বিষয়কে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে। আর যে কোন বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে।)[৩]

রাসূল সাঃ এর আচরণের মধ্য হতে যে বিষয়টি দয়ার সকল মর্মই প্রমাণ করে তা হল ছোটদের প্রতি তার স্নেহ-মায়ার প্রদর্শন। বাচ্চাদের চুমু দেয়া, তাদেরকে কোলে নেয়া তো দয়ার নিদর্শন বৈ আর কিছুই নয়। আর তারা দুর্বল ও ছোট হওয়ার কারণে শৈশবে তারা এগুলোর প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী। অনুরূপভাবে এটি তাদের মাঝে নম্রতা, সহমর্মিতা ও করুণার বীজ বপন করে দেয়। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: (রাসূল সাঃ একদা হাসান বিন আলী রাঃ কে চুম্বন করেন। সে সময় তার নিকট আকরা বিন হাবেস উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা বিন হাবেস বললেন: আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেউ কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূল সাঃ তার পানে তাকালেন, অতঃপর বললেন, যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।)[৪]

এটা প্রায়োগিক তরবিয়তি দিকনির্দেশনা যা শিশুদের প্রতি রাসূল সাঃ এর ভালবাসা, স্নেহ-মায়া এবং গুরুত্বপ্রদান সুস্পষ্ট করে। আরো প্রতীয়মান হয়েছে রাসূল সাঃ কর্তৃক শিশুদের প্রতি করুণার মাধ্যমে তাদের হৃদেয় দয়ার সঞ্চারণ করা, তাদেরকে সহমর্মিতা ও তার গুরুত্ব অবহিত করা; যাতে তারা রাসূল সাঃ এর ভালবাসাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের অনুভূতিতে তার ভালবাসার প্রতিফলন ঘটে।

তবে কঠিন হৃদয় অন্যের দুঃখে-কষ্টে আন্দোলিত হয় না এবং দুর্বলের দুর্বলতা, রোগীর যন্ত্রণা, বয়োবৃদ্ধের বার্ধক্য, ছোটদের অক্ষমতা এবং গরীর-মিসকীনের অভাব তাদেরকে জাগ্রত করে না। মানুষের চরিত্রে কঠোরতা বড় ধরণের ত্রুটির প্রমাণ। আর প্রশস্ত হৃদয় খুব কমই নিষ্ঠুরতার উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। বস্তুত এটি ঘৃণা ও কঠোরতা অপেক্ষা ক্ষমা ও স্নেহ-মমতার অধিক কাছাকাছি। কেউ কেউ মনে করেন যে, কঠোর শব্দ বা শিষ্টাচারের জন্য প্রহার করার দ্বারা তরবিয়ত গ্রহণকারীর অনুভূতিকে আঘাত না করে তরবিয়তের ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন হল লালন-পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা। শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা যদি উপযুক্ত স্থানে হয় তাহলে সেটি শিক্ষার্থীর প্রতি রহমত; কেননা ধর্তব্য হল ফলাফল। সুতরাং যারা বাচ্চাদেরকে ভীত না করার উপদেশ দেন তারা বাচ্চাদেরকে প্রাকৃতিক ভয়ের মুখোমুখী হওয়ার আবশ্যকীয়তার কথা বলেন; যেন তারা শক্ত মেরুদণ্ড, দৃঢ় সংকল্প এবং ঝুঁকি মোকাবেলা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে সদিচ্ছার অধিকারী হিসেবে বেড়ে ওঠে।[৫]

এ জন্য শরীয়তের নির্দেশানুসারে চোরের হাত কাটা তার প্রতি রহমত হিসেবে গণ্য করা হবে; যাতে সে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবৈধ উপায়ে মানুষের সম্পদ ভক্ষণের পাপ করতে না পারে। শরীয়তের নির্দেশানুসারে

(১) সূরা আলে-ইমরান: (১৫৯)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/৩৭৪, হা: ৭৩৭৬), সহীহ মুসলিম (৪/১৮০৯, হা: ৬৬/২৩১৯)।
(৩) সহীহ মুসলিম (৪/২০০৪, হা: ৭৮/২৫৯৪)।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/৯১, হা: ৫৯৯৭), সহীহ মুসলিম (৪/১৮০৮-১৮০৯, হা: ৬৫/২৩১৮)।
(৫) আহমাদ ফুয়াদ, আত-তারবিয়াহ ফীল ইসলাম (পৃ: ১২৯)।

কিসাস তার প্রতি রহমতস্বরূপ যার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হয়; যাতে সে মানুষের ঘাড় না মাড়ায় ফলে তার পাপ বৃদ্ধি পায়। আর এটি একই সময়ে সমাজের প্রতিও রহমতস্বরূপ এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতস্বরূপ যে অন্তরে অন্যের ক্ষতির আকাঙ্খা লালন করে অতঃপর অন্যের উপর শাস্তির যন্ত্রণা দেখে সে ক্ষতি করা থেকে নিবৃত থাকে। সুতরাং রহমত বা দয়া কঠোর ও শক্ত হৃদয়ের অধিকারীদের হক নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, দয়া প্রাপ্তি দয়া করার শর্তের সাথে যুক্ত; এমনকি কঠোর ব্যক্তির চরিত্র যতই উন্নত হোক না কেন তার জন্য রহমত প্রার্থনায় আমাদের নৈতিক বিবেক সায় দেয় না। আর শিরক ও কবীরা গোনাহকারী এবং সত্য ও উত্তম গুণাবলীর শত্রুরা যেহেতু সামাজিক ব্যাধি লালন করে যা নিরাময় করা অসম্ভব বিধায় তাদের ঘৃণা করা আবশ্যক; যাতে তারা সঠিক পথে এবং ইসলামী চারিত্রিক গুণাবলীর দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে হৃদয় ভালবাসা ও করুণার সাথে তাদের অভিমূখী হবে।[১]

-আমনতদারিতা:

আভিধানিক অর্থে আমানতদারিতা হল: খেয়ানতের বিপরীত। আর সমাজের বিশ্বাসভাজন হল সেই ব্যক্তি যার প্রতি মানুষেরা আস্থা রাখে এবং যাকে আমানতদার ও রক্ষক হিসেবে মেনে নেয়। আমানতের আরো অর্থ হল: আনুগত্য, ইবাদত, সম্পদ আমানত রাখা এবং আস্থা।[২]

পারিভাষিক অর্থে আমানতদারিতা হল:

‘‘ফরজ, ওয়াজীব পালন ও হারাম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহর হকসমূহের পরিচর্যা করা এবং বান্দার হকসমূহের হেফাযত করা। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তির নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে ঐ আমানতের সম্পদের প্রতি লালায়িত হবে না, কোন সম্পদ পাহারার দায়িত্ব পেলে সে তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না, ধোঁকার আশ্রয় নিবে না, ওজন ও পরিমাপে কম করবে না, দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও প্রচার করবে না এবং ইলম ছাড়া ফতোয়া দিবে না’’।[৩]

‘‘মনস্তাত্বিক দিক থেকে আমানতদারিত হল, অন্তরের মাঝে স্থায়ী একটি চরিত্র; যার দ্বারা মানুষ যে সম্পদে তার অধিকার নেই তা গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকে। যদিও মানুষের নিকট নিন্দার শিকার হওয়া ব্যতীত তার সম্মুখে আমানতে সীমালঙ্ঘন করার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সে তার উপর অথবা তার নিকট অন্যের যে হক রয়েছে তা আদায় করে; যদিও সে মানুষের নিকট নিন্দার শিকার হওয়া ব্যতীত সেই হক ভক্ষণ করতে সক্ষম হয়’’।[৪]

ইমাম কুরতুবী রহিঃ বলেন: ‘‘বিশুদ্ধ মতে আমানতদারিতা দ্বীনের সকল কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে; আর এটি জমহুরের মত’’।[৫]

---

(১) আহমাদ আব্দুর রহমান, আল-ফাযায়েল আল-খুলুকিয়্যাহ (পৃ: ১৭৭)।
(২) ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব (১৩/২২)।
(৩) মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ, আল-খুলুক আল-কামেল (৪/১৫৫)।
(৪) আব্দুর রহমান আল-ময়দানী, আল-আখলাক আল-ইসলামিয়্যাহ (১/৬৪৫)।
(৫) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (১৪/১৬২)।

লেখকের মতে আমানতদারিতা হল: মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা হেফাযত করা এবং তার নিকট অন্য মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা অনৈতিকভাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

আমানতদারিতার ব্যাপক অর্থ এবং বহুমুখী দিক রয়েছে। এটি গচ্ছিত সম্পদের হেফাযত, গোপন কথার হেফাযত এবং ব্যক্তিকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তা পালনে পূর্ণ চেষ্টা করাও আমানত।

বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে আমানত অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ তায়ালা যে সব তরবিয়ত, দিকনির্দেশনা, হকসমূহ আদায় এবং কর্তব্য পালন করতে বলেছেন, সেগুলোকে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কান, চোখ, জিহ্বা এবং বুদ্ধি-বিবেকের ন্যায় যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েছেন; এ ক্ষেত্রে আমানতদারিতা হল; এগুলোকে দ্বীনের খেয়ানত ও দায়িত্বের খেয়ানত থেকে হেফাযত করা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ অর্থ: [আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।][১]

আর তা হল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি-বিবেক এবং হৃদয়ের আমানত; যে সম্পর্কে এগুলোর অধিকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি-বিবেক এবং হৃদয়সহ সকলকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমন আমানত যার সুক্ষ্মতা ও বিশালতার কারণে বিবেক কেপে ওঠে; যখনই জিহ্বা কোন শব্দ উচ্চারণ করে বা মানুষ কোন ঘটনা বর্ণনা করে অথবা কোন ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার উপর হুকুম প্রদান করে।

আল্লাহ তায়ালা আমানত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং খেয়ানতের চরিত্র ধারণে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে।][২]

তিনি বলেন: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ অর্থ: [আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে। অতঃপর তোমাদের একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করলে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। আর যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবগত।][৩]

---

(১) সূরা আল-ইসরা: (৩৬)।
(২) সূরা আন-নিসা: (৫৮)।
(৩) সূরা আল-বাকারা: (২৮৩)।

তিনি আরো বলেন: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খেয়ানত করো না।][(১)]

সুতরাং আমানত আদায় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজীব। সকল মুসলমানের উপর অবধারিত যে, সে আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে ও মানুষের সাথে আমানতের হেফাযত করবে এবং সে খেয়ানতকারীদের সাথে খেয়ানত করবে না। বরং সে তাদের আমানত তাদের নিকট ফেরত দিবে রাসূল সাঃ এর কথার প্রেক্ষিতে: (যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে তা ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না।)[(২)]

আর আমানতের বিপরীত হল খেয়ানত যা সংকট, প্রতারণা এবং ধোঁকার কারণ; কেননা আমানতের অনুপস্থিতিতে নানা পেশায় ও কাজে কর্মের ফলাফল হ্রাস পায় এবং দায়িত্বপালনের হার দুর্বল হয়। অনুরূপভাবে আমানতের অনুপস্থিতিতে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা যায় এবং লেনদেনে বিশ্বাসহীনতার কারণে মানুষের মাঝে ব্যবসা হোঁচট খায়।

আমানতের অনুপস্থিতিতে অপরাধ, আত্মসাৎ, সম্মানহানী এবং মানুষের অধিকার নষ্ট করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আর ইসলাম খেয়ানতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ধ্বংস করার জন্য এবং মানুষের মাঝে এর প্রভাবকে চূর্ণ করার জন্য। সুতরাং ঈমানের পাল্লায় খেয়ানত হল নিফাকের আলামতসমূহের মধ্য হতে একটি আলামত। যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (মুনাফিকের আলামত তিনটি: বলতে গেলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে, আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।)[(৩)]

আর যখন খেয়ানত বিস্তার লাভ করে ও আমানত হারিয়ে যায় তখন এটি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সতর্কবার্তা এবং কিয়ামতের একটি নিদর্শন। আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: (যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে। সে বলল, কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়? তিনি বললেন, যখন কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।)[(৪)]

সুতরাং অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দেয়া খেয়ানত ও আমানত বিনষ্ট করার নামান্তর। এ জন্য রাসূল সাঃ যখন নাজরান বাসীর প্রতি একজনকে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তাদের জন্য এই উম্মতের ‘আমীন’ আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাঃ কে প্রেরণ করেন। আবু উবায়দাহ রাঃ কে চয়ন করার কারণ হল, তার মর্যাদা ও যিনি কাজের গুরুভার গ্রহণ করবেন তার ব্যক্তিত্বের গুরুত্বের দিক বিবেচনায়। হুযায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ নাজরান বাসীকে বললেন: (আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি হবেন প্রকৃতই বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি আবু উবায়দাহ রাঃ কে পাঠালেন।)[(৫)]

---

(১) সূরা আল-আনফাল: (২৭)।
(২) সুনানে আবু দাউদ (৩/৮০৩-৮০৫, হা: ৩৫৩৪), তিরমিযি (৩/৫৬৪, হা: ১২৬৪) শাইখ আলবানী রহিঃ আল-জামেউস সগীরে (১/১০৭, হা: ২৪০) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৩) সহীহ বুখারী (১/২৭, হা: ২৩), সহীহ মুসলিম (১/৭৮, হা: ১০৭-৫৯)।
(৪) সহীহ বুখারী (১/৩৭, হা: ৫৯)।
(৫) সহীহ বুখারী (৪/৩৫৪, হা: ৭২৫৪)।

অনুরূপভাবে বর্তমান সমাজে আমানতের অনুপস্থিতির কারণ হল আকীদা, ইবাদত এবং দণ্ডবিধিতে মুক্তশিক্ষা এবং বিপথগামী সামাজিক স্রোতের কুফল।

ইসলামী লালন-পালনে পরিবারের শিথিলতা আমানতদারিতার অনুপস্থিতির কারণ; যখন ইসলামী তরবিয়তের মানহায সুস্পষ্ট বোধগম্য, সহজ পদ্ধতি, স্বচ্ছ তরবিয়তি লক্ষ্য ও আকাঙ্খা বাস্তবায়নকারী এবং সর্বযুগে, সর্বাবস্থায় ও সকল শ্রেণীর জন্য আমলযোগ্য।

বর্তমান যুগের সমাজ কথা, কাজে, অধিকারে, দায়িত্ব-কর্তব্যে এবং ইন্দ্রীয়সমূহে যে আমানতের অনুপস্থিতি ও খেয়ানতের বিস্তার লাভের সমস্যার সম্মুখীন; তা মূলত ইসলামী তরবিয়তের মানহায পরিত্যাগের ফলাফল।

সপ্তম অনুচ্ছেদ:

চারিত্রিক শিক্ষা এবং চারিত্রিক হুকুম আরোপের ভিত্তিসমূহ

চারিত্রিক শিক্ষার বুনিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে দু'টি বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন: তন্মধ্যে একটি হল চারিত্রিক হুকুম আরোপের সাথে সম্পর্কিত; কেননা এটি মানুষের মাঝে চারিত্রিক ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তরবিয়তি কার্যক্রমের উপর এর প্রভাব রয়েছে।

দ্বিতীয়টি হল চারিত্রিক শিক্ষার বুনিয়াদের সাথে সম্পর্কিত। এর আলোচনা নিম্নরূপ:

প্রথমত: চারিত্রিক হুকুম আরোপ:

চারিত্রিক হুকুম আরোপ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষেরা একে অপরের উপর যে প্রশংসনীয় বা নিন্দিত বিশেষণ আরোপ করে।

একে অন্যের উপর মানুষেরা যে হুকুম আরোপ করে সেক্ষেত্রে তাদের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। তুমি কাউকে দেখবে যে ধারাবাহিকভাবে তার উপকরা করার পরেও যখন একবার করবেনা তখন সে তার সাথে সংঘটিত সর্বশেষ আচরণের সাথে তোমাকে সম্পৃক্ত করবে এবং সে ভুলে যাবে তোমার প্রকৃত ভাল আচরণ। আর কিছু মানুষকে দেখবে যে তারা মর্যাদাবান ব্যক্তিদের বলায়, বক্তৃতায় এবং কাজে সামান্য ভুল পেলে তা উল্লেখ করে। আবার কখনো তাদের স্বাভাবিক মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর বিপরীত গুণে তাদেরকে অভিযুক্ত করে।

এ জন্য মানুষের চরিত্রে, তাদের লেনদেনে, তাদের আন্তঃসম্পর্ক ও বিচ্ছিন্নতায়, তাদের পারস্পরিক নৈকট্য ও দূরত্বে এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় চারিত্রিক হুকুম আরোপের প্রভাব রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রজ্ঞাপূর্ণ শরয়ী বিধানের আলোকে এর জন্য মূলনীতি তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

চারিত্রিক আচরণ যদি এমন প্রতিটি গুণ হয় যা ব্যক্তি নিজের মাঝে বা অন্যের সাথে আচারণে ধারণ করে এবং তা তার স্বভাবে পরিণত হয়; তাহলে এর মাধ্যমে প্রতিটি ব্যতিক্রমী আচরণ বাদ দেয়া হবে যা মানুষের সহজাত চরিত্র বা ব্যক্তির জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা যে ব্যক্তিকে মানুষেরা কৃপণ হিসেবে জেনে অভ্যস্ত সে যদি কোন প্রলোভনে হঠাৎ কখনো দান করে; তাহলে সে এই একক কর্মের বিনিময়ে দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা এই গুণসহ অন্যান্য গুণ হারিয়ে যায় যখন এর উদ্দেশ্য লোপ পায়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির যদি দান করা অভ্যাস হয়ে থাকে এবং সে যদি হঠাৎ আগত জাগতিক বা অন্যান্য কারণে এ গুণটি হারিয়ে ফেলে; তাহলে তার উপর কৃপণতার হুকুম আরোপ করা হবে না; কেননা তার উপর এ হুকুম আরোপ করলে যুলুম করা হবে। সহীহ বুখারীর হাদিসে এসেছে রাসূল সাঃ তার কসওয়া উটনী সম্পর্কে বলেছেন: (কসওয়া জিদ করেনি এবং এটা তার স্বভাবজাতও নয়।)[১]

ইবনে হাজার রহিঃ বলেন: “অত্র হাদিসে কোন কিছুর উপর তার অভ্যাস অনুপাতে হুকুম আরোপের বৈধতা রয়েছে, যদিও তার অভ্যাসের বিপরীত কিছু আকস্মিকভাবে তার উপর আসতে পারে। সুতরাং কোন ব্যক্তি থেকে যদি এমন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায় যার অনুরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি তার থেকে সাধারণত পাওয়া যায়

(১) সহীহ বুখারী (২/২৭৯, হা: ২৭৩১, ২৭৩২)।

না; তাহলে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে তাকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে না”।[১] বস্তুত ভুলকে ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করা যায়, ব্যক্তিকে ভুলে দিকে নয়।

এ নীতির আলোকে ব্যক্তির আচরণে আকস্মিক আগত ভাল বা মন্দ স্বভাব দ্বারা তাকে গুণান্বিত করা যাবে না; বরং এক্ষেত্রে সে যে স্বভাব, চরিত্র ও অভ্যাসের উপর গড়ে উঠেছে এবং পরিচিত হয়েছে; তাই গ্রহণীয় দলীল। যদিও ভুল তার দিকে সম্বন্ধিত করা যাবে কিন্তু সেটিকে তার স্বভাব হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না।

আর শরয়ী দণ্ডবিধি ও বিচারিক রায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

দ্বিতীয়ত: চারিত্রিক শিক্ষার ভিত্তিসমূহ:

শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চারিত্রিক শিক্ষার কার্যক্রম নির্ভর করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর:

১- উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী বিশ্লেষণ করা ব্যক্তি ও সমাজের উপর তার প্রতিফল এবং উপকারিতা বর্ণনা করার মাধ্যমে।

২- মন্দ চারিত্রিক গুণাবলী বিশ্লেষণ করা ব্যক্তি ও সমাজের উপর তার কুফল এবং ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করার মাধ্যমে।

৩- কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত দলীল এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের উলামাদের থেকে বর্ণিত উক্তির দ্বারা উক্ত দিকনির্দেশনাকে শক্তিশালী করা।

৪- চারিত্রিক অংশে গুরুত্ব দেয় না এমন সমাজের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে যা দেখা যায় এবং শোনা যায় তার সাথে এই নির্দেশনাগুলোকে সংযুক্ত করা। আর তা হবে ঘটনা বর্ণনা, উদাহরণ পেশ এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা যে দুর্ঘটনা, বিপদাপদ এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে।

শিক্ষা কার্যক্রমে এই পদ্ধতির অনুসরণ শিক্ষার্থীর মনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে; কেননা এই পদ্ধতি বিশদ বিবরণ, বিশ্লেষণ, বক্তব্যকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী করণকে ধারণ করার সাথে সাথে সেগুলোকে প্রত্যক্ষ অথবা শ্রুত বাস্তবতার সাথে যুক্ত করে।

এর মাধ্যমে এই ইসলামী মহান মূলনীতির গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়। যে মূলনীতি মানুষের সুপ্ত বাসনা ও তার ধারণ করা গুণাবলীকে বর্ণনা করে এবং যা নিজের সাথে ও অন্যের সাথে তার আচরণ এব কর্মে প্রতিফলিত হয়। আর ইসলাম এই মূলনীতির প্রতি ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে ফলে এটি নবী প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে; যিনি আগমন করেছেন উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দিতে।

কিন্তু কিছু মানুষ এই মূলনীতিকে ভিন্ন অর্থে, সংজ্ঞায় এবং পদ্ধতিতে বুঝে থাকে; ফলে মানুষের মাঝে পরিমাপক এবং হুকুম ভিন্নতর হয়ে থাকে। এ জন্য এই পরিচ্ছদে শিষ্টাচারকে বুঝা ও তা প্রয়োগের জন্য সংজ্ঞা এবং পদ্ধতিগত মূলনীতি আলোচিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে চারিত্রিক শিক্ষার ভিত্তিসমূহকে ধারণ করাও আবশ্যকীয় কর্তব্য।

---

(১) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (৫/৩৩৫)।

সারসংক্ষেপ:

আমরা এই পরিচ্ছেদে কুরআন, সুন্নাহ, অভিধান এবং উলামাদের পরিভাষায় 'আখলাক' বা শিষ্টাচারের পরিচয় উল্লেখ করেছি; যা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্টাচারের কিছু অংশ সহজাত এবং কিছু অংশ অর্জনীয়। আর 'আখলাক' শব্দটি ভাল ও মন্দ চরিত্র দুটো বুঝাতেই ব্যবহৃত হয় এবং প্রতীয়মান হয়েছে যে, কুরআন, সুন্নাহ, অভিধান ও পরিভাষায় আখলাকের অর্থ একই।

এর পর আমরা এ ফলাফল বের করেছি যে, নন্দিত চরিত্র হল: প্রতিটি উত্তম গুণাবলী যা একজন মানুষ আল্লাহর খালেস নিয়তে ও তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী ধারণ করে।

পক্ষান্তরে নিন্দিত চরিত্র হল: প্রতিটি গুণাবলী যা আল্লাহর প্রদর্শিত পদ্ধতি ও তাঁর খালেস নিয়ত ব্যতীত মানুষ ধারণ করে থাকে।

আর চারিত্রিক আচরণ হল: প্রতিটি গুণাবলী যা মানুষ নিজের মাঝে অথবা অন্যের সাথে লেনদেনে ধারণ করে এবং এটি তার স্বভাবে পরিণত হয়; চাই তা সহজাত বা অর্জনীয়, নন্দিত বা নিন্দিত হোক।

ইসলামী চরিত্রের ভিত্তিসমূহের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামের মানদণ্ডে উত্তম চরিত্রের চারিত্রিক মূল্য তখনই অর্জিত হবে যখন তা আল্লাহর খালেস নিয়তে এবং ইসলামী মানহাযের কাঠামোর মধ্যে থেকে ধারণ করা হবে। আরো প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলামী চরিত্রের ভিত্তিসমূহ যার উপর স্থাপিত তা হল আরোপিত। অর্থাৎ ইসলামী চরিত্র ধারণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক, এটি সহজ, সরল ও মানুষের সহজাত বৈশিষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এর মাঝে মানুষের সাধ্য ও সক্ষমতার বাইরে কোন চাপ নেই।

স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী চরিত্র তার আওতায় লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, সত্যবাদিতা, কোমলতা, দয়া এবং আমানতদারিতা ন্যায় সকল উত্তম গুণাবলীকে ধারণ করে। অনুরূপভাবে তা রবের সাথে, নবীর সাথে এবং সমাজের সকলের সাথে বান্দার আদবের বিষয়টি স্পষ্ট করে।

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী চরিত্রের ধারণা জীবনের সকল ক্ষেত্র ও মানুষের সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে। আর ইসলামী চরিত্র হল উপযুক্ত মানহায যা সমাজের পার্থিব ও পরকালীন সুখ-শান্তি নিশ্চিত করে এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, মানুষের মাঝে সম্পর্কের অবনতি, সামাজিক ভাঙ্গন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হল ইসলামী তরবিয়তের মানহায থেকে সমাজগুলোর দূরে সরে যাওয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

চারিত্রিক দোষত্রুটি

প্রথম অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক দোষত্রুটির পরিচয়, তার উৎসমূল ও নীতিমালা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক দোষত্রুটির প্রকারভেদ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক বিচ্যুতির কারণসমূহ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: বিচ্যুত আচরণসমূহের দায়ভার।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মন্দ চরিত্র নিরাময় পদ্ধতি।

ইসলামী চরিত্রের মূলনীতি

ভূমিকা:

রাসূলগণের আগমনের ধারা বন্ধ থাকার পরে নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর আগমন ঘটেছিল এবং তার আগমন ছিল বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রেরণের মাধ্যমে অজ্ঞতার অন্ধকার ও আকীদার বিচ্যুতি বিদূরীত করেছেন এবং জাহেলী যুগের চারিত্রিক দোষত্রুটিকে ধ্বংস করেছেন। তথা তাদের মাঝে মদপান, সুদ, জুয়া, গণকবিদ্যা, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়, জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়, উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ, গোত্রপ্রীতি, প্রতিশোধ পরায়ণতা, লোক লজ্জার ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন, দারিদ্রতার ভয়ে সন্তানদের হত্যা, দেহ প্রদর্শনী এবং বংশ নিয়ে আত্মগৌরব বিস্তার লাভ করেছিল।

আর এই সত্য দ্বীনের মাধ্যমে দ্বীন গ্রহণকারীদের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ফলে রাসূল সাঃ এর সাহাবীগণ সততা, ইনসাফ, আমানতদারিতা, ভালবাসা, অঙ্গীকার পূরণ, বদান্যতা, বীরত্ব, ইখলাস এবং আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণের ন্যায় উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। এমনকি তাদের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা কিয়ামত অবধি তেলাওয়াত করা হবে।

মহান আল্লাহ তাদের চরিত্র বর্ণনায় বলেন: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا﴾ অর্থ: [মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট; এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ অন্তর্জলা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের।](১)

আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তর আমিত্ব ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত এবং চারিত্রিক আচরণের সর্বোচ্চ স্তর নিজেরদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি তাদের আগ্রহের বর্ণনা করে বলেন: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ অর্থ: [আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার

---

(১) সূরা আল-ফাতহ: (২৯)।

জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজের অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুতঃ যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।][১]

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসায় বলেন: ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا﴾ অর্থ: [অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন][২]

এটি সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রে এমনভাবে দীপ্ত হয়েছিল যে, তাদের মাঝে পাপীকে আল্লাহ ব্যতীত কেউ দেখতে পেত না। পাপের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে পাপকারী এসে বলত: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। অন্যজন বলত: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি; তাই আমাকে পবিত্র করুন। আরেকজন এসে বলত: হে আল্লাহর রাসূল! আমি চুরি করেছি।

এই দ্বীনি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা বিশ্ব শাসন করেছেন, উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ জাতির দেশগুলোকে জয় করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে ভীত-আতঙ্কিত কায়সার বা রাজা-বাদশাহদের দম্ভ চূর্ণ করেছেন; ফলে এই দ্বীনি কর্তব্য পালনের প্রেক্ষিতে তাদের বিজয়ী পতাকা উর্দ্ধগগণে পতপত করে উড়েছে।

যখন ইসলামী সমাজে বিচ্যুতি প্রবেশ করেছে এবং মন্দ আচরণ বিস্তার লাভ করেছে; ফলশ্রুতিতে তাতে মৃত্যুভয় এবং দুর্বলতা সংক্রমিত হয়েছে। সমাজে দেহপ্রদর্শনী, সুদ, মদপান এবং নেশাদ্রব্য গ্রহণের ন্যায় মন্দ আচরণ ও গর্হিত কর্ম বিস্তার লাভ করেছে। ফলে উম্মাহ দুর্বল হয়েছে, অন্যান্য জাতি তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে, উপনিবেশিক শক্তি তাদের ভূমিতে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে এবং তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে; তাদের রবের সঠিক দ্বীন থেকে বিচ্যুতির কারণে।

ব্যক্তির উপর চারিত্রিক বিচ্যুতির নানা ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে এবং এর প্রভাব সংক্রমিত হয় উম্মতের দ্বীনী ভিত্তি ও তার অর্থনৈতিক কাঠামো, সামরিক শক্তি, সামাজিক বন্ধন এবং স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তিতে। আল্লাহর তাওফীকে এ বিষয়ে অত্র গ্রন্থ বিশদ আলোচনা উপস্থানপন করবে এবং আমি এতে চারিত্রিক বিচ্যুতি, চিকিৎসামূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনা সহ সমাজ, পরিবার, রাস্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাঁধে তরবিয়ত সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে আলোকপাত করব -ইন শা আল্লাহ।

(১) সূরা আল-হাশর: (৯)।
(২) সূরা আল-ফাতহ: (১৮)।

প্রথম অনুচ্ছেদ:

চারিত্রিক দোষত্রুটির পরিচয়, তার উৎসমূল ও নীতিমালা

প্রথমত: চারিত্রিক দোষত্রুটির পরিচয়:

আরবি **(السوء)** শব্দের অর্থ হল: পাপ, অন্যায়, খারাপ। আর সায়্যিআহ অর্থ: পাপ বা অপরাধ। সাওআহ অর্থ হল: নিন্দিত অভ্যাস। আর প্রত্যেক মন্দ কথা ও কাজকে আরবিতে (سوآء) বলা হয়।[১]

আখলাক অর্থ হল: মানুষের কতিপয় গুণাবলী যার মাধমে সে অন্যদের সাথে মেলামেশা করে থাকে। তা হতে পারে নন্দিত বা নিন্দিত।[২]

আখলাক হল মানুষের ভেতরের প্রতিচ্ছবি যেমন তার বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি হল দৈহিক অবয়ব। আর আখলাকের নন্দিত ও নিন্দিত দিকে রয়েছে।[৩]

অর্থাৎ স্বভাব-চরিত্র হল মানুষ যে সকল ভাল এবং মন্দ গুণাবলী ধারণ করে তার সমষ্টি। আর সেটি মানুষের অভ্যন্তরীণ দিকের পরিচায়ক যেমন তার অবয়ব বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক।

মন্দ চরিত্র বা চারিত্রিক দোষত্রুটির পরিচয়ে বলা যেতে পারে যে, তা হল আচরণগত বা মৌখিক বা কর্মগত অথবা আকীদাগত মন্দ বৈশিষ্ট্য।

কিছু মন্দ চরিত্রের প্রকাশ হাত, কান, চোখ ইত্যাদির ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্ম হিসেবে হতে পারে। তন্মধ্যে কিছু জিহ্বা বা বর্ণনার মাধ্যমে কথা হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে আর কিছু অন্তরে লালিত বিশ্বাস হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে; যেমন: দ্বীনের বিধিবিধানের কিছু অংশের প্রতি অন্তরে ঘৃণা রাখা বা দ্বীনের কিছু বিধানের বিলোপ কামনা করা বা মন্দ চরিত্রকে হালাল মনে করা বা অন্তরে কোন সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ রাখা অথবা কোন ব্যক্তির প্রতি এরূপ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ ব্যতীত সে উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে।

দ্বিতীয়ত: চারিত্রিক দোষত্রুটির উৎসমূল:

নিন্দিত চরিত্রের উৎস নির্ণয়ে উলামাদের মতান্তর ঘটেছে। ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযী রহিঃ এর মতে এটি চারটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত: অজ্ঞতা, যুলুম, কাম-প্রবৃত্তি এবং ক্রোধ।[৪]

ইবনু হাযম রহিঃ এর মতে চারিত্রিক দোষত্রুটির উৎস চারটি; সেগুলো হল: যুলুম, অজ্ঞতা, কাপুরুষতা এবং কৃপণতা।[৫]

---

(১) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১/৯৬-৯৭)।
(২) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৪৫৬)।
(৩) ইবনে মুফলেহ, আল-আদাব আশ-শরইয়্যাহ (২/২০৫)।
(৪) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩২১)।
(৫) ইবনে হাযম, আল-আখলাক ওয়াস-সীরাহ (৫৯০)।

গভীরভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণকারী দেখবে, যে সকল উৎস থেকে মন্দ আচরণের সৃষ্টি হয় তা মূলত: অজ্ঞতা, কাম-প্রবৃত্তি এবং ক্রোধ। অজ্ঞতা হল সকল চারিত্রিক বিচ্যুতির অন্তর্নিহিত কারণ।

একজন জাহেল ব্যক্তি তার অজ্ঞতার কারণে উত্তমকে অনুত্তম ও অনুত্তমকে উত্তম এবং পূর্ণতাকে অপূর্ণ ও অপূর্ণতাকে পূর্ণতার অবয়বে দেখে থাকে।[১]

আর কাম-প্রবৃত্তিকে আমি কামনা-শক্তি নামে নামকরণ করেছি; তার থেকে কামনা-বাসনামূলক পাপাচারগুলো সংঘটিত হয়, যেমন: ব্যাভিচার, ধোঁকা, মাদক এবং বড়াই ইত্যাদি।

আর ক্রোধকে আমি বেগদায়ক-শক্তি নামে অভিহিত করেছি; তার থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক পাপাচার সংঘটিত হয়, যেমন: মারপিট, হত্যা, লানত, যুলুম ইত্যাদি।

ইমাম লাইছ রহিঃ ইমাম মুজাহিদ রহিঃ থেকে বর্ণনা করেন: কাম-প্রবৃত্তি আর ক্রোধ হল সকল পাপের উৎস।[২]

এর বিশদ বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১- জাহালত বা অজ্ঞতা:

অজ্ঞতা হল জানার বিপরীত। আর অজ্ঞতা হল না জেনে কোন কাজ করা।[৩]

কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে না জানার মাঝে অজ্ঞতা সীমাবদ্ধ নয় বরং জানা সত্ত্বেও কোন কর্মকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তার বিপরীত কর্মকে গ্রহণ করাও এক প্রকারের জাহালত। কেননা কিছু নবী-রাসূলগণের কওমকে অজ্ঞ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাদের নবীগণের দাওয়ার গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে যদিও তাদের নিকট নবী-রাসূলগণ দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং কওমের লোকেরা দাওয়াত এবং দাওয়াত সহ যাকে প্রেরণ করা হয়েছে তার সত্যবাদিতা সম্পর্কে জানত।

নূহ আঃ তার সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যার বর্ণনা আল্লাহর বাণীতে এসেছে: ﴿وَيَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوۡمًا تَجۡهَلُونَ﴾ অর্থ: [হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই কাছে আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়; তারা নিশ্চিতভাবে তাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।][4] অনুরূপভাবে লুত আঃ তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন যা আল্লাহর বাণীতে এসেছে: ﴿أَئِنَّكُمۡ

(১) ইবনুল কায়্যিম, মাদারেজুস সালেকীন (২/৩২১)।
(২) ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ঈমান (২৯)।
(৩) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১১/১২৯-১৩০)।

(4) সূরা হূদ: (২৯)।

﴿لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ﴾ অর্থ: [তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।][(১)]

তাদের হক না গ্রহণ করা ও তাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মন্দ স্বভাবের অনুসরণ তাদেরকে অজ্ঞতার ন্যায় মন্দ বিশেষণের উপযুক্ত করে তুলেছে।

আর অজ্ঞতা হল চারিত্রিক বিচ্যুতির সবচেয়ে বড় অনুঘটক; কেননা উত্তম গুণাবলী ও তার মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত বিষয়কে পরিহার করে তা ভারী মনে করার কারণে এবং সে মন্দ আচরণকে উপভোগ করে এটি হালকা মনে হওয়ায় এবং শয়তান এটাকে তার সামনে সুশোভিত করে দেয়ায় কারণে; যার পরিণতি হল দুঃখ-কষ্ট এবং আফসোস।

সুতরাং যে ব্যক্তি জাহেল সে সহজতার কারণে কোন কিছুকে সহজ মনে করে যদিও তার মাঝে তার ধ্বংস নিহিত থাকে, আর সে কোন বিষয় ভারী হওয়ার কারণে তাকে ভারী মনে করে যদিও তার মাঝে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা এবং মুক্তি নিহিত থাকে। কাজেই তুমি দেখবে, কেউ যিনাকে সহজ মনে করে তার কু-প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করার জন্য, কেউ মুমিন ব্যক্তির হত্যা করাকে তুচ্ছ ভাবে তার ক্রোধ নিবারণের জন্য এবং কেউ পশ্চিমা অভ্যাস ও সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাদের অনুরসণ-অনুকরণ করে তাদের প্রকৃত অবস্থা এবং তাদের নৈতিক অধঃপতন, পারিবারিক ও সামাজিক ভাঙ্গনের দিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করেই।

এ জন্য শরয়ী জ্ঞান ব্যতীত উত্তম কোন কিছুই নেই চারিত্রিক বিচ্যুতির মূলোৎপাটন করার জন্য। এ অর্থের দিকে ইবনু হাযম রহিঃ ইশারা করে বলেন: "উত্তম গুণাবলী ব্যবহারে জ্ঞানের নেয়ামতের ভূমিকা বিরাট। আর তা হল, উত্তম গুণাবলী সম্পর্কে জেনে তা গ্রহণ করা ও মন্দ গুণাবলী সম্পর্কে জেনে তা পরিহার করা এবং চমৎকার স্তুতি শুনে তা গ্রহণে উৎসাহী হওয়া ও মন্দ স্তুতি শুনে তা এড়িয়ে যাওয়া। এ ভূমিকামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রতিটি উত্তম গুণে জানার ভূমিকা রয়েছে এবং প্রতিটি মন্দ গুণে অজ্ঞতার ভূমিকা রয়েছে।[(২)]

২- কামনা-শক্তি:

কামনা-শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল আকর্ষণকারী শক্তি। আর তা হল; হাওয়া তথা কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা।

হাওয়া বা কুপ্রবৃত্তি হল: কামনা-বাসনার প্রতি অন্তরের ঝোঁক। আর তাকে এ নামে নামকরণের কারণ হল এটি ব্যক্তিকে দুনিয়াতে বিপদে নিক্ষেপ করে এবং আখেরাতে জাহান্নামে।

কুপ্রবৃত্তি হল সকল মন্দ আচরণের মূল। এটি কল্যাণ থেকে বাধাদানকারী এবং বিবেক-বুদ্ধির ধ্বংসকারী; কেননা এটি মন্দ স্বভাবের জন্ম দেয়, কলঙ্কজনক কর্মের প্রকাশ ঘটায় এবং ব্যক্তিত্বের আবরণকে ছিন্ন করে ও মন্দের প্রবেশদ্বারকে সচল করে।[(৩)]

---

(১) সূরা আন-নামাল: (৫৫)।

(২) ইবনে হাযম, আল-আখলাক ওয়াস-সীরাহ (পৃঃ ২৫)।
(৩) আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন (পৃঃ ১৯)।

সুতরাং কুপ্রবৃত্তি মানুষকে মন্দের আস্তাকুড়ে নিয়ে যায় এবং তাকে মৃত্যু ও ধ্বংসের গহ্বরের দিকে পরিচালিত করে; কেননা কুপ্রবৃত্তি হল যেমনটি ইবনুল জাওযী রহিঃ বলেছেন: "কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত উপভোগের দিকে আহ্বান করে তার পরিণামের কথা না ভেবেই, তাৎক্ষণিক কামনা-বাসনা পূরণে উদ্বুদ্ধ করে যদিও তা দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট এবং আখেরাতের আনন্দ উপভোগের পথে বাঁধার কারণ হয়"।[১] আর যে ব্যক্তি তার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে না সে নিজেকে এমন আনন্দ উপভোগ এবং কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে যার পরিণতি দুঃখ-কষ্ট ও অনুতাপ-অনুশোচনা।

আর আল্লাহ তায়ালা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করাকে তিরস্কার করেছেন এবং যে তার অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে তিনি তার প্রশংসা করেছেন: মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ অর্থ: [আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে।* জান্নাতই হবে তার আবাস।][২] তিনি বলেন: ﴿يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ﴾ অর্থ: [হে দাউদ! আমি আপনাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব আপনি লোকদের মধ্যে সুবিচার করুন এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, কেননা এটা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে আছে।][৩] তিনি বলেন: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا﴾ অর্থ: [আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না—যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে ও যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।][৪] তিনি আরো বলেন: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾ অর্থ: [আর আল্লাহর পথ নির্দেশ আগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।][৫]

আল্লাহ তায়ালা কুপ্রবৃত্তি থেকে সতর্ক করে এবং ন্যায়-বিচার না করায় তার প্রভাব বর্ণনা করে বলেন: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ﴾ অর্থ: [কাজেই তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না।][৬] অর্থাৎ খেয়াল-খুশি, সাম্প্রদায়িকতা এবং তোমাদের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ যেন তোমাদের বিষয়ে ন্যায়-বিচার

(১) ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া (পৃঃ ১৮)।
(২) সূরা আন-নাযি'আত: (৪০-৪১)।
(৩) সূরা সোয়াদ: (২৬)।
(৪) সূরা আল-কাহফ: (২৮)।
(৫) সূরা আল-কাসাস: (৫০)।
(৬) সূরা আন-নিসা: (১৩৫)।

পরিত্যাগে তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ না করে। বরং তোমরা ন্যায়-বিচারকে সর্বাবস্থায় ধারণ কর।(১) এটি হল আল্লাহর পক্ষ থেকে কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও নিষেধাজ্ঞা; কেননা এটি যুলুম ও অবিচারের মূল।

ন্যায়-বিচার হল: সকল উত্তম গুণের মূল। আর যুলুম হল সকল মন্দ গুণের মূল। সুতরাং যে মানুষের প্রাপ্যে প্রদানে কম করে সে মূলত তাদের প্রাপ্য প্রদানে ন্যায়-বিচার করল না, যে ওজনে কম প্রদান করে সে মূলত যুলুম করল এবং অবিচার করল, যে মানুষের কন্যদের সাথে ব্যাভিচার করল সে মূলত তাদের প্রতি যুলুম করল এবং অবিচার করল এবং যে মিথ্যা বলল সে মানুষের সাথে অন্যায় করল এবং তাদেরকে সত্য অবহিত করল না।

যে ব্যক্তি তার কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করে এবং অনুসরণ করে না; আল্লাহ তার প্রশংসা করেছেন ও তার প্রতিদান জান্নাত নির্ধারণ করেছেন: ﴿وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ﴾ অর্থ: [আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে।* জান্নাতই হবে তার আবাস।](২) অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা উত্তম চরিত্রের রুকন ও স্তম্ভ।

৩- বেগদায়ক-শক্তি:

বেগদায়ক-শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল; ক্রোধীয় শক্তি যা থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক পাপাচার সংঘটিত হয়। ক্রোধ বা রাগ হল: হৃদয়ের রক্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠা ক্ষতির আশংকা থেকে নিজের থেকে ক্ষতিকরকে প্রতিহত করা অথবা যার থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায়।(৩)

আর মানুষের মাঝে রাগের স্বভাব রয়েছে; কেননা সে যদি তা হারিয়ে ফেলে তাহলে অনুভূতি জমাট বেঁধে যাবে, দ্বীন ও মান-সম্মানের গর্ব তাকে জাগ্রত করবে না এবং তার বীরত্ব নষ্ট হয়ে যাবে ও সে পরিণত হবে কাপুরুষে। রাগ হল দু'ধারী অস্ত্র। ইবনুল কায়্যিম রহিঃ বলেন: "ক্রোধের সীমা রয়েছে; আর তা হল প্রশংসনীয় বীরত্ব প্রদর্শন এবং মন্দ আচরণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিহার করা। ক্রোধ যদি তার সীমা অতিক্রম করে তাহলে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্যায় করে। আর যদি সীমা থেকে কমে যায় তাহলে ব্যক্তি কাপুরুষ হয়ে যায় এবং মন্দ আচরণকে পরিহার করে না।(৪)

তবে এ ক্রোধীয় শক্তি চারিত্রিক দোষত্রুটির উৎসে পরিণত হয় যখন ব্যক্তি তার ক্রোধের গ্রহণীয় সীমা অতিক্রম করে যায়। তাই ক্রোধান্বিত ব্যক্তি তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘাড়ের রগ ফুলাতে থাকে, তার রাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গর্জন করতে থাকে। অবশেষে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে মুখ দিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ বের হতে থাকে, অনায্য স্থানে হাতের ব্যবহার করে, রাগের কারণে বিচারে যুলুম করে, বিবেকবর্জিত এমন কথা বলে যা স্বাভাবিক অবস্থায় ভাবা যায় না এবং এমন কাজ করে স্বাভাবিক অবস্থায় যার কারণে লজ্জিত হয়। সুতরাং ক্রোধ হল হত্যা, গালিগালাজ, লানত, তিরস্কার, প্রহার এবং প্রত্যেক মন্দ কথা বা কাজের মূল।

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৫৭৮)।
(২) সূরা আন-নাযি'আত: (৪০-৪১)।
(৩) ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম (পৃঃ ১৩৮)।
(৪) আল-ফাওয়ায়েদ (পৃঃ ১৫৬)।

ক্রোধ হল ঐ শক্তি যা মানুষকে অহংকার, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, শত্রুতা এবং নির্বুদ্ধিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর এ সবগুলোই হল মন্দ চরিত্রের অন্তর্গত। হাদিসে এসেছে: (একজন ব্যক্তি নবী সাঃ কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: তুমি রাগান্বিত হয়ো না। সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি প্রত্যেক বারেই বললেন: তুমি রাগান্বিত হয়ো না।)[১]

নবী সাঃ বলেছেন: (প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।)[২] আলী বিন আবী তালেব রাঃ বলেন: ‘‘সহনশীলতা হল ক্রোধজনিত উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করা’’।[৩]

তৃতীয়ত: চারিত্রিক দোষত্রুটির নীতিমালা:

আরবি ‘যাবেত’ শব্দের অর্থ হল যা কোন কিছুকে সীমাবদ্ধ করে, বেষ্টন করে রাখে এবং তার শর্তাধীন করে রাখে। আর চারিত্রিক দোষত্রুটির নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিচ্যুত স্বভাব-চরিত্রের শর্তারোপকারী ও সীমাবদ্ধকারী।

সুতরাং মানুষ যখন তার আচরণে সবগুলো অথবা কিছু নীতিমালা হারিয়ে ফেলে তখন তার আচরণ বিচ্যুত হয়ে পড়ে; যদিও তার বাহ্যিক আচরণ প্রশংসনীয় হয়। যেমনটি অচিরেই নিম্নে সুস্পষ্ট হবে:

প্রথমত: মানহাযগত নীতিমালা:

মানহাযগত নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল চারিত্রিক ব্যবহার কিতাব ও সুন্নাহর মানহায অনুযায়ী হওয়া। কেননা প্রশংসনীয় চারিত্রিক নীতিমালার মূল হল ইসলামে আগত বিধানের আলোকে উত্তম গুণাবলী মেনে চলা। আর চারিত্রিক দোষত্রুটির মূল হল উত্তম গুণাবলী মেনে না চলা এবং তার বিপরীত গুণাবলী ধারণ করা। অর্থাৎ, উত্তম গুণাবলীর বিপরীত গুণাবলী সম্পাদন করা বা তাতে সীমালঙ্ঘন করা বা অবহেলা করা। তার বিশদ বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল:

১- উত্তম গুণাবলীর বিপরীত গুণাবলী সম্পাদন করা; যা সংক্ষেপে হল: কষ্ট দেয়া থেকে বিরত না থেকে তা প্রদান করা, দানশীলতার পরিবর্তে কৃপণতা করা, কষ্ট সহ্য না করে প্রত্যাঘাত করা এবং চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল না রেখে গোমড়া করে রাখা। আর বিস্তারিত হল: সত্য কথার পরিবর্তে মিথ্যা বলা, আমানতদারিতার পরিবর্তে খেয়ানত করা, সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে অবাধ্যচরণ করা, ধৈর্যের বিপরীতে অধৈর্য হওয়া এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার পরিবর্তে যিনায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

২- উত্তম গুণাবলীতে সীমালঙ্ঘন করা অথবা তাতে অবহেলা করা মন্দ চরিত্র বা চারিত্রিক দোষত্রুটির অন্তর্গত; যেমন: মেহমানকে সম্মান জানাতে গিয়ে যদি অপচয় করে তা সে সীমালঙ্ঘন করল। আর এটা নিন্দনীয়। আর যদি যথাযথ সম্মান না জানায় তাহলে সে কৃপণতা করল। ইমাম মাওয়ারদী বলেন: ‘‘উত্তম আখলাকের সুনির্ধারিত সীমা রয়েছে এবং যথাযথ স্থান রয়েছে। যদি তা লঙ্ঘন করা হয় তাহলে মোসাহেবি হিসেবে গণ্য

(১) সহীহ বুখারী (৪/১১২, হা: ৬১১৬)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/১১২, হা: ৬১১৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০১৪, হা: ১০৭-২৬০৯)।
(৩) আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন (পৃঃ ২৫২)।

হবে আর যদি তার স্থান পরিবর্তন করা হয় তাহলে নিফাকী হিসেবে গণ্য হবে। মোসাহেবি হল অবমাননা আর নিফাকী হল নিকৃষ্টতা”।[১]

মানহাযগত নীতিমালার সারমর্ম হল: কমবেশি করা ব্যতীত রাসূল সাঃ এর অনুসরণ করা। কেননা রাসূল সাঃ কোন শিষ্টাচার পালনে ত্রুটি করেন নি; বরং তিনি তার রব কর্তৃক অর্পিত পদ্ধতিতে সর্বোত্তম শিষ্টাচার পালন করেছেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণাঙ্গ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। তিনি বলেন: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ অর্থ: [আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।][২]

আল্লাহ তায়ালা নবী সাঃ এর মানহাযের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ অর্থ: [রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।][৩] রাসূল সাঃ তার মানহায আবশ্যিকরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে বলেছেন: (যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।)[৪] তিনি আরো বলেছেন: (কেউ আমাদের এ শরীয়তে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।)[৫]

দ্বিতীয়ত: আখলাকগত নীতিমালা:

যেন মুহাম্মাদ সাঃ এর মানহাযের বাহ্যিকভাবে অনুকুল আমলটি কবুলিয়াত লাভ করে এবং মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকে। সে জন্য উত্তম চরিত্র ধারণের কারণ যেন হয় বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহর আনুগত্য। ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য যেন না হয় যা তাকে মন্দ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করাবে। কেননা একজন ব্যক্তি কখনো উত্তম গুণাবলীর উপর আমল করে; যেন তাকে বলা হয়: অমুক মুজাহিদ, অমুক আলেম, অমুক দানশীল! এগুলো আমলকে বিনষ্ট করে এবং এগুলোকে মন্দ চরিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: (সর্বপ্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার ওপর ফয়সালা করা হবে, সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে, অতঃপর তাকে তার (আল্লাহর) নিয়ামতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন: তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে: আপনার জন্য জিহাদ করে এমনকি শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন: মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি এ জন্য জিহাদ করেছ যেন বলা হয়: বীর, অতএব বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আরও এক ব্যক্তি যে ইলম শিখেছে, শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন তিলাওয়াত করেছে, তাকে আনা হবে। অতঃপর তাকে তার নিয়ামতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন: তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে: আমি ইলম শিখেছ, শিক্ষা দিয়েছি ও আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলবেন: মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি ইলম শিক্ষা করেছ যেন বলা হয়: আলেম, কুরআন তিলাওয়াত করেছ যেন বলা হয়: সে কারী, অতএব বলা হয়েছে।

---

(১) আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন (পৃঃ ২৪৩)।
(২) সূরা আল-কলম: (৪)।
(৩) সূরা আল-হাশর: (৭)।
(৪) সহীহ মুসলিম (৩/১৩৪৩-১৩৪৪, হাঃ ১৮-১৭১৮)।
(৫) সহীহ বুখারী (২/২৬৭, হা: ২৬৯৭), সহীহ মুসলিম (৩/১৩৪৩, হা: ১৭-১৭১৮)।

অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আরও এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা দিয়েছেন ও সকল প্রকার সম্পদ দান করেছেন, তাকে আনা হবে। তাকে তার নিয়ামতরাজি জানানো হবে, সে তা স্বীকার করবে। তিনি বলবেন: তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে: এমন খাত নেই যেখানে খরচ করা আপনি পছন্দ করেন আমি তাতে আপনার জন্য খরচ করি নাই। তিনি বলবেন: মিথ্যা বলেছ, তবে তুমি করেছ যেন বলা হয়: সে দানশীল, অতএব বলা হয়েছে, অতঃপর তার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"।)[১]

সুতরাং মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসরণের সাথে সাথে নিয়তের একনিষ্ঠতারও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা রাসূল সাঃ বলেছেন: (সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল রয়েছে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জন অথবা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যের জন্য গণ্য হবে।)[২]

(১) সহীহ মুসলিম (৩/১৫১৩-১৫১৪, হাঃ ১৫২-১৯০৫)।
(২) সহীহ বুখারী (১/১৩, হা: ১, ৫৪, ২৫২৯), সহীহ মুসলিম (৩/১৫১৫, হা: ১৫৫-১৯০৭)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

চারিত্রিক দোষত্রুটির প্রকারভেদ

চারিত্রিক দোষত্রুটি তার বৈশিষ্ট্য, উৎস, আধিক্য অনুযায়ী বহুরকম হয়ে থাকে। তার সংখ্যাধিক্যের কারণে একটি পুস্তিকায় জমা করা কষ্টসাধ্য বিষয়। এ জন্য এ স্থান এবং গ্রন্থ বিবেচনায় অনুকূল হল চারিত্রিক দোষত্রুটির কিছু উদাহরণ পেশ করা নিম্নোক্ত মূল্যবোধ ও উৎস অনুযায়ী; তা হল:

- শব্দগত বা মৌখিক দোষত্রুটি।
- কান ও চোখের দোষত্রুটি।
- কর্মগত দোষত্রুটি।
- অন্তর সম্পর্কিত দোষত্রুটি।

প্রথমত: শব্দগত বা মৌখিক দোষত্রুটি:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে সকল মন্দ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা হয়। এ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেছেন: (নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না অথচ এ কথার কারণে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিক এর দূরত্বের চাইতে অধিক।)[১] তিনি আরো বলেছেন: (মানুষকে তাদের জিভ ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?)[২]

মানুষ যে কোন কথাই বলুক না কেন, তা হয় তার পক্ষে অথবা বিপক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ অর্থ: [সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।][৩] আর জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত পাপ অনেক; যার উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল:

গীবত

গীবতের সংজ্ঞা।

গীবতের আভিধানিক অর্থ: কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপরজনের অজ্ঞাতে তার দোষত্রুটি উল্লেখ করা।[৪]

পারিভাষিক অর্থে: রাসূল সাঃ এর সুন্নাত গীবতের শরয়ী অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট করেছে; যেমনটি হাদিসে এসেছে: (তোমরা কি জান গীবত কী জিনিস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, গীবত হল, তোমার ভাই এর সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা

(১) সহীহ বুখারী (৪/১৮৭, হা: ৬৪৭৭)।
(২) সুনানে তিরমিযি (৫/১৫, হা: ২৬১৬), মুসনাদে আহমাদ (৫/২৩১), সহীহ হাদিস, সহীহুল জামেউস সগীর (২/৯১৩)।
(৩) সূরা কাফ: (১৮)।
(৪) আর-রাগেব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (পৃঃ ৩৬৭)।

হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তা হলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।)[১]

গীবত দ্বারা উদ্দেশ্য হল: কোন ব্যক্তির অপছন্দনীয় বিষয় আলোচনা করা; চাই সেটি তার শরীর, দ্বীন, দুনিয়া, জীবন, চরিত্র, সম্পদ, সন্তান, স্ত্রী, খাদেম, চলাফেরা, হাস্যোজ্জ্বলতা, মলিনতা এবং অন্যান্য বিষয় কেন্দ্রিক হোক অথবা সেটি কথার দ্বারা বা সাংকেতিক ভাষায় বা ইঙ্গিতে হোক।[২]

গীবতের কারণসমূহ:

১- কখনো গীবতের কারণ হতে পারে গীবতকারীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আর গীবত করার মাঝে গীবতকারীর নিরাময় এবং তার হৃদয়ের ফুটন্ত ঘৃণার গরল উদগীরণের ব্যবস্থা রয়েছে। সে গীবত করার মাধ্যমে যার গীবত করা হয় তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ধ্বংস করতে এবং তাকে নিম্নস্তরে নামিয়ে আনতে চায়। আর এর প্রতি ইমাম গাযালী রহিঃ ইশারা পূর্বক বলেন: “প্রথমত সে ক্রোধ নিবারণ করতে চায় যদি তার ক্রোধের কারণ উক্ত ব্যক্তি হয়ে থাকে। সুতরাং যখন সে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন তার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ পূর্বক মনের ঝাল মিটিয়ে থাকে; ফলে তার যদি প্রতিরোধমূলক দ্বীনদারী না থাকে তাহলে স্বভাবতই কথার দ্বারা তার গীবত করে থাকে”।[৩]

২- কখনো গীবতের কারণ হতে পারে সঙ্গী ও বন্ধুদের সাথে তাল মেলান তাদের সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাদের ঘৃণা থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে। এহইয়াউ উলুমুদ্দীনের লেখক গীবতের কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “সঙ্গীদের সাথে সহমত জ্ঞাপন, বন্ধুদের সাথে সৌজন্যতা রক্ষা এবং কথায় তাদের পক্ষে সায় দেয়া; কেননা তারা যখন চারিত্রিক বিষয় উল্লেখ পূর্বক রসিকতা করে তখন সে মনে করে, যদি আমি তাদেরকে বাঁধা দেই তাহলে বিষয়টি তাদের ভারী মনে হবে এবং তারা তাকে বক্র দৃষ্টিতে দেখবে। ফলে সে তাদের কথায় সায় দেয় এবং সে মনে করে এটি উত্তম মেলামেশা”।[৪]

৩- গীবতের উদ্দেশ্য হতে পারে অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় করে দেখান; যেমন বলা: অমুক জাহেল, তার বুঝ খুব হালকা এবং তার বচন খুব দুর্বল।[৫]

গীবত করার বিপদসমূহ:

১- যে ব্যক্তি গীবত করে সে হারাম কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। এমনকি শরীয়ত প্রণেতা গীবতকারীকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ

كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن

(১) সহীহ মুসলিম (৪/২০০১, হা: ৭০/২৫৭৯)।
(২) সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৫৮৩)।
(৩) গাযালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন (৩/১৪০)।
(৪) প্রাগুক্ত।
(৫) প্রাগুক্ত (৩০/১৪১)।

﴿يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।][১]

জাযযায রহিঃ বলেন: "ব্যাখ্যা হল, কারো অনুপস্থিতিতে তার মন্দ আলোচনা করা তার মৃত অবস্থায় গোশত ভক্ষণের পর্যায়ের; যে এ সম্পর্কে অনুভব করতে পারে না"। আবু ইয়ালা রহিঃ বলেন: এটি গীবত হারাম হওয়াকে নিশ্চিত করে; কেননা মুসলিম ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ এবং মন এটাকে সহজাতভাবেই অপছন্দ করে। ফলে গীবত তার নিকট অপছন্দনীয় পর্যায়ের হওয়ায় শোভনীয়"।[২]

২- গীবতের শাস্তি মর্মন্তুদ এবং এর প্রভাব মারাত্মক। আর রাসূল সাঃ তার ভাষায় গীবতের শাস্তির বিষয়টি বর্ণনা করেছেন: (যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে সময় এমন কিছু মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ খামচে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, ওরা কারা? হে জিবরীল! তিনি বললেন, ওরা সেই লোক, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ও তাদের সম্ভ্রমহানী করত।)[৩]

৩- গীবত করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: (হে জনগণ! তোমরা যারা মুখে মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ যদি কারো দোষত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন।)[৪]

প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনা

গীবতের ক্ষতির প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনা:

১- যে ব্যক্তি মানুষের গীবত করে সে আল্লাহর শাস্তি ও তার ভয়াবহতা, যন্ত্রণা এবং শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা তার না থাকার বিষয়টি স্মরণ করবে। আর গীবত আল্লাহর অসন্তুষ্টি আনায়ন করে।

২- গীবতের কদর্যতা ও যখন সে কোন ব্যক্তির গীবত করার ইচ্ছা করে তখন গীবত তার উপরই প্রবর্তিত হয়- এ বিষয়টি অনুভব ও কল্পনা করা। আর স্মরণ করা যে, গীবতকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই জীবিত মানুষের গোশত খেতে ভয় পায়, তাহলে মৃত মানুষের গোশত খাওয়া কীভাবে সম্ভব!

---

(১) সূরা আল-হুজুরাত: (১২)।
(২) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর (৭/১৮৫)।
(৩) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৯৪, হা: ৪৮৯০), শাইখ আলবানী রহিঃ সহীহ সুনানে আবু দাউদে (৪০৮২-৪৮৭৮) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৪) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৯৪-১৯৫, হা: ৪৮৮০), শাইখ আলবানী রহিঃ সহীহ সুনানে আবু দাউদে (৪০৮২-৪৮৭৮) হাদিসটিকে 'হাসান সহীহ' বলেছেন।

৩- যারা মানুষের গীবত করে মজা অনুভব করে; এমন মন্দ সাথীদের থেকে দূরে থাকা এবং তাদের পরিবর্তে যারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকে এমন সৎ সাথীদের গ্রহণ করা।

৪-একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হল তার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মুসলিম নিরপদ থাকবে -বিষয়টি স্মরণে রাখা এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা। যেমনটি রাসূল থেকে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্ তায়ালার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে।)[১]

৫- দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তার প্রতি মানুষের প্রশংসা এবং যে তাকে ঘৃণা করে বা তার সাথে প্রতিযোগিতা করে তার নিন্দা আল্লাহ লিখে না রাখলে তাকে কোন উপকারই করতে পারবে না এবং তার মর্যাদা সমুন্নত করতে পারবে না। বরং এটি তার প্রতি মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞা নিয়ে আসে; কেননা তারা ভালভাবে জানে যে এই লোকটি তাদের গীবত করবে যেমনিভাবে সে অন্যদের গীবত করেছে। কখনো বিষয়টি অন্যদের জানানোর কারণে ছড়িয়ে পড়ে ফলে মানুষেরা তার থেকে দূরে থাকে, তাকে ভীষণভাবে ভয় করে এবং তার মাঝে যে নিফাকের গুণাবলী রয়েছে -তার প্রতি ইঙ্গিত করে।

৬- গৃহে, বিদ্যালয়ে এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ইসলামী স্বভাব চরিত্রে ধারণ করতে পিতা ও তরবিয়তের শিক্ষকগণের কাজ করা, মানুষের গীবতকারীদের তিরস্কার করা ও তাদের কথা না শোনা, ধমক দেয়া এবং অপরাধের কদর্যতা ও বিশালতা উপস্থাপন করা কর্তব্য। রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আক্রমনকে প্রতিরোধ করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন রোধ করবেন।)[২]

চোগলখোরী:

আরবি (النميمة) বা চোগলখোরীর আভিধানিক অর্থ: পরনিন্দা। মহান আল্লাহ বলেন: অর্থ: [পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।][৩] নামীমাহ শব্দের মূল অর্থ হল: অস্পষ্ট কথা এবং নিঃশব্দে চলাচল।[৪]

পারিভাষিক অর্থে: নামীমাহ হল মানুষের একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা, তাদের মাঝে বিবাদ লাগান এবং তাদের অন্তরকে শত্রুতা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ান।[৫]

আলেমগণ বলেন: নামীমাহ বা চোগলখোরী হল, মানুষের একজনের কথাকে অন্যের কাছে বর্ণনা তাদের মাঝে সম্পর্ক বিনষ্টের লক্ষ্যে।[৬]

---

(১) সহীহ বুখারী (১/২০-২১, হা: ১০), সহীহ মুসলিম (১/৬৫, হা: ৬৫/৪১)।
(২) সুনানে তিরমিযি (৪/২৮৮, হা: ১৯৩১), তিনি হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন। মুসনাদে আহমাদ (৫/২৩১), শাইখ আলবানী সহীহ সুনানে তিরিমিযিতে (১৫৭৫-২০১৩) হাদিসটিকে 'সহীহ' বলেছেন।
(৩) সূরা আল-কলম: (১১)।
(৪) আর-রাগেব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (পৃঃ ৫০৬)।
(৫) আব্দুর রহমান আল-মায়দানী, আল-আখলাক আল-ইসলামিয়্যাহ (২/২৪৬-২৪৭)।
(৬) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (২/১১২)।

সুতরাং চোগলখোরি নষ্ট চরিত্র এবং হীন অন্তরের পরিচায়ক; কেননা এটি ঐক্যের পর বিচ্ছিন্নতা, ভালবাসার পর ঘৃণা এবং সন্ধির পর শত্রুতার উৎস। চোগলখোরির মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, ভালবাসার বন্ধন নষ্ট করা হয় এবং চোগলখোরের জন্য যন্ত্রণা ও মানুষের ঘৃণা আনায়ন করা হয়।

চোগলখোরির কারণসমূহ:

১- চোগলখোরির কারণ কখনো হিংসা হতে পারে। যেমন চোগলখোর ব্যক্তি দুইজন বন্ধুর বন্ধুত্বকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখে তাদের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন ও বিবাদ লাগানোর উদ্দেশ্যে চোগলখোরির মাধ্যমে তা বিনষ্ট করতে মনস্থ করে।

২- চোগলখোরির কারণ কখনো হীন স্বভাব, আত্মিক অধঃপতন এবং সম্মান বিনষ্ট ও গোপনীয় বিষয় প্রকাশের প্রতি আগ্রহ হতে পারে। এটি নিন্দিত স্বভাবের মধ্য হতে সবচেয়ে ঘৃণিত স্বভাব যা রোগাগ্রস্ত অন্তর, নীচু স্বভাব এবং সম্মান বিনষ্ট, গোপনীয় বিষয় প্রকাশ ও ক্ষতি সাধনে আগ্রহের উপর প্রমাণ করে।[১]

চুগলির বিপদসমূহ:

১- চোগলখোরির ব্যাপারে রাসূল সাঃ বলেছেন: (কোন চোগলখোরই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।)[২] ইমাম নববী রহিঃ হাদিসটির অর্থ সম্পর্কে বলেন:

প্রথমত: হাদিসটির অর্থ ঐ ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হবে যে ব্যক্তি চোগলখোরিকে হারাম জানার সাথে ভিন্ন ব্যাখ্যা করা ব্যতীত হালাল মনে করে।

দ্বিতীয়টি: হাদিসটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল চোগলখোর ব্যক্তি বিজয়ীদের মত জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩]

২- চোগলখোর ব্যক্তি কবরের শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না। ইবনু আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (নবী সাঃ একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেনঃ এদের আযাব দেয়া হচ্ছে, কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একখানি গেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে।)[৪]

৩- চোগলখোর ব্যক্তিকে সবচেয়ে ঘৃণিত চরিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: সে মানুষের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং এমন দু'মুখো স্বভাবের অধিকারী যে একদলের সাথে একভাবে কথা বলে আর অপর দলের সাথে

(১) আহমাদ মুহাম্মাদ জাদ, আল-খুলুক আল-কামেল (৪/৪৩৬)।
(২) সহীহ মুসলিম (১১/১০১, হা: ১৬৮/১০৫)।
(৩) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (২/১১৩)।
(৪) সহীহ বুখারী (১/৪২৩, হা: ১৩৭৮)।

অন্যভাবে কথা বলে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখী ব্যাক্তি যে একদলের সাথে একভাবে কথা বলে অপর দলের সাথে অন্যভাবে কথা বলে।)[১]

ইমাম কুরতুবী রহিঃ বলেন: "দু'মুখো ব্যক্তি মানুষের মাঝে সর্বাধিক নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ, তার অবস্থা মুনাফিকের ন্যায়। কেননা সে বাতিল ও মিথ্যার মাধ্যমে চাটুকারিতা করে এবং মানুষের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করে"। ইমাম নববী রহিঃ বলেন: "দু'মুখো ব্যক্তি হল সেই যে প্রত্যেক দলের কাছে তাই বলে যা তাদেরকে সন্তুষ্ট করে। ফলে সে নিজেকে তাদেরই দলভুক্ত ও তাদের প্রতিপক্ষের বিরোধিতাকারী হিসেবে প্রকাশ করে। তার এরূপ কার্যকলাপ নিফাকী, শ্রেফ মিথ্যা, প্রতারণা এবং উভয় দলের গোপন বিষয় অবগত হওয়ার কৌশলমাত্র।[২]

৪- অনুরূপভাবে জনগণের সামাজিক বন্ধন কর্তন, পরিবারের রক্তের সম্পর্কে বিভাজন, বন্ধুদের মাঝের সম্পর্ক বিনষ্ট এবং মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিস্তারে এটি একটি অস্ত্র হিসেবে সে ব্যবহৃত হয়।

৫- দু'মুখোর ব্যক্তি সম্পর্কে কঠিন শাস্তির বার্তা সম্বলিত হাদিস বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি সে তার সমাজে পরিত্যাক্ত, বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের মাঝে অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে এবং যারা তার মত নয় তারা তাকে পরিহার করে।

যার নিকট চুগলি করা হয় তার উপর ৬ টি দায়িত্ব-কর্তব্য বর্তায়[৩]:

১- সে তাকে বিশ্বাস করবে না; কেননা চোগলখোর ব্যক্তি ফাসেক।

২- সে তাকে নিষেধ করবে, নসীহত করবে এবং তার কর্মকে তিরস্কার করবে।

৩- তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা করবে।

৪- তার নিকট তার অনুপস্থিত ভাইয়ের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করবে না।

৫- তাকে যা বলা হয়েছে সেটি যেন তাকে কথা বন্ধ রাখতে এবং বিষয়টি নিয়ে অধিকতর অনুসন্ধানে প্ররোচিত না করে।

৬- চোগলখোরকে যে বিষয়ে নিষেধ করেছে সে বিষয়টি নিজের জন্য পছন্দ করবে না। সুতরাং সে তার সূত্রে চুগলি বর্ণনা করবে না এবং বলবে না যে, অমুক এরূপ বলেছে। ফলে সে-ও চোগলখোর হিসেবে গণ্য হবে এবং সে যে বিষয়ে নিষেধ করেছে তা সম্পাদনকারী হবে।

প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনাসমূহ

প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনাসমূহের অন্তর্গত হল:

---

(১) সহীহ বুখারী (২/৫০৩, হা: ৩৪৯৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০১১, হা: ১০০/২৫২৬)।
(২) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (১/৪৭৫)।
(৩) আল-গাজ্জালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন (৩/১৪৯-১৫০), ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (২/১১৩)।

১- একজন ব্যক্তির পক্ষে চোগলখোরের অবস্থা এবং তার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনার বিষয়টি স্মরণ করা। যেমন চোগলখোর ব্যক্তির কবরে শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি কল্পনা করা এবং রাসূল সাঃ এর এই কথাকে স্মরণ করা: (কোন চোগলখোরই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।)[১]

২- যার নিকট চুগলি করা হয় তাকে নিষেধ করা, উপদেশ দেয়া, সঠিক নির্দেশনা দেয়া, শাস্তির বার্তা সম্বলিত হাদিসগুলো এবং চুগলি যে মানুষের মাঝের সম্পর্ক বিনষ্ট করে -এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া।

৩- সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা। নিজেকে প্রশ্ন করা, কেউ তার ব্যাপারে চুগলি করুক -সে কি তা পছন্দ করে? অনুরূপভাবে অন্যান্য মানুষেরাও তা পছন্দ করে না। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।)[২]

৪- ব্যক্তি ও সমাজের উপর চুগলির ক্ষতি মূলোৎপাটনে মসজিদ, সংবাদ মাধ্যম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর গুরুত্ব প্রদান করা।

৫- ধৈর্য ধারণ করা এবং চুগলি ও সীমালঙ্ঘন থেকে নফসের জিদকে নিয়ন্ত্রণ করা।

(১) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(২) সহীহ বুখারী (২/২১, হা: ১৩), সহীহ মুসলিম (১/৬৭, হা: ৭১/৫)।

মিথ্যা

মিথ্যার সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থে মিথ্যা হল: সত্যের বিপরীত।[১]

আর পারিভাষিক অর্থে: ইমাম সানআনী রহিঃ বলেন: ‘‘মিথ্যা হল যা বাস্তবের বিপরীত’’।[২] কোন জিনিসের বাস্তব অবস্থার বিপরীত সংবাদ দেয়াই হল মিথ্যা।[৩]

মিথ্যা বলার কারণসমূহ:

যে কারণসমূহ মিথ্যার দিকে ধাবিত করে এবং মিথ্যুককে ধ্বংসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে; তা অসংখ্য। তার কিছু সংখ্যক ইমাম মাওয়ারদী রহিঃ উল্লেখ করেছেন এবং মুহাম্মাদ আহমাদ তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪] সুতরাং মিথ্যার কারণসমূহের অন্তর্গত হল:

১- নফসে আম্মারার ধোঁকায় প্রতারিত হয়ে এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে একজন ব্যক্তি কল্পিত সুবিধা অর্জন অথবা ক্ষতির আশঙ্কা প্রতিহত করতে মিথ্যা বলে। ফলে এটি সে যা আশা করে তার থেকে অনেক দূরে এবং সে যা ভয় পায় তার অনেক নিকটে।

২- কেউ মিথ্যা বলতে পারে প্রিয়পাত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তার কথা রসিকতাপূর্ণ হওয়ার জন্য; বিশেষত যখন সে তার সত্য কথাবার্তায় কোন রসিকতাপূর্ণ এবং মজাদার কথা খুঁজে পায় না।

৩- মানুষ কখনো মিথ্যা বলে তার শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। ফলে সে তার শত্রুর মন্দ বর্ণনা করে এবং তার দিকে এমন কথা ও কাজ সম্পৃক্ত করে, যা থেকে সে মুক্ত।

৪- মিথ্যার কারণসমূহ তার অনুগামী হওয়ায় সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে মিথ্যা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে এবং তার হৃদয় মিথ্যার অনুগামী হয়ে যায়।

৫- ব্যক্তি কখনো একটি মিথ্যা কথা বলে এবং পূর্বের বলা মিথ্যাকে গোপন করতে এটি তাকে অসংখ্য মিথ্যা বলতে বাধ্য করে।

৬- সম্ভবত মিথ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দ্বীনদারিতার ত্রুটি এবং শরীয়ত সম্পর্কে ভুল বুঝ। কেননা দ্বীনদার ব্যক্তি মিথ্যা বলার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না।

৭- শ্রেষ্ঠত্ব, সুখ্যাতি ও নিজেকে প্রকাশের ঝোঁকে একজন ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলে। ফলে সে নিজেকে উচ্চাসনে দেখানোর জন্য মিথ্যা বলে।

(১) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১/৭০৪)।
(২) আস-সানআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৬০২)।
(৩) মুহাম্মাদ আহমাদ, আল-খুলুক আল-কামেল (৪/৪৩৯)।
(৪) মাওয়ারদী, আদাবুদ দুনিয়া (পৃ: ২৬৩-২৬৪)।

মিথ্যা বলার আরো কিছু কারণ রয়েছে। মানুষের মাঝে কেউ কেউ মিথ্যা বলে মিথ্যার মাঝে বেড়ে উঠার কারণে, তার পরিবার ও সমাজের সদস্যদের মিথ্যাকে পছন্দ করতে এবং তাদের সন্তান ও মানুষের সাথে তাদের মিথ্যার ব্যবহার করতে দেখার কারণে। ফলে এই তরবিয়ত প্রার্থী মিথ্যাকে ভাল মনে করে এ ধারণা বশত যে, মিথ্যা তার থেকে ক্ষতি দূর করতে পারবে এবং তার কল্যাণ করতে পারবে। অথচ সে ধারণা করে নাই, এ জন্য তার নামে মিথ্যার গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। ‘আবার একই সময়ে তারা তাকে মন্দ আচরণে অভ্যস্ত করে তুলেছে পরামর্শ, অনুকরণ এবং খারাপ উদাহরণের মাধ্যমে’।

এই জন্য রাসূল সাঃ অভিভাবককে তার সন্তানের সাথে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আমের রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (রাসূল সাঃ একদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে কিছু দিবো। রাসূল সাঃ তাকে প্রশ্ন করলেন, তাকে কি দেয়ার ইচ্ছা করছে? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূল সাঃ তাকে বললেন, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তাহলে এ কারণে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ হতো।)[১]

মিথ্যা বলার বিপদসমূহ:

১- এটি নিফাকের আলামতের অন্তর্গত; রাসূল সাঃ বলেছেন: (সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং যখন চুক্তি করে তা লংঘন করে।)[২]

২- মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়।)[৩]

৩- মানুষের নিকট পছন্দনীয় বিষয় হল বেশি বেশি কথা বলা এবং সে যা শোনে তাই প্রচার করার প্রবণতা। আর রাসূল সাঃ এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন: (মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে বিনা বিচারে তা-ই বর্ণনা করে।)[৪]

৪- মিথ্যা হল সকল পাপের মূল ভিত্তি এবং সংবাদ বিকৃতির প্রমাণ। যেহেতু সংবাদমূলক কথাই মানুষকে আলাদা করে, তাই একজন মিথ্যাবাদী চতুষ্পদজন্তুর চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। সমাজ বিনষ্টের একটি পথ হল মিথ্যা এবং বর্তমান বিশ্বের সমস্যার সূচনা হল সত্যের অনুপস্থিতি এবং কথায়, কাজে, নিয়তে ও বেশভূষায় মিথ্যার বিস্তৃতি।

৫- মিথ্যা পরিবার, সামষ্টিক কাজ এবং বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের সদস্যদের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে। কারণ এটি কথা ও কাজে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে; ফলে তা মানসিক অস্থিরতা ও তাদের সাথে মেলামেশাকারীর প্রতি সন্দেহের দিকে ধাবিত করে। পরিণতিতে মানুষের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়।

---

(১) মুসনাদে আহমাদ (৩/৪৪৭)।
(২) সহীহ বুখারী (১/২৭, হা: ৩৩), সহীহ মুসলিম (১/৭৮, হা: ১০৭/৫৯)।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/১০৯, হা: ৬০৯৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০১২-২০১৩, হা: ১০৫/৬০৭)।
(৪) সহীহ মুসলিম (১/১০, হা: ৫/৫)।

প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনা

মিথ্যার প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনাসমূহের অন্তর্গত হল:

১- মানুষের এটি জানা ও সর্বদা অনুভব করা যে, তার থেকে ভাল বা মন্দ যাই প্রকাশ পায় তা লেখার জন্য দু'জন ফেরেশতা রয়েছে এবং সকল বিষয়ে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ١٧ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾ অর্থ: [যখন তার ডানে ও বামে বসা দু'জন ফেরেশতা পরস্পর তার আমল লিখার জন্য গ্রহণ করে।* সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।](১)

২- মাতাপিতা এবং মুরুব্বীদের কথাবার্তায় সত্যবাদিতা এবং সন্তানদের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের বিষয়গুলো মান্য করা কর্তব্য। যাতে তারা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে বেড়ে না ওঠে এবং মাতাপিতা, মুরুব্বী ও শিক্ষকদের প্রতি তাদের আস্থা হ্রাস না পায়। কখনো বা তারা তাদের ভাই-বেরাদার ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দৈনন্দিন আচারণে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে; ফলে তারা যখন এ অভ্যাসের উপর বড় হবে তখন এটি তাদের স্বভাবে পরিণত হবে।

৩- সত্য বলার সওয়াব সম্পর্কে জানা। সত্য মানুষকে সৎকর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে, আর সৎকর্ম জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। এটি এমন একটি উদ্বুদ্ধকারী যা কথা ও কাজে, নিয়তে ও বাহ্যিক অবয়বে সততার আচরণ গ্রহণে উৎসাহিত করে। আর রাসূল সাঃ বলেছেন: (কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।)(২) মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।](৩)

৪- অনুরূপভাবে সত্যবাদিতা হল নবীগণের বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আঃ এর প্রশংসা করেছেন এবং তাকে সত্যবাদী হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন: [আর স্মরণ করুন। এ কিতাবে ইবরাহীমকে; তিনি তো ছিলেন এক সত্যনিষ্ঠ, নবী।](৪)

৫- ব্যক্তি ও সমাজের উপর মিথ্যার ক্ষতিকর প্রভাব স্পষ্ট করণে পরিবার, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব ভূমিকা পালন করা।

---

(১) সূরা কাফ: (১৭-১৮)।
(২) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৩) সূরা আত-তাওবা: (১১৯)।
(৪) সূরা মারইয়াম: (৪১)।

লানত করা এবং গালি দেয়া

লানত ও গালির পরিচয়:

লানত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল: অসন্তোষের প্রেক্ষিতে বিতাড়ন করা বা দূরে সরিয়ে দেয়া। লানত যখন আল্লাহ পক্ষ থেকে হয় তখন আখেরাতের প্রেক্ষাপটে অর্থ হল, তাঁর পক্ষ হতে শাস্তি এবং দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে অর্থ হল, তাঁর রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর লানত যখন মানুষের পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ হল, অন্যের উপর বদদোয়া করা।[১]

আর আরবি (السَّبُّ) শব্দের অর্থ হল: গালি-গালাজ করা ও তিরস্কার করা।[২]

গালি ও লানত হল মন্দ চরিত্রের অন্তর্গত যার বিরুদ্ধে ইসলাম লড়াই করে এবং তা অপছন্দ করে ও তা থেকে সতর্ক করে; কেননা এগুলো ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার দিকে ধাবিত করে এবং কখনো হাতাহাতির পর্যায়ে নিয়ে যায়। এগুলো হারাম হওয়া ছাড়াও অশ্লীল ও হীন আচরণ যা সুস্থ রুচীর অধিকারীগণ অপছন্দ করেন। গালি এবং লানত এমন প্রবেশদ্বার যা কষ্ট প্রদান এবং অপবাদ দেয়ার দিকে পরিচালিত করে; কেননা লানতকারী এবং গালিদাতা যাকে লানত বা গালি দেয়া হয় তাকে কষ্ট দেয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنًا وَإِثۡمًا مُّبِينًا﴾ অর্থ: [আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় যা তারা করেনি তার জন্য; নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করলো।][৩]

লানতের কারণসমূহ:

১- কখনো লানত বা গালির কারণ হতে পারে প্রতিশোধ গ্রহণ। এটি সেই ঘৃণা থেকে উৎপন্ন হয় যা গালিদাতাকে গালিগালাজকৃত ব্যক্তির প্রতি উস্কে দেয়। তীব্র ঘৃণার কারণে সে তাকে সবচেয়ে মন্দ ও নোংরা গুণে বিশেষিত করে বা তাকে লানত করে অজ্ঞাত বশত অথবা জেনে-বুঝে। আর এর দ্বারা মূলত সে তাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করে। ইমাম গাযালী রহিঃ এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন: “গালি দেয়ার কারণ হয় কষ্ট প্রদান অথবা ফাসেক, খবীস ও হীনদের সাথে মেলামেশার কারণে গড়ে উঠা অভ্যাস। আর তাদের অভ্যাস হল গালি দেয়া”।[৪]

২- লানত করা ও গালি দেয়ার কারণ কখনো হতে পারে রাগের বিস্ফোরণ এবং তা উত্তেজনার চরম সীমায় পৌছে যাওয়া। ফলে রাগান্বিত ব্যক্তি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা বলে তার কথার পরিণতি সম্পর্কে অনুধাবন না করেই।

---

(১) আর-রাগেব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (পৃঃ ৪৫১)।
(২) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১/৪৫৫)।
(৩) সূরা আল-আহযাব: (৫৮)।
(৪) আল-গাজ্জালী, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন (৩/১১৮)।

৩- কখনো লানত করা ও গালি দেয়ার কারণ হতে পারে ফাসেক, খবীস ও হীনদের সাথে মেলামেশার কারণে গড়ে উঠা অভ্যাস। আর তাদের অভ্যাস হল গালি দেয়া। এই মন্দ আচরণগুলো সাধারণত রাস্তা, বাজারঘাট এবং সমবেত হওয়ার জায়গাসমূহে ছোট-বড়দের থেকে শোনা যায়।

লানত করা ও গালি দেয়ার বিপদসমূহ:

১- গালিদাতার গালিকে ফাসেকী হিসেবে গণ্য করা হয়। নবী সাঃ বলেছেন: (মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।)[১] ইমাম নববী রহিঃ বলেন: "অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে গালি দেয়া এই উম্মতের সর্বসম্মত মতে হারাম এবং গালিদাতা ফাসেক যেমনটি নবী সাঃ সংবাদ দিয়েছেন"।[২]

২- লানতের পাপ ভয়াবহ এবং মুসলিম ব্যক্তির মুখে তা বড়ই কদর্য। রাসূল সাঃ বলেছেন: (মুমিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার সমান।)[৩] হাদিসটি মুসলিম ব্যক্তিকে লানত করা কঠোরভাবে হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করছে; আর এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই। ইমাম গাযালী সহ প্রমূখ আলেমগণ বলেন: "কোন মুসলিমকে লানত করা জায়েয নয় এমনকি চুতষ্পদ প্রাণীকে। ফাসেক এবং তার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুনির্দিষ্টভাবে জীবিত অথবা মৃত কোন কাফেরকেও লানত করা জায়েজ নয় তবে দলীলের মাধ্যমে আমরা যাদের কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার বিষয়টি জানতে পেরেছি; যেমন আবু লাহাব, আবু জাহেল এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ।

তাদেরকে দলগতভাবে লানত করা জায়েয; যেমন এরূপ বলা: আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উপর লানত বর্ষণ করুন এবং আল্লাহ তায়ালা ইহুদী-নাসারাদের উপর লানত বর্ষণ করুন। আর রাসূল সাঃ এর বাণী: (মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।) বাহ্যিকভাবে উভয়টি মূলগতভাবে হারাম হওয়ার দিক থেকে সমান। যদিও হত্যা কঠোরভাবে হারাম। এ মতটি ইমাম আব্দুল্লাহ আল-মাজেরী গ্রহণ করেছেন। কারো মতে, হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।[৪]

৩- লানতকারীগণ কিয়ামতের দিন শাফায়াত করতে পারবে না। যদিও মুমিনগণ তাদের সেসব ভাইদের জন্য শাফায়াত করবে যাদের জন্য আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (লানতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী কিংবা সাক্ষ্যদাতা হতে পারবে না।)[৫] হাদিসের অর্থ হল: তারা কিয়ামতের দিন শাফায়াত করতে পারবে না এবং সাক্ষ্যদাতাও হতে পারবে না, যদিও মুমিনগণ তাদের সেসব ভাইদের জন্য শাফায়াত করবে যাদের জন্য আযাব অবধারিত হয়ে গেছে; এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে[৬]:

ক. বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মত হল: পূর্ববর্তী জাতির রাসূলগণ তাদের স্বজাতির নিকট রেসালাত পৌঁছানোর বিষয়ে কিয়ামত দিবসে লানতকারীরা সাক্ষ্যদাতা হতে পারবে না।

খ. তারা দুনিয়াতে সাক্ষ্যদাতা হতে পারবে না। অর্থাৎ তারা ফাসেক হওয়ার কারণে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

(১) সহীহ বুখারী (৪/৯৯, হা: ৬০৪৪)।
(২) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (২/৫৪)।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/৯৯, হা: ৬০৪৭), সহীহ মুসলিম (১/১০৪, হা: ১৭৬/১১০)।
(৪) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (২/১২৫)।
(৫) সহীহ মুসলিম (৪/২০০৬, হা: ৮৫/২৫৯৮)।
(৬) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (১৬/১৪৯)।

গ. তাদের শাহাদাত নসীব হবে না। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য তার লাভ করবেনা।

৪- যাকে গালি দেয়া হয় সে যদি গালির উপযুক্ত না হয় তাহলে গালিদাতার দিকে গালি ফিরে আসবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (একজন অপর জনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন অন্যজনকে কাফির বলে অপবাদ না দেয়। কেননা, অপরজন যদি তা না হয়, তবে সে অপবাদ তার নিজের উপরই আপতিত হবে।)[১] তিনি আরো বলেন: (যখন কোন ব্যক্তি কারো উপর লা'নত করে, তখন তা আসমানের দিকে উত্থিত হয়। কিন্তু তা সেখানে পৌছবার আগেই আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। তখনও তার সামনে পৃথিবীর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাজেই ডানে-বামে ফিরতে থাকে। পরিশেষে যখন তা কোন যথার্থ স্থান পায় না, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ফিরে যায়; যদি সে অভিশাপের উপযুক্ত হয়, তাহলে অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হয়। নচেৎ তা অভিশাপ-কারীর প্রতি ফিরে আসে।)[২]

লানতের বিষয়টি কষ্টকর ও নোংরামি হওয়ার কারণে চতুষ্পদ প্রাণীকেও লানত করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের অধ্যায়সমূহের মধ্যে 'চতুষ্পদ প্রাণী ও অন্যান্য কিছুকে লানত করা নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়' শীর্ষক একটি অধ্যায় রয়েছে এবং সেই অধ্যায়ের অধীনে ইমরান বিন হুসাইন রাঃ এর হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন: (একদা রাসূল সাঃ কোন এক সফরে ছিলেন। এক আনসারী মহিলা একটি উটনীর উপর সওয়ার ছিল। সে বিরক্ত হয়ে উটনীটিকে অভিসম্পাত করতে লাগল। রাসূল সাঃ তা শুনে সঙ্গীদেরকে বললেন, এ উটনীর উপরে যা কিছু আছে সব নামিয়ে নাও এবং ওকে ছেড়ে দাও। কেননা, ওটি এখন অভিশপ্ত। ইমরান রাঃ বলেন, 'যেন আমি এখনো উঁটনীটিকে দেখছি, উটনীটি লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, আর কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না।)[৩]

প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনা

লানতের আপদের প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেনসমূহের মধ্য হতে:

১- লানতের গোনাহ এবং তার পরিণতির দিকে একজন ব্যক্তি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য; কেননা লানত যদি কোন যথার্থ স্থান না পায় তাহলে লানতদাতার দিকে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে এ বিষয়ে রাসূল সাঃ এর পূর্বোক্ত হাদিসগুলো অনুধাবন করা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক।

২- রাসূল সাঃ কর্তৃক চতুষ্পদ জন্তুকে লানত করা নিষিদ্ধের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। তিনি মহিলার সেই উটনীটিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন যাকে সে লানত করেছিল; কেননা সেটি অভিশপ্ততে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং অধিকতর উপযোগী হল একজন মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইকে লানত করবে না বা গালি দিবে না।

৩- বিবেকবান ও মর্যাদাবান মানুষের নিকট গালি এবং লানতের বৈশিষ্ট্য ও তার ঘৃণ্যতা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা। যদি সে পর্যবেক্ষণ করে তাহলে গালি ও লানতের নিকৃষ্টতা এবং শব্দের হীনতাকে অনুভব করবে; ফলে সে তা মন্দ জ্ঞান করবে এবং তার মুখ থেকে তা উচ্চারিত হওয়া থেকে সে বিরত থাকবে।

---

(১) সহীহ বুখারী (৪/৯৯, হা: ৬০৪৫)।
(২) সুনানে আবু দাউদ (৫/২১০-২১১, হা: ৪৯০৫), মুসনাদে আহমাদ (১/৪০৮), হাদিসটি হাসান পর্যায়ের সিলসিলাহ সহীহাহ (৩/২৬৪-২৬৫, হা: ১২৬৯)।
(৩) সহীহ মুসলিম (৪/২০৪, হা: ৪৯০৫)।

৪- গালি ও লানতের কার্যকর কারণের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং তার বিপরীত বিষয় দ্বারা প্রতিকার করা। যদি গালি ও লানতের কারণ হয় অভ্যাস, তাহলে অভ্যাস পরিবর্তন করবে। আর যদি অসৎ সঙ্গ হয়, তাহলে ভাল সঙ্গ দ্বারা পরিবর্তন করবে।

৫- মানুষের সাথে তার মনোবাঞ্ছা ও একান্ত বিষয় সংশোধন করা এবং আল্লাহর সওয়াব ও তাঁর রহমতের প্রত্যাশায় তাদের প্রতি কোন ধরণের বিদ্বেষ, চক্রান্ত, হিংসা না রাখা। এটি তাকে গালিগালাজ ও লানত না করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

শিরকী ও বিদয়াতী শব্দাবলী

শিরকঃ দ্বীনের মাঝে মানুষের শিরক দুই প্রকার:

শিরকে আকবার বা বড় শিরক হল: আল্লাহর তায়ালার রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্ব), উলুহিয়্যাহ (উপাস্য) এবং তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীতে মানুষ কর্তৃক তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করা।[১]

শিরকে আসগর বা ছোট শিরক হল: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। হাদিসে এসেছে: (তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শিরক। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: রিয়া বা লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল।)[২]

বিদয়াত হল: এমন কথা বা কাজের প্রচলন করা যাতে শরয়ী পন্থা অনুসরণ করা হয় না।[৩]

এগুলোর উদাহরণ হল:

১- গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা:

আরবি (الحلف) শব্দের অর্থ হল: শপথ।

মানুষ দু'ভাবে কসম বা শপথ করে: হয় সে আল্লাহ তায়ালার নামে ও তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে শপথ করে - এতে নিষিদ্ধের কিছু নেই; অথবা গায়রুল্লাহর নামে কসম করে থাকে। এ কসম সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করে সে কুফুরী বা শিরক করল।)[৪]

হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা শিরক এবং অত্র হাদিসে গায়রুল্লাহর নামে শপথ করার ভয়াবহতার প্রমাণ রয়েছে; যেমন নবী, মর্যাদা অথবা নবীগণের নামে কোন ব্যক্তির শপথ করা। কেননা কসম করা মূলত কসমকৃত বিষয়কে তাযীম করা বুঝায়; আর তাযীম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে, অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং মুসলিম উম্মতের জন্য করণীয় হল তাদের সন্তানদের আল্লাহ যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তার উপর গড়ে তোলা; তিনি যা অপছন্দ বা ঘৃণা করেন তার উপর নয়।

২- 'আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান' এরূপ বলা:

কথার মাঝে ভুলত্রুটির অন্তর্গত হল কোন মুসলিমের এ কথা বলা: আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান। অর্থাৎ মাখলুকের চাওয়াকে আল্লাহর চাওয়ার সাথে 'ওয়াও' (الواو) হরফ দ্বারা সংযোজন করা। আর এর মাঝে শিরক নিহিত রয়েছে। কেননা নবী সাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, (একজন ইহুদী নবী সাঃ এর নিকট আগমন করে বলল: আপনারা তো আল্লাহর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ স্থির করে থাকেন। আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহ

---

(১) ইবনে উসায়মীন, আল-ক্বওলুল মুফীদ (১/১৩৯)।
(২) মুসনাদে আহমাদ (৩/৭)।
(৩) আর-রাগেব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (পৃঃ ৩৯)।
(৪) সুনানে তিরমিযি (৪/৯৩-৯৪, হা: ১৫৩৫), মুসনাদে আহমাদ (২/৬৯)।

যা ইচ্ছা করেন আর আপনি যা ইচ্ছা করেন। আর আপনারা আরো বলেন থাকেন, কাবার কসম! তখন রাসূল সাঃ নির্দেশ দিলেন যে, যখন কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে: কাবার রবের কসম! আরো বলবে, আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন।)[১]

সাহাবী আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে আমর বিন শুরাহবীল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: (আমি নবী সাঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য সমকক্ষ দাঁড় করান, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।)[২]

আমর এর হাদিসে শিরক মহা পাপ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর প্রথম হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, 'আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান' এরূপ বলা শিরক। বরং ব্যক্তি বলবে 'আল্লাহ যা চান' -এটি অধিক উত্তম 'আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান' এরূপ বলা থেকে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

৩- আল্লাহর কালাম নিয়ে বিদ্রুপ করা:

কথার মাঝে সবচেয়ে দোষণীয় হল আল্লাহর কালাম নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলা। যে সকল মুনাফিকেরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ অর্থ: [আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?* তোমরা ওজর পেশ করোনা তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। আমি তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব—কারণ তারা অপরাধী।][৩]

তাফসীরে এসেছে যে, তাবুক যুদ্ধে মুসলমান ও তাদের দ্বীনে একদল মুনাফিক আঘাত করে বলল: আমাদের এ কারীসাহেবগণ (রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামদেরকে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে উপহাস করে দেয়া নাম) উদরপূর্তির প্রতি বেশী আগ্রহী, কথাবার্তায় মিথ্যাচার, আর শত্রুর সামনে সবচেয়ে ভীরু ইত্যাদি। অতঃপর তারা নবী সাঃ এর কাছে এসে ওযর পেশ করে বলতে লাগল: (আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।) মহান আল্লাহ তাদের প্রতিউত্তরে বলেন: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ অর্থ: [বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?][৪]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করা এমন পর্যায়ের কুফর যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়; কেননা দ্বীনের মূল ভিত্তি আল্লাহ ও তাঁর মনোনীত দ্বীন এবং তাঁর রাসূলকে সম্মান করার উপর স্থাপিত। আর এর কোনটির প্রতি বিদ্রুপ করা মানেই হল এই নীতির প্রতি সম্মান করার বিরোধী।

(১) সুনানে নাসায়ী (৭/৬, হা: ৩৭৭৩), মুসনাদে আহমাদ (৬/৩৭১), শাইখ আলবানী সিলসিলাহ সহীহাহতে (১৩৬) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(২) সহীহ বুখারী (৪/৪০৯, হা: ৭৫২০)।
(৩) সূরা আত-তাওবা: ৬৫-৬৬।
(৪) সূরা আত-তাওবা: (৬৫)।

সুতরাং একজন মুসলিম ব্যক্তির আল্লাহর কালাম, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

৪- যুগ-যামানাকে গালি দেয়া:

যুগ-যামানাকে গালি দেয়া মন্দ চরিত্রের অন্তর্গত; কেননা রাসূল সাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন: (আল্লাহ তায়ালা বলেন: আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।)[১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে: (তোমরা যামানাকে গালি দিয়ো না; যেহেতু আল্লাহই যামানার বিবর্তনকারী।)[২]

আরবি 'দাহর' শব্দের অর্থ হল: যুগ, যামানা বা সময়। অর্থাৎ বিপদাপদ সংঘটনের জন্য যামানাকে দায়ী মনে করা।

'আমিই যামানা' কথাটির অর্থ হল, আমি যামানার প্রতিপালক এবং যামানা ও তার মাঝে যা সংঘটিত হয় তার নিয়ন্ত্রণকারী।

এ হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আদম সন্তানেরা কখনো আল্লাহ অপছন্দনীয় কর্ম সম্পাদন করে। তন্মধ্যে যুগ-যামানাকে গালি দেয়া এবং বিপদাপদের দায় তার দিকে সম্পৃক্ত করা। আর এ কর্মটি অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালাই হলেন যামানার মালিক, তার নিয়ন্ত্রণকারী এবং তার মাঝে যা কিছু সংঘটিত হয় সেগুলোর বিবর্তনকারী। ফলে যুগ-যামানাকে গালি দেয়া তার মালিককে গালি দেয়ার নামান্তর। দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে: নবী সাঃ যামানাকে গালি দেয়া নিষেধ করেছেন এ সংবাদ দিয়ে যে, আল্লাহ তায়ালা যামানার মালিক এবং তিনিই যামানা ও তার মাঝে সংঘটিত বিষয়ের নিয়ন্তা। এর মাধ্যমে রাসূল সাঃ হাদিসে কুদসীতে যা বর্ণিত হয়েছে সেটিকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন।

৫- ইসলাম যেহেতু শ্রেষ্ঠ আচরণের নির্দেশ দেয় এবং হীন আচরণ থেকে নিষেধ করে; সেহেতু রাসূল সাঃ বাতাসকে গালি দেয়া এবং তাকে লানত করা থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা বাতাস হল আল্লাহর সৃষ্টিজীবসমূহের মধ্য হতে একটি সৃষ্টিজীব। বাতাসের স্থির থাকা, প্রবাহিত হওয়া, উপকার কিংবা ক্ষতি করা; সবই আল্লাহর নির্দেশে। তাই বাতাসকে গালি দেয়া মানে তার পরিচালক আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেয়া।

রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমরা বাতাসকে গাল-মন্দ করবে না। তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বলবে: হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি এই বাতাসের কল্যাণ, তাতে নিহিত বিষয়ের কল্যাণ এবং সে যে বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছে তার কল্যাণ। আর আশ্রয় চাই এই বাতাসের অকল্যাণ থেকে, তাতে নিহিত বিষয়ের অমঙ্গল থেকে এবং সে যে বিষয়ে নির্দেশিত তার অমঙ্গল থেকে।)[৩]

সুতরাং হে মুসলিম! ইসলামের সেই মহান শিক্ষা নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন, যে শিক্ষা একজন মুসলিমকে আল্লাহর সৃষ্টিজীবের সাথে সুন্দর ভাষা ব্যবহার এবং মন্দ ভাষা পরিহারের শিক্ষা দেয়। কাজেই একজন মুসলিমের জন্য উপযুক্ত হল তার রব, নবী এবং আল্লাহর সকল সৃষ্টিজীবের সাথে তার ব্যবহৃত ভাষাকে নিকৃষ্ট আচরণ থেকে পরিচ্ছন্ন করা এবং উত্তম আচরণকে ধারণ করা।

---

(১) সহীহ মুসলিম (৪/১৭৬২, হা: ২২৪৬)।
(২) প্রাগুক্ত (৪/১৭৬৩, হা: ২২৪৬)।
(৩) সুনানে তিরমিযি (৪/৪৫১-৪৫২, হা: ২২৫২)।

শিরকী ও বিদয়াতী শব্দাবলীতে জড়িত হওয়ার কারণসমূহ:

১- পরিবেশ। অর্থাৎ একজন মানুষের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা শিরক-বিদয়াত প্রভাবিত পরিবেশে হওয়ার কারণে সে তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে তার মুখের ভাষায় শিরক-বিদয়াতমূলক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন কেউ বলে: নবীর কসম, আমার মর্যাদার কসম বা আমার সন্তানের জীবনের শপথ।

২- কিছু মন্দ শব্দাবলীকে মানুষের নিকট শয়তান কর্তৃক সুশোভিত করে তোলা।

৩- বিশ্বাস করা যে, কিছু অনৈসলামিক শব্দাবলী কতক চাহিদা পূরণ করে অথবা কিছু বিপদাপদকে বাঁধা প্রদান করে।

৪- আলেমের ছদ্মাবরণে থাকা এমন কিছু জাহেলদের অনুসরণ করা যারা শিরকী ও বিদয়াতী শব্দাবলী উচ্চারণ করে থাকে।

৫- অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে উঠাবসা এবং একত্রে বসবাসের ফলস্বরূপ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

শিরকী ও বিদয়াতী শব্দাবলীর বিপদসমূহ:

১- নিঃসন্দহে বড় শিরক আমল বিনষ্টকারী; মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ অর্থ: [আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।](১)

২- আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না যে তার সাথে শিরক করা অবস্থায় তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾ অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।](২)

৩- এটা আল্লাহর শাস্তিকে অবধারিত করে; রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করতঃ মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে।)(৩)

৪- এটা কল্যাণ কামনায় বা মন্দ প্রতিহতে উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সৃষ্টিজীবের উপর নির্ভরশীল করে দেয়।

---

(১) সূরা আয-যুমার: (৬৫)।
(২) সূরা আন-নিসা: (৪৮)।
(৩) সহীহ বুখারী (৩/১৯৬, হা: ৪৪৯৭)।

৫- এটা মানুষের চারিত্রিক অবনতি ঘটায়; ফলে সে মাখলুকের নিকট তেমনভাবে অবনত হয় যেমনভাবে মাখলুক তার সৃষ্টিকর্তার নিকট অবনত হয়।

৬- এটা মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের হ্রাস ঘটায় এবং ক্রমান্বয়ে তাকে দুর্বলতা ও অপদস্থতার দিকে নিয়ে যায়; কেননা তার হৃদয় কল্যাণ কামনায় এবং অনিষ্ট প্রতিহতে পাথর, গাছ, জীবজন্তুর উপর নির্ভর করে, সেগুলোকে ভয় করে, উপকার প্রত্যাশা করে এবং ভালবাসে। অথচ সেগুলোও তার মত মাখলুক বা সৃষ্টিজীব; যারা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ﴾ অর্থ: [হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও অন্বেষণকৃত কতই না দুর্বল।][১]

প্রতিকার

প্রতিকারের উপায়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১- তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং তদানুপাতে আমল করা; কেননা উভয় প্রকারের শিরকে জড়িত হওয়ার মূল কারণ হল জাহালত বা অজ্ঞতা। আর জ্ঞান অর্জিত হয় শিক্ষা গ্রহণ, প্রশ্ন করা এবং জ্ঞানীদের সাথে ওঠা-বসার মাধ্যমে।

২- তাওহীদের মর্যাদা সম্পর্কে জানা; আর তা হল যে ব্যক্তি তাওহীদ বাস্তবায়ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক না করে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।)[২]

৩- এটা জানা কর্তব্য যে, শিরকী ও বিদয়াতী শব্দাবলী শুধুমাত্র জাহেলদের থেকেই প্রকাশিত হয়; যারা তাওহীদের হাকীকত ও তার মর্যাদা সম্পর্কে জাহেল। আর মুসলিম ব্যক্তি জাহেল হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে।

৪- সঠিক আদর্শের উপস্থিতি যা কথা এবং কাজে তাওহীদের মর্মকে নিশ্চিত করে; কেননা মানুষেরা সবসময় ও মুহূর্তে আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যেমন মুসা আঃ এর সম্প্রদায় তাদের নবীর সাথে থাকাবস্থায় যখন সাগর পার হয়ে এসে মুশরিকদের প্রতিমাপূজা দেখল তখন তারা মুসা আঃ এর নিকট অনুরূপ আবেদন করল। কিন্তু অনুসরণীয় সঠিক আদর্শের ধারক মুসা আঃ তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং তাদেরকে মূর্তিপূজার

(১) সূরা আল-হজ্জ: (৭৩)।
(২) সহীহ মুসলিম (১/৯৪, হা: ১৫২-৯৩)।

প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন: ﴿وَجَٰوَزۡنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ قَوۡمٖ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصۡنَامٖ لَّهُمۡۚ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلُونَ ١٣٨ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٞ مَّا هُمۡ فِيهِ وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ অর্থ: [আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দেই; তারপর তারা মূর্তিপূজায় রত এক জাতির কাছে উপস্থিত হয়। তারা বলল, হে মূসা! তাদের মা'বুদদের ন্যায় আমাদের জন্যও একজন মা'বুদ স্থির করে দাও। তিনি বললেন, তোমরা তো এক জাহিল সম্প্রদায়।* এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত করা হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক।][১]

৫- এমন পাঠ্যক্রমের উপস্থিতি যা উঠতি প্রজন্মকে সঠিক আকীদা লালন ও শিরকমুক্ত শব্দাবলী ব্যবহারের শিক্ষা দিবে।

(১) সূরা আল-আ'রাফ: (১৩৮-১৩৯)।

দ্বিতীয়ত: চোখ-কানের দোষত্রুটি:

চোখ ও কান অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। আর উভয়টি হল শিক্ষা লাভের মাধ্যম। সুতরাং মানুষ চোখের দ্বারা আল্লাহর জাগতিক নিদর্শনাবলী অবলোকন করে, এই দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে সব দর্শনীয় বস্তুসমূহ রেখেছেন সে তা উপভোগ করে, কান দিয়ে কথাবার্তা শোনে এবং নানা আওয়াজের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে; ফলে দেখা ও শোনার মাধ্যমে তার জ্ঞান, বোধ এবং উপদেশের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এই মহা নেয়ামাতের প্রেক্ষিতে মানুষকে সে নেয়ামতের দায়-দায়িত্ব এবং তা ব্যবহারের পরিণাম গ্রহণ করতে হয়। তাই কোন মুমিনের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার চোখ-কানকে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ব্যবহার করবে। তার কেমন অবস্থা হবে যদি তাকে চোখ-কানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়?

মন্দ আচরণের অন্তর্গত হল, একজন ব্যক্তি কর্তৃক এ সকল ইন্দ্রীয়গুলোকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন; সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা। যার বিবরণ নিম্নে পেশ করা হল:

গানবাদ্য শ্রবণ করা

আরবি (**المعازف**) শব্দটির বহুবচন, এর একবচন হল: মিজাফ ও মিজাফাহ। যার অর্থ হল: বিনোদন যন্ত্র বা বাদ্যযন্ত্র।

আল-আজফু অর্থ হল: বাদ্যযন্ত্র বাজান। যেমন দফ ইত্যাদি যাতে আঘাত করে বাজান হয়।

আজেফ অর্থ হল: বাদক বা গায়ক।(১)

জাওহারী থেকে ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেন যে, মাআজেফ শব্দের অর্থ হল গান। তবে জাওহারীর সিহাহ গ্রন্থে এর অর্থ রয়েছে বাদ্যযন্ত্র, কারো মতে: বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। দিময়াতীর লিখিত টীকায় মাআজেফ শব্দের অর্থ দফ বা অনুরূপ যা আঘাত করে বাজান হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। আর গান বুঝাতে আজফুন ব্যবহার করা হয়। মূলত সকল ক্রীড়া-তামাশাই আজফ।(২)

গানবাদ্যের বিধান:

মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ অর্থ: [আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য আসার বাক্য কিনে নেয় জ্ঞান ছাড়াই এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।](৩)

---

(১) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (৯/২৪৪)।
(২) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৫৫)।
(৩) সূরা লুকমান: (০৬)।

ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রাঃ সহ প্রমূখগণ আয়াতে বর্ণিত ‘লাহওয়াল হাদিস’ বা অসার বাক্য দ্বারা গান অর্থ করেছেন। আর সেটি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নিষিদ্ধ। ইমাম কুরতুবী রহিঃ বলেন: “এটি তিনটি আয়াতের একটি আয়াত যা দ্বারা উলামাগণ গান নিষিদ্ধ ও মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটি হল মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَأَنتُمۡ سَٰمِدُونَ﴾ অর্থ: [আর তোমরা উদাসীন।](১) ইবনু আব্বাস রাঃ এর ব্যাখ্যায় বলেন, হিমইয়ারী ভাষায় ‘সামিদূন’ অর্থ গান। যেমন বলা হয় (أسمدي لنا) অর্থাৎ আমাদের জন্য গান গাও। আর তৃতীয় আয়াত হল মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ﴾ অর্থ: [আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত কর।](২) ইমাম মুজাহিদ রহিঃ বলেন: “গান এবং বাঁশী”।

সুন্নাহ থেকে গানবাদ্য নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হল রাসূল সাঃ এর বাণী: (আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।)(৩)

এ সকল কুরআনের আয়াত, হাদিসে নববী এবং এ দলীলগুলো থেকে উলামাগণের বুঝ একজন ব্যক্তির নিকট গান-বাদ্যের ইসলামী বিধান সুস্পষ্ট করেছে।

এটা হল গানবাদ্য ও অশ্লীল কথাবার্তা মুক্ত নাশীদ শোনার বিপরীত; এটি বৈধ। যেমনটি আরবের লোকেরা তাদের সফরে নাশীদ গাইত। ইমাম কুরতুবী বলেন: “আর তা হল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ গান এবং যা আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, আর যে অশ্লীল কথাবার্তা সুপ্ত কামনা-বাসনাকে জাগিয়ে তোলে। এ প্রকার যদি এমন কবিতা হয় যাতে নারীদের ও তাদের সৌন্দর্য্যের উল্লেখ থাকে এবং হারাম বস্তু ও মদের আলোচনা থাকে; তাহলে তা হারাম হওয়ার বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। কেননা রঙ্গ-তামাশ এবং গান নিন্দনীয় সর্বসম্মতিক্রমে।

তবে যদি কোন গান উপরোক্ত বিষয় থেকে মুক্ত হয় তাহলে আনন্দ, বিয়ে ও ঈদের মুহূর্তে এবং কঠিন কাজে প্রেরণা দানের সময় কিছু গাওয়া জায়েয আছে। যেমন খন্দক খননের সময় গান গাওয়া বা উট চালনার সময় আনজাশা এবং সালামাহ বিন আকওয়া রাঃ এর গান গাওয়া। আর বর্তমান যুগের সুফীরা খঞ্জনী, দফ এবং তারযন্ত্রের মাধ্যমে গান শোনার নেশার যে প্রচলন ঘটিয়েছে তা হারাম”।(৪)

গান শোনার কারণসমূহ:

গানবাদ্য শোনার প্রতি আগ্রহী করে তোলার নানা কারণ রয়েছে; যেগুলো অনুসরণ করলে ব্যক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিহার করার মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে হল:

১- অসৎ লোকজন কর্তৃক সুরেলা কণ্ঠের অধিকারীদের তাদের কণ্ঠকে গানবাজনায় ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে অর্থবিত্ত, উৎসাহ এবং সুখ্যাতির প্রলোভন দেয়া।

২- গান গাওয়ার মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জনের আগ্রহ এবং কাম-প্রবৃত্তির মাঝে নিমজ্জিত হওয়ার বাসনা।

---

(১) সূরা আন-নাজম: (৬১)।
(২) সূরা আল-ইসরা: (৬৪)।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/১৩, হা: ৫৯০৯)।
(৪) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (১৪/৩৬)।

৩- ব্যক্তি যে পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং মহল্লায় বসবাস করে সেখানের শিক্ষণীয় পরিবেশের ভূমিকা। যদি এই সমস্ত পরিবেশ গান শোনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী হয় তাহলে ব্যক্তি বেড়ে ওঠে গানের প্রতি ভালবাসা এবং আসক্তি নিয়ে।

৪- গানবাদ্যওয়ালা এবং গানের প্রতি আসক্তদের সাথে মেলামেশা ব্যক্তিকে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

৫- গানের শরয়ী বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং গান শোন বৈধ ফতুয়া প্রদান ও দলীলের অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে শরীয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন কতক দাবিদারদের গান শোনার বিষয়টি সুশোভিত করে উপস্থাপন করা।

গান শ্রবণের বিপদসমূহ:

দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উপর গানবাদ্যের ভয়াবহ প্রভাব রয়েছে; যেমনটি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১- গানবাদ্য মানুষকে আল্লাহর যিকির-আযকার থেকে বিরত রাখে; কেননা সেটি বিরত রাখারই মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ অর্থ: [আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য আসার বাক্য কিনে নেয় জ্ঞান ছাড়াই এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।][১] ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিঃ বলেন: “গানে আসক্ত এমন কাউকে পাবেন না যার মাঝে জ্ঞানগত ও আমলগত হেদায়েত থেকে ভ্রষ্টতা নাই! আর তার মাঝে কুরআন শ্রবণে অনাগ্রহ এবং গান শ্রবণের আগ্রহ রয়েছে”।[২]

২- গানবাদ্য অন্তরকে অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার দিকে চালিত করে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিঃ বলেন: “গানবাদ্য শয়তানের কুরআন এবং দয়াময় আল্লাহর পথে বড় অন্তরায়। এটি সমকামিতা ও ব্যাভিচারের মন্ত্র। এর মাধ্যমেই নষ্ট আশেক তার মাশুককে কাছে পায়, শয়তান বাতিল অন্তরগুলোকে ধোঁকা দেয় এবং প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে সে তাদের নিকট গানকে সুন্দর করে তোলে”।[৩]

৩- গানের সাথে যুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। ইমাম কুরতুবী রহিঃ বলেন: “সর্বদা গান শোনায় মগ্ন থাকা নির্বুদ্ধিতা এবং তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। তবে সে যদি নিয়মিত গান না শোনে তাহলে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে না।[৪]

---

(১) সূরা লুকমান: (৬)।
(২) ইগাছাতুল লাহফান (১/২৫৯)।
(৩) প্রাগুক্ত।
(৪) কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন (১৪/৩৮)।

৪- গান অন্তরে নিফাকির জন্ম দেয়। আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ রহিঃ বলেন: আমি আমার পিতাকে গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, গান অন্তরে নিফাকির জন্ম দেয় এবং আমি অপছন্দ করি। অতঃপর তিনি ইমাম মালেক রহিঃ এর উক্তি বর্ণনা করলেন: আমাদের নিকট ফাসেকেরা গান গায়।[১]

৫- গানবাদ্যের বিপদের অন্যতম হল এটি যা কিছু উৎপন্ন করে তা হারাম; তাই এটি থেকে মজুরি নেয়া হারাম এবং এর দ্বারা সম্পদ ভক্ষণ করা অন্যায় যা মৃতবস্তু ও রক্তের বিনিময় গ্রহণ করে ভক্ষণ করার সমপর্যায়ের। আর কোন ব্যক্তির জন্য গায়কের জন্য অর্থ ব্যয় করা জায়েয নয় বরং এটা তার জন্য হারাম।

৬- অনুরূপভাবে গানবাদ্যের বিপদের অন্তর্গত হল এটি লজ্জা কমিয়ে দেয়, কাম-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করে। ইয়াজীদ বিন ওয়ালীদ বলেন: হে বনী উমাইয়্যাহ! তোমরা গানবাদ্য থেকে বেঁচে থাকবে; কেননা এটি লজ্জা কমিয়ে দেয়, কাম-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করে।[২]

৭- গানবাদ্য কাম-প্রবৃত্তির আহ্বায়ক এবং যিনার পথ; কেননা এটি বিবেকের শরাব। কত স্বাধীন নারীই না গানবাদ্যের কারণে ব্যাভিচারিনীতে পরিণত হয়েছে, কত স্বাধীন ব্যক্তিই না এর কারণে বালক-বালিকাদের দাসে পরিণত হয়েছে, কত আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তিই না এর কারণে মানুষের মাঝে খারাপ নামে পরিচিত হয়েছে, কত সম্পদশালী ব্যক্তিই না এর কারণে নিঃস্বতে পরিণত হয়েছে এবং কত বিপদমুক্ত ব্যক্তিই না গানবাদ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণে সন্ধ্যায় উপনীত হতেই নানা ধরণের বিপদাপদে আক্রান্ত হয়েছে।[৩]

প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনা:

১- বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা এবং কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা; কেননা এটি মুমিনদের জন্য তৃপ্তিদায়ক, সকল প্রকার নির্জনতায় সাথী, উৎকন্ঠা থেকে প্রশান্তিদায়ক এবং সকল দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা থেকে আনন্দের উপলক্ষ। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ অর্থ: [যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।][৪]

২- গানবাদ্যের আসর এবং গানবাদ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকা। কেননা তাদের সাথে মেলামেশা তাদের সাদৃশ্যতা ও ঘনিষ্ঠতাকে আবশ্যক করে।

৩- বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় এবং জ্ঞানের আলো বৃদ্ধি করে এমন উপকারী পাঠে আত্মনিয়োগ করা।

৪- বাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে ইসলামী তরবিয়ত শিক্ষা দেয়া।

৫- মসজিদের মিম্বারে এবং সংবাদ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের নিকট গানবাদ্যের বিধান বর্ণনা করা।

(১) ইগাছাতুল লাহফান (১/২৪৮)।
(২) প্রাগুক্ত (১/৪৬৩)।
(৩) প্রাগুক্ত (১/২৬৫)।
(৪) সূরা আর-রাদ: (২৮)।

গোয়েন্দাগিরি

তাজাসসুস বা গোয়েন্দাগিরির আভিধানিক অর্থ হল:

অভ্যন্তরীণ বিষয় অনুসন্ধান করা। আর গোয়েন্দাগিরি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় মন্দ বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। কারো মতে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করাকে গোয়েন্দাগিরি বলা হয়। আর জাসুস হল যে গোয়েন্দাগিরি করে।(১)

পারিভাষিক অর্থ:

তাজাসসুসের অর্থ হল: অনুসন্ধান করা, এটি আবু উবায়দা রহিঃ এর বক্তব্য।(২)

তাজাসসুস বা গোয়েন্দগিরি হল মানুষের একান্তে অবস্থানের সময় তাদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা; হয় অজ্ঞাতে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা বা অজান্তে তাদের কথা চুরি করে শোনা অথবা তাদের লেখনী, দলীল-দস্তাবেজ এবং গোপনীয়তা যা কিছু তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখত -তাদের অনুমতি ব্যতীত সেগুলো অবগত হওয়ার মাধ্যমে।

মুসলিমদের উপর গোয়েন্দগিরি করা, তাদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা এবং তাদের গতিবিধি, কথাবার্তা ও কাজকর্মের উপর নজরদারি করা সে সব মন্দস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।](৩)

রাসূল সাঃ বলেছেন: (হে ঐ সম্প্রদায় যারা মুখে ঈমান এনেছ কিন্তু হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি! শোন, তোমরা মুমিনদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না, তাদের গোপন দোষ তালাশ করে ফিরবেনা। কেননা, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ তালাশ করবে আল্লাহ তার গোপন দোষ উদঘাটিত করে দিবেন। আর আল্লাহ যার দোষ বের করে দিবেন তাকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন যদিও সে তার হাওদার অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে।)(৪) তিনি আরো বলেছেন: (তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারো প্রতি ধারণা পোষন করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ অন্বেষন করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর হিংসা

(১) ইবনে মানযুর লিসানুল আরব (৬/৩৮)।
(২) ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী (৬/১৪৩)।
(৩) সূরা আল-হুজুরাত: (১২)।
(৪) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৯৪, হা: ৪৮৮০), সুনানে তিরমিযি (৪/৩৩১-৩৩২, হা: ২০৩২) এবং তিনি হাদিসটিকে ‘হাসান গরীব’ বলেছেন।

করো না একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষন করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না। বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।)[১]

কিছু মানুষ গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়, সে যদি চিন্তা করে এবং ছিদ্র, দরজা ও জানালা ভেদ করে তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মুসলিমদের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করে এবং ঐ মুহূর্ত অবলোকন করে স্বাদ অনুভব করে, যার কারণে তার গোনাহ লেখা হয় -সে যেন রাসূল এই হাদিসটি হৃদয়াঙ্গম করে। তিনি বলেছেন: (কোন ব্যক্তি যদি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে আর ঘরের মালিক তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে সে দিয়াত এবং বদলা কিছুই পাবে না।)[২]

ইবনু শিহাব থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় সাহল বিন সাদ আস-সায়েদী রাঃ তাকে সংবাদ দিয়েছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাঃ এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূল সাঃ এর কাছে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তার মাথা চুলকাচ্ছিলেন। রাসূল সাঃ তাকে দেখে বললেন: (আমি যদি জানতাম যে তুমি আমাকে দেখছ, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূল সাঃ আরো বললেন, চোখের কারণেই তো অনুমতির বিধান করা হয়েছে।)[৩]

ইমাম নববী রহিঃ বলেন: “অত্র হাদিসে হালকা বস্তু দিয়ে ঘরে উঁকি দেয়া ব্যক্তির চোখে আঘাত করা বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি হালকা বস্তু নিক্ষেপ করে এবং এর ফলে উঁকিমারা ব্যক্তির চোখ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর কোন জামানত নেই; যদি সে ঘরে মাহরাম কোন নারী না থাকে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত”।[৪]

গোয়েন্দাগিরির প্রকারভেদ

গোয়েন্দগিরির প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হল:

শত্রু এবং তাদের সরঞ্জাম, সৈন্য সংখ্যা, গতিবিধি ইত্যাদির উপর যুদ্ধকালীন গোয়েন্দাগিরি করা তাদের জয় লাভের সুযোগ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় প্রকার হল: রাষ্ট্র কর্তৃক সন্দেহভাজনদের উপর নজরদারি করা। আর এ মাসয়ালাগুলোর নির্ধারিত বিধান রয়েছে ইসলামে। তৃতীয় প্রকার হল: একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির উপর গোয়েন্দাগিরি করা। এখানে এটিই উদ্দিষ্ট বিষয়।

গোয়েন্দাগিরির বিপদসমূহ:

১- যে ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরি করল সে হারাম কাজে লিপ্ত হল এবং আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করল। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।][৫]

---

(১) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(২) সুনানে নাসায়ী (৮/৬১, হা: ৪৮৬০), শাইখ আলবানী সহীহুল জামে গ্রন্থে (২/১৪৪৫) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/২৭৪, হা: ৬৯০১), সহীহ মুসলিম (৩/১৬৯৮, হা: ৪০-২১৫৬)।
(৪) ইমাম নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (১৪/১৩৮)।
(৫) সূরা আল-হুজুরাত: (১২)।

২- মুসলিমদের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর লাঞ্ছনার সম্মুখীন করে তোলে; যদি সে হাওদার মাঝে অবস্থান করে। যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ তালাশ করবে আল্লাহ তার গোপন দোষ উদঘাটিত করে দিবেন। আর আল্লাহ যার দোষ বের করে দিবেন তাকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন যদিও সে তার হাওদার অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে।)[১]

৩- দোষ অনুসন্ধানকারী এবং যার দোষ অনুসন্ধান করা হয় উভয়ের মাঝে গোয়েন্দাগিরি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা উস্কে দেয়।

৪- যে মুসলিমদের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায় সে তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; ফলে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখে নিজের জন্য কষ্ট-ক্লেশ এবং বিপদাপদ ডেকে আনে।

৫- গোয়েন্দাগিরি ব্যক্তির জন্য সমাজের ঘৃণা এবং তার ব্যাপারে তাদের ভয় তৈরি করে।

প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনা

গোয়েন্দাগিরির প্রতিকারমূলক তরবিয়তি দিকনির্দেশনার অন্তর্গত হল:

১- মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করার ভয়াবহতার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পরিবার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করা। তাদের উপর যে শত্রুতা, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের মত ফলাফল সৃষ্টি করে আড়ি পেতে কথা শোনা, নানা ইন্দ্রীয় দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কারণে এবং তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করার কারণে সমাজ ব্যবস্থা যে ভেঙ্গে পড়ে এ বিষয়েও সচেতনতা সৃষ্টিতে সমাজ ও পরিবারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেয়া।

২- মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধানে যার অন্তর তাকে প্ররোচিত করেছে সে হাওদার মাঝে অবস্থান করলেও আল্লাহর শাস্তি এবং তাঁর লাঞ্ছনা করার বিষয়টি যেন স্মরণ করে।

৩- ইসলামি চারিত্রিক মানদণ্ড স্থাপন করা যে, সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে মুসলিমদের জন্যও তাই পছন্দ করে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করে সে তাদের জন্যও তা অপছন্দ করে। কেননা এটি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।)[২] সুতরাং সে বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত ভাববে এবং তার আচরণে প্রয়োগ করবে।

৪- এটা স্মরণ করা যে, কিছু মানুষের চরিত্র অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করার মন্দ চরিত্র থেকে উন্নত। বরং মানুষের দোষত্রুটি প্রকাশ পেলেও তারা উপেক্ষা করে। উরউয়া ইবনুল ওয়ারদ বলেন[৩]:

তীব্র বাতাস আমার প্রতিবেশির ঘর উন্মুক্ত করে দিলে…আমি অন্যমনস্ক থাকব যতক্ষণ না ঘর আবৃত করা হয়।

---

(১) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(২) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৩) দিওয়ানে উরউয়া (পৃঃ ১৯)।

জাহেলী যুগের কবি আনতারা বিন শাদ্দাদ বলেন[১]:

আমার প্রতিবেশির কিছু প্রকাশ পেলে দৃষ্টি সংযত রাখি….যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশী তার আবাসস্থল আবৃত করে।

তাহলে একজন মুসলিম কীভাবে মানুষের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে? জাহেলী যুগের জ্ঞানীরা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেয়া

আভিধানিক অর্থ:

নজর অর্থ হল: চোখের দর্শন, আর তা হল কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ করা।[২]

হারাম হল হালালের বিপরীত এবং বহুবচন হুরুম।[৩] আর হারাম জিনিস এলাহী অধীনতা অথবা জবরদস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা নিষিদ্ধ।[৪]

পারিভাষিক অর্থ:

নিষিদ্ধ দৃষ্টি হল: আল্লাহ তায়ালা যা দেখতে নিষেধ করেছেন চোখ দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করা।

নিষিদ্ধবস্তুর দিকে দৃষ্টি দেয়ার অসংখ্য কারণ রয়েছে; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল:

১- কোন জিনিসের গুণগত, আকারগত, বর্ণগত এবং পরিমাণগত অবস্থা অবগত হওয়া এবং তার প্রকৃত অবস্থা জানার বাসনা।

২- দৃশ্য অবলোকনের মাধ্যমে উপভোগ করা।

৩- দৃশ্যের আকর্ষণ, তার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার মাধ্যমে তার ভালবাসার টান অনুভব এবং হৃদয়কে আকৃষ্টকরণ।

৪- সৌন্দর্য বা অসৌন্দর্যের মাধ্যমে দৃশ্যের দৃষ্টি আকর্ষণের অধিকারী হওয়া।

হারামবস্তুর দিকে দৃষ্টি দেয়ার বিপদসমূহ:

দৃষ্টিশক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত। কাজেই ব্যক্তি যদি এটাকে আল্লাহর কর্তৃক অবৈধ কিছু অবলোকনে ব্যবহার করে তাহলে এটি তার জন্য বিপদ ও অনিষ্টের কারণ হবে এবং তার জন্য নানা ধরণের বিপদাপদ এবং ক্ষতি ডেকে আনবে; আর তা হল:

(১) আশআরু আনতারা (পৃঃ ৮৬)।
(২) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (৫/২১৫)।
(৩) প্রাগুক্ত (১২/১১৯)।
(৪) আর-রাগেব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (পৃঃ ১১৪)।

১- হারাম দৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাফরমানি এবং এই নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা রয়েছে যে নেয়ামতকে আল্লাহ তায়ালা অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ অর্থ: [মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।* আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।][১]

২- দৃষ্টি হল হারাম কাজ সংঘটনের বিপদজনক উপকরণ এবং মাধ্যম। সুতরাং গায়রে মাহরাম পুরুষ নারীর দিকে বা নারী পুরুষের দিকে তাকান মন্দের সূচনা করে এবং কাম-প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (দৃষ্টি হল ইবলিসের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্য হতে একটি তীর।)[২]

৩- হারাম দৃষ্টি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ডেকে আনে। মন্দ থেকে দূরে থাকা কত প্রশান্ত অন্তরই না টেলিভিশন অথবা সাময়িকীর হারাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কারণে তার প্রশান্তিকে অনিষ্ট, বিপর্যয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ এবং আফসোসে পর্যবসিত করেছে।

৪- হারাম দৃষ্টির মাঝে আল্লাহর আনুগত্য এবং যা বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকার তা থেকে চিন্তাভাবনাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার গুণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং কত হারাম দৃষ্টিই না ব্যক্তিকে ইবাদত আদায় এবং সুন্নাহ বাস্তবায়ন থেকে ব্যস্ত রেখেছে অথবা তার পেশা ও আয়ের উৎস থেকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করেছে।

৫- হারাম দৃষ্টি কখনো অন্তরকে অসুস্থ ও তার কল্যাণের ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়।

প্রতিকারমূলক তরবিয়তি পদ্ধতি

যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে হারাম জিনিসের প্রতি মুক্ত করে দিয়েছে তার সংশোধনের জন্য প্রতিকারমূলক তরবিয়তি কিছু পদ্ধতি:

১- একজন ব্যক্তির জানা ও অনুধাবন করা উচিৎ যে, মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মধ্যে হল তিনি তাকে দুটি চোখ দান করেছেন যা দ্বারা সে অনেক জিনিস অবলোকন করে এবং তিনি যা বৈধ করেছেন তা উপভোগ করে। আর নেয়ামতের হক হল তার শুকরিয়া আদায় করা এবং তার কুফরী না করা। আর চোখের শুকরিয়া হল হারাম বস্তু থেকে দৃষ্টিকে অবনত রাখা এবং হৃদয় ও জিহ্বা দ্বারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা যেহেতু সে দৃষ্টিশক্তির নেয়ামত হারায়নি।

---

(১) সূরা আন-নূর: (৩০-৩১)।
(২) আল-হাকেম, আল-মুস্তাদরাক (৪/৩১৪) এবং তিনি হাদিসটির ইসনাদকে সহীহ বলেছেন আর ইমাম যাহাবী সহমত পোষণ করেছেন।

২- অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব সম্পর্কে অনুভব করা যার অন্যতম হল চোখ। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ অর্থ: [আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।][১]

৩- দৃষ্টি অবনত রাখার উত্তম পরিণতি রয়েছে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (দৃষ্টি হল ইবলিসের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্য হতে একটি তীর। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে তা পরিহার করবে আল্লাহ তাকে বিনিময়ে ঈমান দান করবেন; যার স্বাদ সে হৃদয়ে উপলব্ধি করবে।)[২]

যে ব্যক্তি হারামবস্তু থেকে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরদৃষ্টি ও হৃদয়ের নূরকে উন্মুক্ত করে দিবেন। ফলে সে এমন কিছু দেখবে যা ঐ ব্যক্তি দেখতে পায় না যে তার দৃষ্টিকে মুক্ত করে দিয়েছে এবং আল্লাহর হারামবস্তু থেকে দৃষ্টিকে অবনত রাখেনি।[৩]

৪- দৃষ্টিশক্তি হল শিক্ষা গ্রহণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন এবং এর দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ার বিষয়ে উপকৃত হওয়ার মাধ্যম; এ বিষয়টি জানা। এ প্রেক্ষিতে বান্দার উপর আবশ্যক হল সে তার দৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হারাম বিষয়ে নিক্ষেপ করবে না।

৫- যে সব মাধ্যম হারাম বিষয়ে দৃষ্টি দিতে প্ররোচিত করে এমন মাধ্যম থেকে দূরে থাকা; যেমন: বাজার-ঘাট, অবাধ মেলামেশা এবং পত্রিকা, সাময়িকী ও টেলিভিশনে প্রকাশিত ছবি দেখা।

তৃতীয়ত: কর্মগত দোষত্রুটি:

কর্মগত দোষত্রুটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেই সমস্ত চারিত্রিক বিচ্যুতি যা সম্পাদনের জন্য শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়; যেমন: যিনা, চুরি, দেহপ্রদর্শনী, নেশাদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি। এগুলো যেহেতু অনেক তাই এর মধ্যে যেগুলোর ভয়াহতা সবচেয়ে বেশি সেগুলো উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

শিরকী কর্মকাণ্ডসমূহ:

শব্দগত দোষত্রুটির আলোচনায় আমাদের নিকট শিরকের ধারণা ও তার কারণ এবং প্রতিকারের আলোচনা স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। এখানে আমি শুধু কর্মগত শিরকী কর্মকাণ্ডের প্রকারসমূহের উদাহরণ উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি; আর সেগুলো হল:

১- গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবাই বা কুরবানী করা:

রবের সাথে বান্দার আচরণের সাথে সম্পর্কিত সবচেয়ে ঘৃণিত ও ধিকৃত মন্দ আচরণ হল, যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এমন কোন কিছুকে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা; যেমন গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবাই বা

---

(১) সূরা আল-ইসরা: (৩৬)।
(২) হাদিসটির তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।
(৩) ইবনুল কায়্যিম, ইগাছাতুল লাহফান (১/৬০-৬১)।

কুরবানী করা। আর এটি হল শিরক। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ অর্থ: [বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।][১] অত্র আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, পশু যবাই বা কুরবানী আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শুধু শুদ্ধ হবে এবং তা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে করা শিরক।

কিছু মানুষ কল্যাণ আনায়ন এবং অনিষ্ট দূর করার জন্য জ্বিন এবং শয়তানের উদ্দেশ্যে কুরবানী করার শিক্ষার উপর বেড়ে উঠেছে। অথচ এ কর্মের মাঝে আল্লাহর সাথে শিরকের অপরাধ নিহিত রয়েছে। সুতরাং একজন মুসলিমের আবশ্যকীয় করণীয় হল নিজেকে আল্লাহর খালেস তাওহীদের উপর গড়ে তোলা এবং তার পরিবার-পরিজনদের এর শিক্ষা দেয়া; যাতে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারে।

(১) সূরা আল-আন’আম: (১৬২)।

২- তাবিজ ঝুলানো:

তাওহীদী আক্বীদার বিপরীত খারাপ চরিত্রের অন্তর্গত হল বদ-নজর বা হিংসা প্রতিরোধের জন্য এবং কল্যাণ ও সুস্থতা আনয়নের লক্ষ্যে মানুষ, প্রাণী বা গাড়ীর উপর ঝুলানো তাবিজের সাথে অন্তরকে সম্পৃক্ত করা। নবী সাঃ উম্মতকে এসমস্ত শিরকী কর্মকান্ড থেকে সতর্ক করে বলেনঃ (নিশ্চয় রুকা বা মন্ত্র, তাবিজ ও তেওলা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।)(১)

তামিমা বা তাবিজ হল: বদ-নজর থেকে বাঁচার জন্য বাচ্চাদের শরীরের যে পুঁতি জাতিয় জিনিস ঝুলানো হয়।

তেওলা হল: স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বস করানো বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বস করানো উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয়।

রুকা বা ঝাড়ফুক তিনটি শর্তের ভিত্তিতে জায়েয যথাঃ

ক- তা আল্লাহর কালাম, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর মাধ্যমে হতে হবে বা আল্লাহর নিকট দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থণার মাধ্যমে হতে হবে।

খ- অর্থবোধক সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় হতে হবে।

গ- এই বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, স্বয়ং তাবিজই তার উপকারে আসবে। বরং বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর অনুযায়ী এর উপকার হবে।)(২)

৩- সৎলোকদের করব নিয়ে বাড়াবাড়িঃ

সম্মানের উদ্দেশ্যে করব অভিমুখী হওয়া নিঃসন্দেহে শিরক, চায় সেখানে তাওয়াফ করুক বা সেটাকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করুক কিংবা কবরবাসী থেকে সাহায্য কামনা করুক। কেননা এগুলো হল ইবাদত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা বৈধ নয়। সহীহ হাদিসে এসেছে: (হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিও না যা লোকেরা ইবাদত করবে। আল্লাহর কঠিন রোষাণলে পতিত হবে সেই জাতি যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।)(৩)

হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাঃ আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন যে, তিনি যেন তার কবরকে মূর্তি না বানান যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হবে। অথচ তিনি হলেন সর্বোত্তম মানুষ। সুতরাং তার চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষের কবরের বিষয়টি কেমন?! তাই একজন মুসলিমের জন্য আবশ্যক হল সে আল্লাহর ইবাদত করবে যেমনভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজেকে একনিষ্ঠ তাওহীদের উপর গড়ে তুলবে।

বিকৃত যৌনাচার

(১) আহমাদ (১/৩৮১) হাকেম সহীহ বলেছেন (৪/৪১৮), যাহাবী সহমত পোষণ করেছেন।
(২) আহমাদ (১/৩৮১) হাকেম সহীহ বলেছেন (৪/৪১৮), যাহাবী সহমত পোষণ করেছেন।
(৩) মুয়াত্তা মালেক (৮৫)।

বিকৃত যৌনাচারের অর্থঃ

মানুষের দ্বারা সংঘটিত কতিপয় বিকৃত যৌনাচার হল: ব্যভিচার, পুরুষ-পুরুষ ও নারী-নারী সমকামিতা। এগুলো জাহেলী ব্যাধি যা ইসলাম হারাম করেছে ও নির্মূলের চেষ্টা করেছে। এগুলোর বিস্তারিত জানার পূর্বে তার পরিচয় জানা প্রয়োজন।

ব্যভিচারঃ তা হল, বিশুদ্ধ বা সংশয়মূলক বিবাহ কিংবা দাসী ব্যতীত অন্য কারো সাথে সহবাস করা। আর এ ব্যাপারে সকল ওলামাগণ একমত।[১]

এর সংজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে: শরীয়তসম্মত বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত নারী-পুরুষ সহবাস করা।[২] এভাবেও বলা যায় যে, তার জন্য বৈধ নয় এমন নারীর লজ্জাস্থানে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করা।[৩]

সমকামিতাঃ তা হল লূত সম্প্রদায়ের কর্ম করা। বলা হয়ে থাকে (لوّط فلان) তথা লূত সম্প্রদায়ের কর্ম করল।[৪]

সিহাক তথা নারী সমকামিতা: আরবীতে সিহাক অর্থ চাপ দেয়া, আর সাহাক বলা হয় ভেজা কাপড়কে, আবার সুহুক অর্থ দূরে যাওয়া। সমকামী নারী কথাটি খারাপ গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারী সমকামি বলা হয় নারী-নারীতে সহবাস ব্যতীত আনুসাঙ্গিক কাজ করা।[৫]

বিকৃত যৌনাচারের কারণ:

নিম্নে বিকৃত যৌনাচারের কারণ আলোচনা করা হল:

১- ভুল ধারণাসমূহ:

কখনো মানুষ ধারণা করে যে এক লিঙ্গের মানুষের অপর লিঙ্গের অসংখ্য ব্যক্তির সাথে সহবাস করা তাকে কাঙ্খিত উপভোগ ও বিনোদন দিবে। তার কল্পনায় আসেনা যে, এই ধারণা তাকে সতীত্ব ও সংযমে থেকে শরয়ী বিবাহের প্রকৃত উপভোগ থেকে বঞ্চিত করবে। যেলোক এ ধরণের কাজ করে তার আত্মসম্মানের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

এই দিকে ইঙ্গিত করে ইবনুল জাওযী বলেন: অন্তরের প্রাথমিক কল্পনাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তবে তা চিন্তায় রূপান্তরিত হয়, আর চিন্তাকে যদি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা না হয়; তবে তার সাথে কুমন্ত্রণা মিশ্রিত হয়ে কুপ্রবৃত্তির জন্ম দেয়।[৬]

---

(১) ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী, বেদায়াতুল মুজতাহিদ (২/৪৬৭)।
(২) মাওদুদী, তাফসীরে সূরাতুন নূর পৃঃ (৩৮)।
(৩) শানকীতী, তাফসীরে সূরাতুন-নূর পৃষ্ঠা (২৫)।
(৪) আর রাগেব আল-আসবাহানী, আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন পৃষ্ঠা (৪৫৬)।
(৫) সায়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (২/৪২৬)।
(৬) ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া পৃষ্ঠা (১২০)।

২- মিডিয়ার প্রোপাগান্ডাঃ

সকল ধরণের যৌন অশ্লীলতা প্রচার ও তার আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করছে সে সকল মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা যা বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে। এগুলো ফিতনা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রচার করছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সাহিত্যিক লেখনি ও ভালবাসার গল্প যা প্রকাশনীগুলো তৈরী করছে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীক লাইব্রেরী বিক্রি করছে। এই দিকে ইঙ্গিত করে মওদুদী বলেন: যৌন উন্মদনার উৎস হল সাহিত্য, ছবি, সিনেমা, মঞ্চ, নাচ, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং মাসিক ম্যাগাজিন যেগুলো গল্প ও প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করছে চরম অশ্লীল ভাষায় ও লজ্জাজনক উলঙ্গ ছবিতে; কেননা তা প্রচার-প্রসারে অধিক কার্যকর।(১)

ইসলামী দেশসমূহের মিডিয়ায় প্রচারিত দৈনন্দিন বিজ্ঞাপনে দৃষ্টিদানকারী ব্যক্তি লক্ষ্য করবে উগ্রতার দিক থেকে তা কোন অংশেই ইউরোপের চেয়ে কম নয়। এমনকি পণ্যটিতে যে কাভার লাগনো হয় তাতে নারীর ছবি থাকে যে নারীকে নির্বাচন করা হয়েছে তার সৌন্দর্য ও অকর্ষণীয়তার ভিত্তিতে। আর এগুলোকে সমর্থন যোগায় কিছু প্রডাক্টের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাতে যুবক যুবতীরা সম্পৃক্ত থাকে এর দ্বারা নারী-পুরুষের মাঝে ফেতনা ও কুপ্রবৃত্তি ছাড়ায়।

৩- সৌন্দর্য প্রদর্শনঃ

যৌন ফেতনা বৃদ্ধির আরো একটি কারণ হল, নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ, তাদের সাজসজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, চেহারা উন্মুক্ত ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে বের হওয়া, উপরন্তু নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অপরিচিত লোকের সাথে একান্তে বাস। এটি শয়তানের প্রবেশ পথ। তাই ইসলাম আমাদেরকে অপরিচিত লোকের সংস্পর্শ গ্রহণ করা থেকে সতর্ক করেছে। নবী সাঃ বলেছেনঃ (মাহরামের বিনা উপস্থিতিতে কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে। এক ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে কিন্তু আমর স্ত্রী হজে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে যাও নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ কর।)(২)

অনুরূপভাবে পুরুষের সাথে নারী ওপেন কাজের সুযোগ অবাধ মেলামেশা ও সংস্পর্শ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং দৃষ্টিপাত, কথোপকথন ও হাসি সহজ করেছে। ফেতনার দার উন্মুক্ত করেছে ও অকল্যাণের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে। এগুলো চরিত্রের স্তর অধঃপতনে এবং পর্দা ও শালীনতার উপর আক্রমণে অবদান রেখেছে।

৪- গান-বাজনাঃ

যৌন প্রবৃত্তি প্রসারের আরেকটি মাধ্যম হল গান-বাজনা শ্রবণ। এটা মনের জন্য মদ স্বরূপ। মদ মাথার ভিতর প্রবেশ করলে যে ক্ষতি করে তার চেয়ে তা অধিক ক্ষতিকর।(৩) অনুরূপভাব এটি হৃদয়কে নষ্ট করে এবং এর

(১) আবূল আলা মাওদুদী, আল-হিজাব পৃষ্ঠা (৯৩)।
(২) সহীহ বুখারী (৩/২৯৫, হাঃ ৫২৩৩), শব্দগুলো বুখারী থেকে নেয়া, সহীহ মুসলিম (২/৯৭৮, হাঃ ৪২৪/১৩৪১)।
(৩) ইবনে তাইমিয়া, আল-ফাতাওয়া (১০/৪১৭)।

শ্রোতাকে যিনা ও সমকামিতার মত অশ্লীলতায় জড়িত হওয়াকে সুশোভিত করে। কেননা গান হল যিনার মন্ত্র এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।[১] আল্লাহর শপথ কত সম্ভ্রান্ত নারী গানের কারণে পতিতায় পরিণত হয়েছে এবং কত সম্ভ্রান্ত পুরুষ এর কারণে শিশু-কিশোরদের দাসে পরিণত হয়েছে।[২]

৫- দেরীতে বিবাহ করাঃ

যিনা ও সমকামিতার আরেকটি কারণ হল বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ এবং এমন সব কঠিন ও অপ্রয়োজনীয় শর্তারোপ করা যা বৈবাহিক জীবনের ক্ষেত্রে মূল্যহীন। যেমন নির্দিষ্ট চাকুরি, গুণাবলী ও সৌন্দর্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করা; যা বাস্তবায়ন করা কঠিন। ফলে সময় নষ্ট হয় এবং যুবক-যুবতীরা তাদের কাল্পনিক স্বপ্নের পিছনে ছুটতে থাকে, এমনকি যখন সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং অপ্রতিরোধ্য লালসার সামনে নিরাপত্তার বেষ্টনী খুলে যায় তখন উভয়ে হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয় ও সীমালঙ্ঘন ও ফাসাদের পথে পা বাড়ায়। তাইতো ইসলাম সম্পর্ক নির্বাচনের এমন মানদন্ড নির্ধারণ করেছে, যে সম্পর্কে নবী সাঃ বলেনঃ (যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। তা যদি না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসা'দ সৃষ্টি হবে। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তার মাঝে (কুফূ-এর দিক থেকে) কিছু ত্রুটি থাকে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। এই কথা তিনি তিনবার বললেন।)[৩]

তিনি আরো বলেনঃ (চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)[৪]

৬- স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের থেকে দূরে থাকাঃ

এর আরেকটি কারণ হল স্বামীর দূরে থাকা ও দুনিয়াবী বিষয়ের ব্যস্ততায় স্ত্রী বিমুখ হওয়া, অনুরূপভাবে স্ত্রীর স্বামী থেকে দূরে থাকা। ফলশ্রুতিতে তাদের একজন বা উভয়েই অপ্রাপ্তির ঘাটতি মিটাতে চায় উপস্থিত ব্যক্তির দ্বারা; যারা দুশ্চরিত্রবান, ব্যভিচারী এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত।

৭- অরাজক শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

যৌন অশ্লীলতার আরেকটি কারণ হল বিশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা যৌন চাহিদাকে শক্তিশালী করেছেন যা মানুষকে সে চাহিদাকে তৃপ্ত করতে ও ও তার দাবী পূরণ করতে উদ্বীপ্ত করে, যেন মানব বংশানুক্রম চলমান থাকে। কিন্তু মানুষের মাঝে এমন কত লোক রয়েছে, যখন তাদের যৌন চাহিদা প্রবল হয়, তখন লজ্জা ও শালীনতার পর্দাকে নষ্ট করে সে চাহিদা পূরণে হারাম পথে পা বাড়ায়; অস্থায়ী তৃপ্তির পিছনে ছুটে। কেউ তা

---

(১) পূর্বোক্ত (১০/৪১৭-৪১৮)।

(২) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়া, ইগাসাতুল লাহফান (১/২৬৫)।

(৩) তিরমিযি (৩/৩৯৫) হাঃ (১০৮৫)। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান গারিব বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেছেন হাসান সহীহ, সুনানে তিরমিযি হাদিস নং (৮৬৬-১০৯৭)।

(৪) বুখারী (৩/৩৬০) হাঃ (৫০৯০), মুসলিম (২/১০৮৬) হাদিস নং (৫৩/১৪৬৬)।

অন্বেষণ করে যিনার মাধ্যমে, আর যার বক্রতা আরো বেশি সে তা অন্বেষণ করে সমকামিতার মাধ্যমে। আর এটাই হল মানব মনে জাগ্রত সবচেয়ে মারাত্মক অনুভূতি।[১]

যদি ইসলামী শিক্ষা তাকে সংশোধন ও পরিমার্জন না করে তবে সে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাবে এবং সে চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যাবে; যে চারণভূমিতে ঘুরে বেড়ায় এবং কোন বাধা ও অন্তরায় ছাড়া সকল ধরণের গাছ হতে ও যেকোন স্থান হতে খায়। এরা ইসলামী শিক্ষার মহান নীতি দ্বারা সজ্জিত হয়নি। বরং তাদের মানহায ছিল যেমনটি সায়্যেদ কুতুব বলেছেন: নতুন পদ্ধতিতে, অনুভূতি শক্তিকে দমন করে এবং স্বাধীনতাকে চরম পর্যায়ে ব্যবহার করে যুবক যুবতীরা তাদের শারীরিক প্রবৃত্তির পিছনে দৌড়াচ্ছে এবং তারা মনে করছে না যে তারা এমন কোন অপরাধমূলক কর্ম করছে যার কারণে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে; না কোন ব্যক্তি বা সমাজ, বা দেশ কিংবা ধর্মের নিকট।[২]

মাওদুদী বলেন: নারী স্বাধীনতা এধরণের অবস্থার উপস্থিতিকে অপছন্দ করে না। পিতা-মাতা তাদের মেয়েদের পর্যাবেক্ষণ ও রক্ষাবেক্ষণে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, তারা তাদের এমন স্বাধীনতার সুযোগ করে দিয়েছেন যা ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে ছেলেদের জন্যও সহজ ছিল না।[৩]

বিকৃত যৌনাচারের বিপদ ও পরিণতি নিম্নরূপঃ

১- তা পাপ ও শাস্তি নিয়ে আসে, আল্লাহ তায়ালা যিনাকে শিরক ও হত্যার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨﴾ [এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আর আল্লাহ যে নফসকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর তারা ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।][৪]

যেহেতু যিনার ক্ষতি চরম এবং তা বংশ পরম্পরা রক্ষা, লজ্জাস্থানের হেফাযত ও পবিত্রতার সংরক্ষণের বিশ্বময় রীতির কল্যাণের বিপরীত তাই কবিরা গুনাহের ক্ষেত্রে তার স্থান হত্যার অপরাধের পরপরই।[৫]

অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হল তার প্রতি দয়া প্রদর্শন ও সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়াই বেত্রাঘাত করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢﴾

(১) আল-ইনসান বাইনাল মাদ্দিয়া ওয়াল ইসলাম, পৃঃ (২১০)।
(২) পূর্বোক্ত পৃঃ (২২৫)।
(৩) আবুল আলা মাওদুদী রচিত হিজাব, পৃঃ (১২৮)।
(৪) সূরা-আল ফুরকান: (৬৮)।
(৫) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়া, আদ-দা ও আদ-দাওয়া, পৃষ্ঠা (২৬৪)।

[ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।][১]

নবী সাঃ বলেছেনঃ (তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে ব্যভিচার করলে একশ বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর বিবাহিত বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলে একশত বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।)[২]

আর যদি বিবাহিত হয় বা যদি পূর্বে বিবাহ হয়ে থাকে তবে পুরুষ, নারী উভয় ব্যভিচারীর শাস্তি হল রজম তথা পাথর নিক্ষেপে হত্যা। নবী সাঃ গামেদী গোত্রের মহিলা ও মায়েজ রাঃ-কে রজম করেছিলেন।[৩] যদি ব্যভিচারী দাস হয় তবে তার উপরও শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। নবী সাঃ বলেছেনঃ (তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করলে এবং তার ব্যভিচার প্রমানিত হলে তাকে 'হদ' স্বরূপ বেত্রাঘাত করবে, কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা করবে না। এরপর যদি সে আবার ব্যভিচার করে তাকে 'হদ' হিসাবে বেত্রাঘাত করবে, কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা করবেনা। তারপর সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমানিত হয়, তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদিও তা চুলের রশির (তুচ্ছ মূল্যের) বিনিময়ে হয়।)[৪]

মহান আল্লাহ বলেনঃ [﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ٢٥﴾] [অতঃপর যখন তারা বিবাহিত হবে তখন যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি হবে।][৫]

আর সমকামিকে সমাজ থেকে নির্মূল করা হবে, কর্তা ও কৃত উভয়কেই। নবী সাঃ বলেছেনঃ (তোমরা কাউকে যদি লূত গোত্রের মতই কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো। আর যাকে কোন জন্তুর সাথে ব্যভিচার করতে দেখ তাকে এবং জন্তুটিকেও হত্যা করো।)[৬]

এদের শাস্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আগুন দিয়ে জালিয়ে দেয়া হবে। কারো মতে সর্বোচ্চ বিল্ডিং এর উপর থেকে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। আবার কারো মতে রজম তথা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে।[৭]

২- যিনার আরেকটি বিপদ হল তা দারিদ্রতাকে আবশ্যক করে, আয়ু সংকুচিত করে, ব্যভিচারীর চেহারাকে কালিমালিপ্ত করে, মানুষের মাঝে ঘৃণার সৃষ্টি করে, অন্তরকে মেরে না ফেললেও বিক্ষিপ্ত ও অসুস্থ করে, দুশ্চিন্তা,

---

(১) সূরা আন-নূর: (২)।
(২) সহীহ মুসলিম (৩/১৩১৬, হাঃ ১২/১৬৯০)।
(৩) পূর্বোক্ত (৩/১৩২১-১৩২২, হাঃ ২২/১৩৯৫)।
(৪) বুখারী (৪/২৬০, হাঃ ৬৮৩৯), মুসলিম (৩/১৩২৮ হাঃ ৩০/১৭০৩)।
(৫) সূরা আন-নিসা: (২৫)।
(৬) আবু দাউদ (৪/৬০৭-৬০৮, হাঃ ৪৪৬২), তিরমিযি (৪/৪৭ হাঃ ১৪৫৬), ইবনু মাজাহ (২/৮৫৯ হাঃ ২৫৬১)। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ জামে আস-সগীর (২/১১২১, নং ৬৫৮৯-২২৫৭), সহীহ তিরমিযি (১১৭৭-১৪৯৭)।
(৭) সুবুলুস সালাম (৪/১২৮৪-১২৮৫)।

কষ্ট ও ভীতির সঞ্চার করে। এজন্য তাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, খারাপ ও কঠিনভাবে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে।(১) তাই ইউরোপীয়দের সম্পর্কে মানুষ জেনেছে যে, তাদের কোন আত্মমর্যাদা নেই, এমনকি পিতা তার মেয়ের সাথে এবং ভাই তার বোনের সাথে ব্যভিচার করা কোন বিস্ময়ের বিষয় নয়।(২)

আপনি যদি মুসলিমদের আত্মমর্যাদার বিষয়ে চিন্তা করেন, যারা তাদের স্ত্রীদের অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে, তাহলে দেখতে পাবেন সেটা খুবই শক্তিশালী। সা'দ বিন উবাদা রাঃ বলেনঃ (যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অপর কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে আমার তরবারীর ধার দিয়ে তার উপর আঘাত হানব- পার্শ্ব দিয়ে নয়। একথা নবী সাঃ এর কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আশ্চর্য হয়েছে? আল্লাহর কসম! আমি তার চাইতে অধিকতর আত্নমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ আমার তুলনায় অধিকতর মর্যাদাবান। আল্লাহ তাঁর আত্নমর্যাদার কারণে প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অশ্লীল কর্ম হারাম করেছেন।)(৩)

৩- যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে যিনার প্রসার ঘটে তখন তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ, অসন্তোষ ও শাস্তি অবতীর্ণ হয়। নবী সাঃ বলেছেনঃ (যখন কোন জনপদে ব্যভিচার ও সূদ প্রকাশ লাভ করে, তখন তার বাসিন্দারা নিজেদের জন্য আল্লাহর আযাব বৈধ করে নেয়।)(৪)

৪- আর সমকামিতা এমন অশ্লীলতা যা মন অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিগত সহজাত স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়নি এমন বিশুদ্ধ স্বভাব তা থেকে পালায়ন করে। এটা এমন অশ্লীলতা সর্বপ্রথম যার প্রচলন করেছিল লূত সম্প্রদায়। মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ٨٠ ﴾ [আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "তোমরা কি এমন খারাপ কাজ করে যাচ্ছ যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি?](৫)

আর আল্লাহ তায়ালা লূত সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসেবে বর্ণনা করেছেনঃ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٨٤ ﴾ [আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল।](৬)

অনুরূপভাবে একাজে জড়িত ব্যক্তিদেরকে বর্ণনা করেছেন খারাপ ফাসেক সম্প্রদায় হিসেবে এবং তাদের এ কাজ নিকৃষ্ট কর্মের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ ٧٤ ﴾ [আর লুতকে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং

(১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়া, আদ-দা ও আদ-দাওয়া, পৃষ্ঠা (২৬৪)।
(২) তাওফীক মুহাম্মাদ ইজ্জুদ্দীন, দালিলুল আনফাস পৃষ্ঠা (৪১০)।
(৩) বুখারী (৪/৩৮৭, হাঃ ৭৪১৬), মুসলিম (২/১১৭৬, হাঃ ১৭/১৪৯৯)
(৪) মুস্তাদরাকে হাকেম (২/২৩৭), তিনি বলেছেন: সনদ সহীহ, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ জামে আস-সগীর (১/১৭৮, নং ৬৭৯)
(৫) সূরা আল-আরাফ: (৮০)।
(৬) সূরা আল-আরাফ: ৮৪।

তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ ফাসেক সম্প্রদায়।][১]

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা লূত সম্প্রদায়কে সর্ব নিকৃষ্ট ও মন্দ গুণ দ্বারা বর্ণনা করেছেন; কারণ এটি নিকৃষ্টতম চারিত্রিক অপরাধ ও মানুষের সহজাত স্বভাবের গন্ডির বাইরে।

৫- সমকামিতা সমকামীকে আল্লাহর ক্রোধ, অসন্তোষ ও শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংসকারী। লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মাঝে এ বিষয়ে নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ ۝٨٢ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ ۝٨٣﴾ [অতঃপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে উল্টে দিলাম, এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর। যা আপনার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর এটা যালিমদের থেকে দূরে নয়।][২]

সুতরাং শাস্তির ধরণটা ছিল খুবই কষ্টদায়ক, যেহেতু লূত সম্প্রদায়ের জনপদকে উপর নিচ করে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তাদের উপর ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এটি ছিল ধ্বংসের পূর্ণাঙ্গ রূপ যা সকল কিছুকে উল্টিয়ে দিয়েছিল, নিদর্শনসমূহ পরিবর্তিত করে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।[৩]

৬- জাতির সেনাশক্তির উপর বিকৃত যৌনাচারের ভয়াবহতম প্রভাব হচ্ছে, যদি সেনাবাহিনীর মাঝে এর প্রসার ঘটে তবে তা শরীরকে দূর্বল ও ক্ষীণ করে। এর দলীল হল ফ্রান্সের তিক্ত অভিজ্ঞতা; যেহেতু বিকৃত যৌনাচারের কারণে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর শারীরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছিল এবং দিন দিন তা ক্রমান্বয়ে দূর্বল হচ্ছিল । বিংশ শাতাব্দির শুরু থেকে ফ্রান্সের সেনা কর্মকর্তাগণ সেনাবাহিনীর শারীরিক সক্ষমতা ও সুস্থতার বিষয়ে ঢিলেমি করত। যার ফলে তাদের দেশ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শুরুর দুই বছরে সিফিলিস আক্রান্ত হওয়ার কারণে পঁচাত্তর হাজার সৈন্যকে কাজ থেকে অব্যহতি দিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল এবং একই সময়ে একটি মধ্যম আকৃতির সেনাছাউনীতে (২৪২) জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।[৪]

৭- বিকৃত যৌনাচারের শরীরের উপর আরেকটি বিপদের দিক হল, শরীরের বিভিন্ন রোগের প্রকাশ ও ব্যপ্তি লাভ। যেমন সিফিলিস রোগ, কেননা তা শরীরের সকল শিরা ও অঙ্গকে আক্রান্ত করে। তা এক ধরণের ব্যকটেরিয়া তৈরী করে যাকে (হেলিকয়েড) বলা হয়, যা যৌন সঙ্গমের মাধ্যম এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মাঝে সংক্রমিত হয়। এটি মারাত্মক ব্যাধি যদি তা হার্ট বা কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে। নারী পুরুষের মাঝে (গনোরিয়া) নামক আরেকটি রোগ রয়েছে যা পেশাবের সময় প্রচন্ড জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করে। কখনো এটি জয়েন্টগুলোতে প্রদাহের এবং নারী পুরুষের জয়েন্টের স্থায়ী অক্ষমতার সৃষ্টি করতে পারে।

(ইনগুইনাল গ্রানুলোমা) নামে আরেকটি রোগ রয়েছে যা সাধারণত যৌনাঙ্গের বহিরাংশ ও আশপাশ আক্রান্ত করে ও কঠিনভাবে জড়িযে যায়। এর চিকিৎসা না করা হলে চরম অক্ষমতা ও ওজন হ্রাস দেখা দেয় ফলে রোগী মৃত্যুর মুখে ঢোলে পড়ে।[৫]

---

(১) সূরা আন-আম্বিয়া: ৭৪।
(২) সূরা আল-হুদ: ৮২-৮৩।
(৩) সায়্যিদ কুতুব, ফি যিলালীল কুরআন (৪/১৯১৫)।
(৪) আবু আলা মাওদুদী, আল-হিজাব পৃষ্ঠা (১০১-১০২)।
(৫) আব্দুর রহমান ওয়াসেল, মুশকিলাতুশ শাবাব পৃষ্ঠা (১৪৮-১৫১)।

আধুনিক সময়ের আরেকটি রোগ যা ১৪০২ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১ ইং সনে প্রকাশ পেয়েছে তা হল প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা (এইডস) যা যিনা, সমকামিতা ও রক্ত প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে একজন থেকে অপরজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় সমকামীরা। এ রোগটি কতগুলো ভাইরাসের সমষ্টি যা রক্তের শ্বেত কণিকাকে ধ্বংস করে; ফলে শরীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন হয়ে পড়ে এবং তা বিভিন্ন অণুজীবের আক্রমণের পথ তৈরী করে যা নানাধরণের প্রদাহ ও ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ। আমেরিকায় প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১২ জন এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।[১]

যিনা, ব্যভিচার ও সমকামিতার রোগগুলোর মাঝে একটি কমন বৈশিষ্ট্য হল তা সংক্রামক রোগ যা যিনার মাধ্যমে বা কখনো যিনার পূর্বকর্মের মাধমে একজন থেকে অপরজনের মাঝে স্থানান্তরিত হয়। এগুলোর আরো বৈশিষ্ট্য হল তা নির্ণয় করা ও তার জীবাণু চিহ্নিত করা কঠিন।[২]

৮- ব্যভিচারী পুরুষের জন্য একমাত্র উপযুক্ত হচ্ছে ব্যভিচারী নারী। মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣﴾ [ব্যভিচারী পুরুষ-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী, তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না, আর মুমিনদের জন্য এটা হারাম করা হয়েছে।][৩]

যিনাকারী যদি তওবা না করে, তবে তার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে যিনাকারীণী বা মুশরিক নারী, কোন অবস্থায় তার জন্য সৎ মুমিন নারী উপযুক্ত নয়। তার পাপাচার ও উলঙ্গপনা জানার পরও কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য তার সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ব্যভিচারী নারীর জন্য ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই উপযুক্ত, তার জন্য সৎ, চরিত্রবান মুমিন উপযুক্ত নয়।

এই বিধান প্রযোজ্য সে সমস্ত ব্যভিচারী নারী পুরুষদের জন্য যারা তাদের অভ্যাস থেকে বিরত হয় না ও তওবা করে না। পক্ষান্তরে যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তাদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। কেননা তওবা ও সংশোধনের পরে তাদের মাঝে ব্যভিচারীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে না।[৪]

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী শিক্ষা কীভাবে পরিবার গঠনের সূচনা থেকেই এই আচরণগত বিচ্যুতিকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে, ব্যভিচারীদের সাথে চরিত্রবান পুরুষ ও নারীদের বিবাহ না দেয়ার মাধ্যমে; যা এই অপরাধের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এ থেকে বিরত, তওবা ও পবিত্র হওয়ার দ্বারা বিবাহের ক্ষেত্রে সে নারী-পুরুষ অন্যান্য মুসলিমদের মত হয়ে যাবে। এটি বিপর্যয় বিস্তার রোধে একটি সামাজিক চিকিৎসা এবং বাস্তবসম্মত মানসিক নিরাময়; যেন ব্যভিচারীরা অনুভব করে যে, তাদের নিকৃষ্ট কর্মের কারণে সমাজ তাদেরকে প্রত্যাখান করছে।

---

(১) তাওফীক মুহাম্মাদ ইজ্জুদ্দীন, দালিলুল আনফাস পৃষ্ঠা (৪০৮-৪০৯)।
(২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা (৪০৭)।
(৩) সূরা আন-নূর: ৩।
(৪) আবুল আলা মাওদুদী, তাফসীরে সূরা আন-নূর, পৃষ্ঠা (৮৯)।

পরিপালনগত প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনা

নিম্নে ব্যভিচারীর জন্য পরিপালনগত প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনা আলোচনা করা হল, ইসলাম এর জন্য নিম্নবর্ণিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেঃ

১- মুসলিম নারীদেরকে শালীনতা, মর্যাদা, পর্দা রক্ষা করা এবং সাজসজ্জা প্রকাশ ও অবাধ মেলামেলা পরিহারের উপর গড়ে তোলা। আর এটি দুইভাবে হয়ে থাকেঃ

ক- সাজসজ্জা প্রকাশ, অবাধ মেলামেশার হুকুম ও পর্দাহীনতা ক্ষতির বর্ণনা করা এবং মানুষের মাঝে তা প্রচার করা।

খ- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে শালীনতা রক্ষা ও অবাধ মেলামেশা পরিহারের উপর জাতিকে গড়ে তোলা; যার মাধ্যমে অন্তর মূর্খতা ও পাপাচারের মরণ থেকে জেগে উঠবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩﴾ [হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।][১]

২- কঠোরতা আরোপ, সরলতা না করা এবং নারীদের সাথে পোষাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ও কথাবার্তায় সাদৃশ্য না রাখার উপর যুব সমাজকে গড়ে তোলা; কেননা এগুলো তাদের মাঝে মেয়েলী ভাব তৈরী করে, যার ফলে তারা সমকামিতার ন্যায় বিচ্যুত যৌনাচারের দিকে যায়। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেনঃ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।)[২]

৩- মানুষকে দৃষ্টি অবনমনের শিক্ষা দেয়া ও তার উপর গড়ে তোলা এবং মানুষের জীবনে এর ফায়েদা ও উপকারিতা বর্ণনা করা। এই ফায়েদাগুলো হলঃ

ক- আত্মার প্রশান্তি ও আরামের জন্য ঈমানের স্বাদ ও মূল্য অনুধাবন করা। কেননা কেউ যদি আল্লাহর জন্য কোন কিছু পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ তাকে তার বিনিময়ে উত্তম কিছু দান করবেন। নবী সাঃ বলেছেনঃ (দৃষ্টি প্রদান হচ্ছে ইবলীসের তীরগুলোর একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তা পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার নিকট এমন এক ঈমান আনবেন যে, সে তার হৃদয়ে তার মধুরতা অনুভব করবে।)[৩]

খ- অন্তরের জ্যোতি ও সঠিক অন্তরদৃষ্টির সৃষ্টি, সে যেহেতু তার দৃষ্টির আলোকে হারাম থেকে বিরত রেখেছে তাই আল্লাহ তায়ালা তার দৃষ্টি ও অন্তররের আলোকে খুলে দিবেন। ফলে সে এমন কিছু দেখতে পাবে, যে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ করেনা এবং হারাম থেকে দৃষ্টিকে অবনমিত করেনা সে তা দেখতে পায়না। এই বিষয়টি মানুষ তার অন্তরে অনুভব করবে।

---

(১) সূরা আল- আহযাব: ৫৯।
(২) বুখারী (৪/৭১, হাঃ ৫৮৮৫)।
(৩) মুস্তাদরাকে হাকেম (৪/৩১৪), তিনি বলেছেন: হাদিসের সনদ সহীহ, যাহবী সহমত পোষণ করেছেন।

গ- অন্তরের শক্তি ও বীরত্ব, আল্লাহ তায়ালা তাকে বিজয়ের ক্ষমতা দান করবেন যেমনভাবে তাকে হুজ্জাতের ক্ষমতা দান করেছেন। ফলে তার মাঝে উভয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটবে।[১]

ঘ- দৃষ্টি অবনমনের মাঝে মানুষের পরিশুদ্ধি রয়েছে। কেননা দৃষ্টি হল অন্তরের অগ্রদূত যেমন জ্বর মৃত্যুর অগ্রদূত।[২] মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ ﴾ [মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।][৩]

৫- যৌন উদ্দীপক বস্তু হতে দূরে থাকা। যেমন ছবি দেখা, খারাপ বন্ধুদের সাথে বসা, যেনার মন্ত্র তথা গান-বাজনা শ্রবণ করা; যা অশ্লীল যৌন চাহিদা পূরণের জন্য শরীরের ক্যালরিকে উত্তপ্ত করে। যেহেতু তা সম্পর্ক তৈরী ও সহবাসে মনের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে গান শোনা হারামকে হালাল মনে করার শামিল। নবী সাঃ বলেছেনঃ (আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে যারা ব্যাভিচার, রেশমী কাপড় মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।)[৪]

৬- মদের ভয়াবহতা ও ক্ষতির বিষয়টি স্পষ্ট করা ও তা প্রচার করা। কেননা তা যৌন বিচ্যুতির একটি অনুঘটক। যেহেতু তা জ্ঞান ও অনুধাবন শক্তির বিলোপ ঘটায় ও এর কার্যকারীতা নষ্ট করে। ফলে এই মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশা ও মাদকের প্রভাবে তার ধারণা ও কল্পনায় যা আসে তাই করে।

৭- এ সকল বিকৃত যৌনাচারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ইসলামী বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা করা। যেমন ভীতি প্রদর্শন ও আশান্বিত করা। আমাদের জন্য কুরআনের আয়াত ও নবীর হাদীসসমূহে ঐ সমস্ত লোকদের উপর আত্মিক প্রভাবের বিষয়ে উদাহরণ রয়েছে। এতে রয়েছে উদাহরণ বর্ণনার পদ্ধতি যেমন লূত সম্প্রদায়[৫], এতে রয়েছে ঘটনা বর্ণনার পদ্ধতি যেমন ইউসুফ আঃ এর সচ্চরিত্রের ব্যাখ্যা যখন তাকে বাদশার স্ত্রী প্ররোচিত করেছিল[৬] এবং বশিঃকরণ আলোচনা যেমন নবী সাঃ এর আলোচনা ঐ ব্যক্তির সাথে যে তার নিকট যিনার অনুমতি চেয়েছিল।[৭]

৮- অবস্থা অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিষয়টি বাস্তবায়ন করা। যেমনটি রাসূল সাঃ ফাযল বিন আব্বাস রাঃ এর সাথে করেছিলেন। ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (একবার কুরবানীর দিনে রাসূল সাঃ ফাযল ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে আপন সওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। ফাযল একজন সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন। নবী সাঃ লোকেদের মাসআলা মাসায়িল বলে দেয়ার জন্য আসলেন। এ সময় খাশ'আম গোত্রের এক সুন্দরী নারী রাসূল সাঃ এর নিকট একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য আসল। তখন ফাযল তার দিকে তাকাতে লাগলেন। মহিলাটির সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করল। নবী সাঃ

(১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়া, ইগাসাতুল লাহফান (১/৫৯-৬১)।
(২) কুরতুবী, আল জামে লি আহকামিল কুরাআন (১২/১৫১)।
(৩) সূরা আন-নূর: ৩।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/১৩, হা: ৫৫৯০)।
(৫) দেখুন, সূরা আল-আনকাবূত (২৮-৩৫), সূরা আশ-শুআরা: (১৬০-১৭৫), সূরা হুদ: (৮০-৮৩)।
(৬) দেখুন, সূরা ইউসূফ (২৩-৩৪)।
(৭) মুসনাদে আহমাদ (৬/২৫৬-২৫৭), শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা (৩৭০)।

ফাযল এর দিকে ফিরে দেখলেন যে, ফাযল তার দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি নিজের হাত পেছনের দিকে নিয়ে ফাযল এর চিবুক ধরে ঐ নারীর দিকে না তাকানোর জন্য তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।)[১]

যে সমস্ত স্থানে দিকনির্দেশনা, নসিহত ও পথপ্রদর্শনের দাবি রাখে সে সকল স্থানে রাসূল সাঃ এর উদ্বুদ্ধ করণে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নের বিষয়টি স্পষ্ট। তাইতো তিনি ফাযল রাঃ কে সেই মহিলার দিকে তাকাতে ছেড়ে দেননি, বরং এমন শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে সে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, একজন অপরিচিত নারীর সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত; দৃষ্টির ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য। জারির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (আমি রাসূল সাঃ-কে হঠাৎ দৃষ্টিপাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ দিলেন।)[২] সুতরাং যদি কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, হারাম বিষয়ের প্রতি সে দীর্ঘ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বা বারবার দৃষ্টিপাত করছে, তবে তাকে তাৎক্ষনাত নিষেধ করা হবে যেন তার মাঝে লজ্জা ও সংযমের পোষাক প্রোথিত হয় এবং বুঝতে পারে যে, মানুষ তার প্রতি লক্ষ্য ও খেয়াল রাখছে এবং তার কর্মে ক্রোধান্বিত হচ্ছে।

৯-পুরুষ ও নারীদের সমকামিতার আরেকটি কারণ হল, একজন পুরুষের অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত, অনুরূপভাবে একজন নারীর অপর নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত। সুতরাং একজন ব্যক্তির উচিত যেন অপর কোন ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান না দেখে সে ব্যাপারে আগ্রহী থাকা। রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (কোন নারী যেন অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। একইভাবে কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়।)[৩]

উরুও লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা নবী সাঃ বলেছেন (রানও সতরের অন্তর্গত।)[৪] কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা মানুষের সামনে তাদের উরুর অধিকাংশ প্রকাশ করতে কোন ধরণের ইতস্তবোধ করেনা। বিশেষতঃ যারা বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলার সাথে জড়িত। কাজেই এই প্রজন্মকে ইসলামী নির্দেশনা উপর গোড়ে তোলা ও তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। যেন তাদের সংকল্প ও চরিত্র উন্নত হয় এবং খারাপ চরিত্র ও তার উপকরণ থেকে মুক্ত হয়।

১০- ব্যক্তি ও সমাজের উপর সমকামিতার ভয়াবহতা বর্ণনা করা, লূত আঃ এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করা কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন এবং সমকামিতার পাশ্চাত্য প্রচারণার ব্যাপারে সতর্ক থাকা। আর এর চিকিৎসা হবে দুই পদ্ধতিতেঃ

এক: ঘটার পূর্বে তার মূলধাতুকে নিয়ন্ত্রণ করা; দৃষ্টিকে অবনমিত করা ও আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করার মাধ্যমে। এর ফলে শয়তানের জন্য অন্তরে প্রবেশের পথ বন্ধ হবে। উপরন্তু সে তার অন্তরকে কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত রাখতে পারবে।

দুই: ঘটে যাওয়ার পর তাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা; এর থেকে দূরে রাখার বিষয়গুলোতে অন্তরকে ব্যস্ত রাখার মাধমে এবং এ ধরণের কাজে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অস্থির ভয় বা কঠিন ভালবাসার দ্বারা

(১) বুখারী (৪/১৩৫-১৩৬, হাঃ ৬২২৮)।
(২) সহীহ মুসলিম (৩/১৬৯৯, হাঃ ৪৫/২১৫৯)।
(৩) সুনানে ইবনে মাজাহ (১/২১৭ হাঃ (৬৬১), শাইখ আলবানী হাদিসটি সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ (৫৩৮-৬৬১)।
(৪) আবু দাউদ (৪/৩০৩ হাঃ ৪০১৪), তিরমিযি (৫/১০২ হাঃ ২৭৯৫), শব্দগলো তিরমিযির, আহমাদ (৩/৪৭৮-৪৭৯), শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহ সুনানে তিরমিযি (২২৪৫-২৯৫৯)।

প্রতিবন্ধকতা তৈরী করবে। কেননা কোন আত্মা অধিক প্রিয় বস্তু ব্যতীত বা কোন অধিক ক্ষতির আশঙ্কাজনক বস্তুর ভয় ব্যতীত তার পছন্দনীয় বস্তুকে ত্যাগ করে না। সাথেসাথে এই কাজ পরিত্যাগের ব্যাপারে সে ধৈর্যসহ দৃঢ় সংকল্প করবে।[১]

১১- নিরাময় ও প্রতিরক্ষার দ্বারা এই নিকৃষ্ট যৌনাচার প্রতিরোধে মিডিয়া, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভুমিকা প্রকাশ করা।

১২- চরিত্র গঠনে মিডিয়ার সঠিক কর্তব্য পালন; চরিত্র ধ্বংসকারী বিষয়ের প্রতি উস্কানি ও প্ররোচনা দান থেকে বিরত থেকে, বিশেষতঃ যে সব মিডিয়ায় সমাজ বিনষ্টকারী গান ও ছবি প্রচার করা হয়।

নেশা ও মাদকদ্রব্যসমূহ

ইসলামী চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন বিচ্যুত আচরণের অন্তর্গত হল মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করা; কেননা এগুলোর দ্বীন, সম্পদ, শরীর, আচরণ ও সমাজের উপর ভয়াবহ ক্ষতি ও পরিণতি রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার পূর্বে এগুলোর সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন:

নেশা ও মাদকদ্রব্য দ্বারা উদ্দেশ্য

আভিধানিক অর্থঃ

আরবী সুকর (السُكْر): বলতে এমন অবস্থা বুঝায় যা মানুষ ও তার বিবেকের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সময় শব্দটি ব্যবহার করা হয় মদ ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সুকর হল সুস্থতার বিপরীত।[২]

আল খামর (الخمر): কোন কিছুর নিকটবর্তী হওয়া ও তার সাথে মিশ্রিত হওয়া। ইবনুল আরাবী বলেন: (খামরকে খামর বলা হয় কারণ তাকে রেখে দেয়ার ফলে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে অর্থাৎ তার গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আরো বলা হয়েছে এর নাম করণের কারণ হল তা বিবেককে আচ্ছাদিত করে ফেলে।)[৩]

আল মুখাদ্দিরাত (المخدرات): পানীয় ও ওষুধের ক্ষেত্রে খাদির হল, এমন অবসাদ ও দুর্বলতা যা পানকারীর আপতিত হয়।[৪]

মদ (**الخمر**): যে সকল জিনিস বিবেককে ঢেকে দেয় তাকে খামর বলে। এর নাম করণের কারণ হল তা বিবেককে আচ্ছাদিত করে ফেলে।[৫]

---

(১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়া, আদ-দা ও আদ-দাওয়া, পৃষ্ঠা (৩০৬-৩১০)।
(২) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরাব (৪/৩৭২)।
(৩) পূর্বোক্ত (৪/২৫৫)।
(৪) পূর্বোক্ত (৪/২৩২)।
(৫) আশ-শাওকানী, নাইলুল আওতার (৭/১৩৯)।

আর তা হল (জুস বা নাবিয ইত্যাদি নেশা সৃষ্টিকারী সকল জিনিস)।[১]

তা হল যব, খেজুর, আঙ্গুর, আপেল ও কিছু প্রজাতির পেয়াজ ইত্যাদি উদ্ভিদে উপস্থিত নেশা জাতীয় পদার্থের প্রক্রিয়াজাত করার ফলে উৎপন্ন পদার্থ।[২]

সুকর (**السكر**): এমন স্বাদ বা আনন্দ উপভোগ করা যার ফলে বিবেক লোপ পায় ও সে কি বলছে তা অনুধাবন করতে পারেনা।[৩]

মাদকদ্রব্য (**المسكرات**): মদ জাতীয় সকল প্রকার জিনিস।[৪]

নেশাদ্রব্য (**المخدرات**): এমন সব পদর্থ যা জীবিত মানুষ গ্রহণ করার ফলে তার জীবনীশক্তির এক বা একাধিক কর্মতৎপরতা পরিবর্তন ঘটায়।[৫]

এ থেকে বুঝা যায় যে, নেশা ও মাদকদ্রব্য জাতীয় বিভিন্ন প্রকারগুলোর সম্পর্ক অত্যান্ত শক্তিশালী। যার মূল হল বিবেকের সঠিক অনুভূতির বিলোপ। সুতরাং সুকর হল মদ বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার ফলে বিবেক যে অবস্থায় পৌছে তা। যেমন বাইরের প্রভাবের ফলে উত্তেজনা, অস্বাভাবিক কাজকর্ম বা অবসাদ বা বিবেকের অনুপস্থিতি। আর খামর ও মুখাদ্দেরাত তা সংঘটিত করে।

নেশা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণের কারণসমূহঃ

কোন ব্যক্তি প্রভাবক ছাড়া কোন কাজ করেন না যা তাকে অনুপ্রাণিত করে এবং তাকে সেই কাজ সম্পাদনে উৎসাহিত করে, তা তার নিজের ইচ্ছায় হোক বা বাহ্যিক চাপের কারণে হোক, যেমন কেউ যদি তাকে জোর করে সেই কাজ সম্পাদন করতে বাধ্য করে। মানব জীবনের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর প্রভাবক হল: যা ব্যক্তির পরম ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত শক্তি; কারণ তা ব্যক্তিগত ও মানসিক প্রবণতার ফলাফলস্বরূপ যা তাকে বিচ্যুত করেছিল। আর যা তার ইচ্ছার বাইরে তা হল: মানুষকে কখনো কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়, যা প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই; যেহেতু তার ইচ্ছার কোন মূল্যায়ন নেই। মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যগুলোতে জড়িত হওয়ার প্রভাবকগুলো হল:

১- প্রবৃত্তির অনুসরণ ও প্রবৃত্তির সময়ে পরিণতির চিন্তা না করে তার সুখের অনুসন্ধান করা ব্যক্তিকে তার খোঁজ করতে, তার পিছনে পড়ে থাকতে ও সুখানুভূতির জন্য তা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সাধারণত এটা অল্প বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাদের দুর্বল বিবেক ও দূরদৃষ্টি না থাকার কারণে। বিবেকের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব থাকার কারণে তা প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে উৎসাহিত করে। এই দিকে ইঙ্গিত করে ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া বলেন: (সুকর বা নেশা দুইটি অর্থকে সংযুক্ত করে: সুখের উপস্থিতি আর বোধের অনুপস্থিতি। নেশাকারী কখনো উভয় বা এর যেকোন একটিকে উদ্দেশ্য করে থাকে। কেননা মনের

---

(১) আস-সনআনী, সুবুলুস সালাম (৪/১৩১১)।
(২) মাওকিফুল ইসলাম মিনাল খামর, পৃষ্ঠা (২৭)।
(৩) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়া, মাদারিজুস সালেকীন (৩/৩১৯)।
(৪) আল-ইসলাম ওয়া জরুরীয়াতুল হায়াত পৃ: (১১৯)।
(৫) সউদ বিন আব্দুল আজীজ আত- তুরকী, আল আওয়ামেল আল মুওয়াদ্দিয়া, মাজাল্লা জামেয়াতে ইমাম পৃ: (৪৩৭), মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ আলহেওয়ারীর মুখাদ্দেরাত মিনাল কালাক হতে সংগৃহীত। সংখ্যা রজব ১৪০৯ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং, কাতার, কিতাবুল উম্মাহ পৃ: (২৩), শাওয়াল ১৪০৭ হিজরী।

চাহিদা ও প্রবৃত্তি যা অর্জনে সে সুখ পায়। আর এ সকল উপভোগে যে স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি রয়েছে তার জ্ঞান এসব গ্রহণে তাকে বাধা দেয়। বিবেক তাকে তা বাস্তবায়নে নিষেধ করে। কাজেই যখন প্রার্থক্যকারী জ্ঞান ও আদেশ- নিষেধকারী বিবেক লোপ পায়, তখন মন প্রবৃত্তির মাঝে ডুব দেয় এবং প্রশস্ত ময়দান পেয়ে যায়।)[১]

২- নেশা ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতির ব্যাপারে দূরদৃষ্টির অভাব। অদূরদর্শী ব্যক্তিদের শিকার ও হত্যা করতে এ সকল বিষ আমদানি ও পাচার করার মধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যব্যস্থা ধ্বংস করার লক্ষ্যে উপনিবেশকরা যা করছে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা-ই এসব গ্রহণে ও প্রচলনে তাদেরকে উৎসাহিত করছে।[২] এমনকি যখন তারা দুর্বল হয়ে যাবে ও নতিস্বীকার করবে তখন তাদের অর্থনীতিতে আগ্রহী হয়ে তাদের নিকট উপনিবেশ হিসেবে আসবে।

৩- প্রচলিত ভুল ধারণা যে, এ সকল মাদক যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে। কাজেই যাদের এ সমস্যা আছে তারা মাদকের অনুসন্ধান করে। যদিও বাস্তব চিকিৎসা বিজ্ঞান এর বিপরীত প্রমাণ করেছে। আরো প্রমাণ করেছে যে, মাদক যৌন শক্তিকে দূর্বল করে, শক্রাণু ধ্বংস করে এবং বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধির আগমন ঘটায়।[৩]

৪- আর্থিক উন্নতি, যার ফলে তার নিকট অতিরিক্ত অর্থের উপস্থিতি।

৫- পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভ্রমণ অভ্যাসের বিস্তৃতি।

৬- বিশাল সংখ্যক বিদেশী শ্রমিক আনয়ন।[৪] যা খারাপ অভ্যাস ও চিন্তা প্রসার এবং নেশা ও মাদক প্রচলনে ভুমিকা রেখেছে; তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা মাধ্যমে বা তাদের দেশে এসব বস্তুর প্রাপ্তির স্থানের আলোচনায় বা এ গুলো পাচারের মাধ্যমে।

নেশা ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতি

নেশা ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক ও অসংখ্য ক্ষতি রয়েছে যা একটি স্বতন্ত্র গবেষণাপত্র ছাড়া আলোচনা প্রায় অসম্ভব। কেননা তা ধর্ম, অর্থ, বিবেক, ব্যক্তি সত্ত্বার ক্ষতি করে এবং সমাজ ও নিরাপত্তার হুমকি বৃদ্ধি করে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল:

১- তা চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়। কেননা মাদকের নেশা মাতালের রগে রগে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে তার চরিত্র খারাপ হয় এবং সে নিজের ও অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করে। কখনো কখনো শক্রপক্ষের গোয়েন্দাবাহিনী ভয়ংকর তথ্য উৎঘাটনের জন্য মদ ব্যবহার করে থাকে।

২- তা মানসিক ও শারীরিক বিকাশ রোধ করে। আর এগুলো চরিত্রের গুরত্বপূর্ণ মানদন্ড ও অংশ; কেননা বিবেক না থাকলে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি না থাকায় স্বাভাবতই চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।

(১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়া, মাদারিজুস সালেকীন (৩/৩২০)।
(২) আল-মুসকেরাত আদরারুহা ওয়া আহাকমুহা, পৃঃ (২২৮)।
(৩) পূর্বোক্ত।
(৪) সউদ বিন আব্দুল আজীজ আত- তুরকী, আল আওয়ামেল আল মুওয়াদ্দিয়া, মাজাল্লা জামেয়াতে ইমাম পৃ: (৪২২-৪২৩), সংখ্যা রজব ১৪০৯ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং।

৩- তা মাদকাসক্তকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সম্মুখীন করে এবং তার স্বাস্থ্য ও শারীরিক সিস্টেম নষ্ট করে দেয়।

৪- মাদকাসক্তকে চতুষ্পদ জন্তুতে রুপান্তরিত করে।

৫- তা মাদকাসক্তকে আল্লাহর যিকির ও সালাত থেকে বিরত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ ﴾ [শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না।][১]

সুতরাং নেশা ও মাদকদ্রব্য মানুষকে কুরআন তেলাওয়াত, ইলমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া এবং সৎ ব্যক্তিদের সহচার্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে। কেননা বিপরীত মেজাজ ও মতামতের জন্য সে এগুলো থেকে পলায়ন করে।

৬- এগুলো তার মাঝে বিবেকবোধ, উত্তম চরিত্র ও সহজাত স্বভারের বিপরীতে নির্বুদ্ধিতা, বোকামি ও রাগ নিয়ে আসবে। কাজেই সে শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল কথা শুনবে ও অস্বাভাবিক নড়াচড়া করবে। কেননা তার বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তার আত্মা খাম-খেয়ালির অধীন হয়ে গেছে। তাইতো তার বিবেচনাহীন ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ফলস্বরূপ কাউকে হত্যা করে বা নিজে নিহত হয় কিংবা কারো উপর যুলুম করে বা নিজে যুলুমের শিকার হয়।[২]

এ ধরণের আত্মিক ও আচরণগত অধঃপতনের ক্ষেত্রে যারা বেশি পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ গ্রহণ করে সকলেই সমান। মনোপলি, আলজেরিয়া ও লিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, অতি অল্প পরিমাণ মাদকও মানসিক ভারসম্যের পরিবর্তন করতে সক্ষম।[3] আর ইসলাম মদকে হারাম করেছে, তা অল্প পরিমাণ হোক বা বেশি পরিমাণ হোক। নবী সাঃ বলেছেন: (যে বস্তর বেশী পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার অল্প পরিমাণও হারাম।)[4]

৭- পশু-পাখিও তামাক গাছের নিকটে যায় না কারণ তারা স্বভাবগতভাবে এর ক্ষতি সম্পর্কে জানে।[৫] কাজেই যেখানে প্রাণিরা তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে এর ক্ষতি সম্পর্কে জানে, সেখানে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের কি হল যে, এর অনুসন্ধান করে, এটা উপভোগ করে এবং এর কারণে দ্বীন ও সম্পদ নষ্ট করে? তাহলে প্রাণীরাই কি এদের চাইতে অধিক জ্ঞানী? অপশিক্ষার দরুণ এসমস্ত মাদকাসক্ত ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে সহজাত স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে পরিবার ও সমাজের উপর তার প্রভাবের মাঝেই এর জবাব নিহিত।

৮- নারীদের ডিম্বাণু ও পুরুষদের শুক্রাণুর ক্ষতির মাধ্যমে যৌন দূর্বলতার সৃষ্টি করে। একজন গবেষক বলেছেন যে, নেশাগ্রস্তদের বিশ্লেষণের সময় ৮৬% ব্যক্তিদের মাঝে শুক্রাণুর উপস্থিতি দেখা যায়নি।[৬]

---

(১) সূরা আল-মায়েদাঃ (৯১)।
(২) রসায়েলুল ইসলাহ (২/২৩-২৫)।
(৩) দালিলুল আনফাস বাইনাল কুরআনুল কারীম ওয়াল ইলমুল হাদিস পৃঃ (৪১২)।
(৪) সুনানে আবু দাউদ (৪/৮৭, হাঃ ৩৬৮১), সুনানে তিরমিযি (৪/২৮৫, হাঃ ১৮৬৫), আহমাদ (২/৯১), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।
(৫) আত-তাওজীহাতুল ইসলামিয়া লি ইসলাহেল ফারদ ওয়াল মুজতামা, পৃঃ (৪০০)
(৬) মাওকিফুল ইসলাম মিনাল খামর পৃঃ (২৫)।

ধুমপান ও অ্যানিউরিসিমা রোগের মাঝে সরাসরি সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। এটি রক্তের ধমনীকে আক্রান্ত করে এবং অ্যানিউরিজমের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে বর্তমান বিশ্বে নিরাময়যোগ্য ক্যান্সারের সৃষ্টি করতে পারে।(১)

মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক রোগ যা মদ পানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদেরকে আক্রান্ত করে ফলে তাদের মাঝে চরম শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এটি একটি বিপদজনক সমাজিক ব্যাধি যা সমাজের সন্তানদেরকে ধ্বংস করে, ফলে তাদের শরীর ধ্বংস, জ্ঞান লোপ পায় ও চারিত্রিক মূল্যবোধ নষ্ট হয় এবং তাদেরকে সমাজের ক্ষতিকর উপাদানে পরিণত করে।(২)

৯- এটি মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে, ফলে অতি সাধারণ বিষয়ে তার মাঝে হতাশা, নিরাশ, অস্থিরতা ও ভয়ের অনুভূতি জাগে। যার ফলে তার চারিত্রিক মূল্যবোধ নষ্ট হয় এমনকি পাগলামির দিকে নিয়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে পাগলদের ৫০% মদ্যপায়ী।(৩)

১০- এটি বিবেকের কেন্দ্রবিন্দু মগজের ব্যাপক ক্ষতি করে। ফলশ্রুতিতে মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে অপরাধের দিকে ধাবিত হয়। গবেষণার মাধমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাদকাসক্ত যুবকেরা কোন ধরণের যাচাই-বাছাই ছাড়াই অপরাধ সংঘটিত করে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সে ৬৬% অপরাধীরা মদ্যপায়ী, ৮২% সহিংসতার অপরাধে জড়িত এবং ৫২% সরকারী কর্মচারীদের উপর আক্রমণের অপরাধে জড়িত।(৪) নিঃসন্দেহে হত্যা ও সহিংসতা এমন অপরাধ ইসলামী শিক্ষা যা অপছন্দ করে এবং বিভিন্ন উপায়ে তা নির্মূলে ভূমিকা রাখে, যেমন:

ক- ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরী।

খ- এর থেকে বিরত রাখতে নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা করা।

গ- ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধমে নসিহত ও দিকনির্দেশনা প্রদান, অনুপ্রাণিত ও ভীতি প্রদর্শন করা।

১১- মাদকাসক্ত ব্যক্তি একটি হারাম পাপে জড়িত হয়ে পড়েছে। নবী সাঃ বলেছেন: (যা নেশা সৃষ্টি করে তাই মদ। আর যা নেশা সৃষ্টি করে তাই হারাম। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করবে এবং (অভ্যস্ত রূপে) সর্বদা এ কাজ করে তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করবে, সে পরকালে তা (জান্নাতের পানীয়) পান করতে পারবে না।)(৫)

১২- মদপানকারী নিজের জন্য শরয়ী হদের সম্মুখীন হওয়াকে আবশ্যক করে নেয়। আনাস বিন মালেক রাঃ হতে বর্ণিত, (নবী সাঃ এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল। সে মদ পান করেছিল। তখন তিনি তাকে দুইট খেজুর ডাল দিয়ে প্রায় চল্লিশ ঘা মারেন। পরবর্তীতে আবু বকর রাঃ তা পালন করেন। অতঃপর যখন উমর রাঃ

(১) আছারুল মুখাদ্দেরাত ওয়াল মুসকেরাত ওয়াত তাদখীন ফিস সিহহা ওয়াদ দ্বীন পৃঃ (৯২)।
(২) মাওকিফুল ইসলাম মিনাল খামর পৃঃ (৩৪)।
(৩) পূর্বোক্ত পৃঃ (৩৫-৩৬)।
(৪) আল-আওয়ামেল আল-মুয়াদ্দিয়া ইলা তায়তিল মুখাদ্দিরাত, পৃঃ (৪২৭)।
(৫) সহীহ মুসলিম (৩/১৫৮৭, হাঃ ৭৩/২০০৩)।

খলীফা হলেন তখন তিনি এ বিষয়ে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। আবদুর রহমান বিন আওফ রাঃ বললেন, সর্বনিম্ন হদ হল আশি ঘা দুররা মারা। তখন উমর রাঃ এ সংখ্যক হদ কার্যকরী করেন।)[১]

১৩- মদপানকারী নিজেকে আখেরাতে আল্লাহর শাস্তির মখোমুখী করে। যেমনটি সহীহ হাদিসে এসেছে নবী সাঃ বলেছেন: (নেশা উদ্রেক করে এমন সবই নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, যে লোক নেশাযুক্ত জিনিস পান করবে তাকে তিনি “তীনাতুল খাবাল” পান করিয়ে ছাড়বেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তীনাতুল খাবাল কি? তিনি বললেন, জাহান্নামবাসীদের ঘাম বা জাহান্নামবাসীদের মলমূত্র।)[২]

১৪- দুনিয়ায় মদ পানকারী নিজেকে আখেরাতের পানীয় থেকে বঞ্চিত করে। এমর্মে নবী সাঃ বলেছেন: (…যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করবে এবং (অভ্যস্ত রূপে) সর্বদা এ কাজ করে তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করবে, সে পরকালে তা (জান্নাতের পানীয়) পান করতে পারবে না।)[৩]

পরিপালনগত প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনাঃ

মদ ও মাদকে আসক্তির বিচ্যুতির জন্য উল্লেখযোগ্য পরিপালনগত প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনাগুলো হল:

১- নেশা ও মাদক গ্রহণ, বিক্রয় ও প্রচলনের বিষয়ে ইসলামী হুকুম প্রচার করা; সাথে এই মহামারী থেকে সতর্ককারী কুরআনের আয়াতসমূহ ও নবীর হাদিসসমূহ উল্লেখ করা। কেননা এগুলোতে রয়েছে মাদক থেকে নিষেধকারী ও সকর্তকারী শিক্ষা এবং মানুষের মাঝে আল্লাহ ভীতি ও তাঁর চরম শাস্তির ভীতি তৈরী করা। যা আত্মাকে কষ্ট দেয় ও কলঙ্কিত করে তার সকল কিছু থেকে দূরে থাকা।

২- যারা মাদক গ্রহণ করে বা তা প্রচলন করে তাদের প্রতি কঠোর সামাজিক সমালোচনা প্রকাশ করা, তাদের বিরত রাখা, নসিহত করা ও দিকনির্দেশনা দেয়া।

৩- এর স্বাস্থ্যগত ক্ষতি এবং অন্ত্র, বংশ পরম্পরা রক্ষা ও মস্তিষ্কের ক্ষতি প্রকাশ করা। অনুরূপভাবে অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সমাজের উপর এর ক্ষতি প্রকাশ করা।

৪- যারা জীবনের সমস্যা, দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে দূরে থাকতে এসব গ্রহণ করে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা এবং হাদিসে বর্ণিত বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া। নবী সাঃ বলেছেন: (কোন বান্দা বিপদ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এই দোয়া পড়ে: [**اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي**] [হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দা ও এক বান্দির

(১) সহীহ বুখারী (৪/২৪৬, হাঃ ৬৭৭৯), সহীহ মুসলিম (৩/১৩৩০, হাঃ ৩৫/১৭০৬)।
(২) সহীহ মুসলিম (৩/১৫৮৭, হাঃ ৭২/২০০২)।
(৩) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্তান, আপনার হাতে আমার মালিকানা, আমার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই অবধারিত, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালাই সঠিক, যে সমস্ত নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন বা আপনার কিতাবে আপনার যেসব নাম অবতীর্ণ করেছেন বা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন, অথবা আপনার নিকটই ইলমে গাইবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেসব নামের উসিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আপনি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত এবং অন্তরের নূর বানিয়ে দিন এবং এটাকে আমার বিষন্নতা দূরকারী ও দুশ্চিন্তা মুক্তকারী বানিয়ে দিন] তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তার দুশ্চিন্তাকে আনন্দে পরিবর্তন করে দিবেন।)[১]

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ সকল দোয়া জানেনা; মানুষের মাঝে এগুলো স্বল্প প্রচারের কারণে। মানুষের লক্ষ্য ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন অসংখ্য সমস্যা ও বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার কারণে প্রত্যেক মানুষই চিন্তাগ্রস্ত হয়। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর নিকট সাওয়াবের প্রত্যাশা করে, আবার কেউ কেউ ধৈর্যধারণ ও সাওয়াব প্রত্যাশার সাথেসাথে তা দূর করার জন্য শরয়ী পন্থায় চেষ্টা করে আর অল্প সংখ্যক মানুষ ভুল চিকিৎসার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির চেষ্টা করে। এটি কিছু সময়ের জন্য বিবেককে নিষ্ক্রিয় করা যেন সে এই বিষয় ও দুঃখগুলো ভুলে থাকতে পারে। পরবর্তীতে যা তার কাছে পুনরায় ফিরে আসে।

৫- যে সমস্ত লোকেরা তাদের মেহমানদেরকে (বিড়ি-সিগারেট ও সিসা) দিয়ে মেহমানদারী করে এবং মনে করে যে, এটা তাদের বদন্যতার প্রমাণ তাদেরকে দিকনির্দেশনা ও নসিহত করা। তারা বুঝতে পারে না যে, তারা পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে ও ভয়াবহতা ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং শরীরকে প্রজ্জলনকারী ও ধ্বংসকারী আগুন জালাচ্ছে। অথচ তাদের সাধ্য ছিল তা নির্বাপন করার; এগুলো না উপস্থাপন করে এবং উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে।

৬- ইসলামী দেশসমূহ মদ ও সিগারেট তৈরী ও আমাদানি নিষিদ্ধ করবে এবং মানুষের মাঝে এগুলোর প্রচার প্রসারে যারা মূল ভুমিকা পালনকারী তথা পাচারকারী ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭- মসজিদ, মিডিয়া, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধরণ শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিষ নির্মূলে সঠিক বক্তব্য ও লেখনির মাধ্যমে তাদের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করবে। কেননা অন্তরে এর প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

(১) মুসনাদে আহমাদ (১/৪৫২)।

সৌন্দর্য প্রদর্শন

সৌন্দর্য প্রদর্শনের অর্থঃ

সৌন্দর্য প্রদর্শনের অর্থ হল পুরুষের সামনে নারীদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা। আরবীতে (تبرجت المرأة) বলা হয় যখন নারী তার চেহারা ও গ্রীবাদেশের সৌন্দর্য প্রকাশ করে।[১]

সৌন্দর্য প্রদর্শন তার সকল সুরতে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও চরিত্র নষ্টের প্রশস্ত দ্বার। হোক তা স্বর মোটা ও সুন্দর করার মাধ্যমে, কিংবা গ্রীবার কোন অংশ প্রকাশ পায় এমন পাতলা ও ছোট পোষাক পরার মাধ্যমে অথবা আকর্ষণীয় অঙ্গ-ভঙ্গিতে চলার মাধ্যমে। কাজেই এটা কঠিন রোগ ও চরম অনিষ্ট।

ইসলামী শিক্ষায় এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা ও স্বভাবের সাথে উপযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও সঠিক পথ নির্দেশ রয়েছে; ধমক, ভর্ৎসনা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে।

সৌন্দর্য প্রদর্শনের কারণসমূহঃ

নিম্নে সৌন্দর্য প্রদর্শনের পিছনের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো আলোচনা করা হল:

১- পরিবার ও সমাজের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ভাঙ্গনের ফলে, দ্বীনি শিক্ষার দূর্বলতা, ভঙ্গুরতা ও শক্তিহীন হওয়া।

২- নিজের সৌন্দর্য অন্য মানুষকে দেখানো জন্য সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশের আগ্রহ। বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাদের চুল খোলামেলা রাখা, পাতলা, টাইট ও ছোট পোষাক পরিধানের মাধ্যমে; তারা যা গোপন রাখা দরকার ছিল তা মানুষকে দেখিয়ে বেড়ায়।

৩- সৌন্দর্য প্রদর্শনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল নারী পুরুষের কথা বলার স্বাদ আস্বাদনের মাধ্যমে অন্তরের খিয়ানত। তাইতো খিয়ানতকারী অন্তর তার স্বরকে আকর্ষণীয়, ভাষাকে মধুর ও কথা বলাকে মিষ্ট করে দেয়। কুরআন এ থেকে নিষেধ করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ ﴾ [হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।][২]

ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: এটা এমন শিষ্টাচার যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা নবী পত্নীদেরকে আদেশ করেছেন। আর এক্ষেত্রে উম্মতের বাকী নারীগণ তাদেরই অনুগামী।[৩]

(১) লিসানুল আরাব (২/২১২০)।
(২) সূরা আল-আহযাবঃ (৩২)।
(৩) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৪৯০)।

৪- অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে অনুকরণ হল সাজসজ্জা প্রকাশের অন্যতম অনুঘটক। বিশেষ করে সেই অনুকরণের ক্ষেত্রে যদি পরাজয়ের অনুভূতি থাকে যেই দল বা সমাজের অনুকরণ করছে তাদের সামনে। কেননা পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ী ব্যক্তির প্রতীক, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যয় এবং তার সকল অবস্থা ও রীতিনীতির অনুকরণ করতে আগ্রহী থাকে।[১] যদি এটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয় তবুও যাদের নৈতিকতা নেই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫- সমালোচনার অভাব: যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষের মাঝে অন্ধ অনুকরণ ছড়িয়ে পড়ে তখন সামাজিক সমালোচনা কমে যায়। সুতরাং নারীরা সাজসজ্জা প্রকাশকে কোন খারাপ কিছু মনে করে না। কেননা সমালোচনার ভাষা অনুকরণের পায়ের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। অথচ ইসলাম আমাদেরকে নসীহত করার নির্দেশ দেয়। নবী সাঃ বলেছেন: (দীন হলো নসীহত। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কোন ব্যক্তিদের জন্য? জবাবে নবী সাঃ বলেনঃ আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকের জন্য এবং সমস্ত মুসলিমের জন্য।)[২] আর ইসলামী মানহাজ নসীহত ও পরিবর্তনের মূলনীতি বর্ণনা করেছে। তা হল:

হাতের দ্বারা বল প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তন, যদি এর ক্ষমতা না থাকে তবে জিহ্বা দ্বারা আর সর্বনিম্নস্তর হল অন্তর দ্বারা ঘৃণা করা। এ মর্মে নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর।)[৩]

সাজসজ্জা প্রকাশের বিপদসমূহঃ

নিচে সাজসজ্জা প্রদর্শনের বিপদসমূহ আলোচনা করা হল:

১- নারীর সংকীর্ণ ও পাতলা পোষাক পরিধান করা, তার আকর্ষণীয় স্বর, উন্মুক্ত শরীর ও তার ব্যবহৃত সাজসজ্জা ও সুগন্ধির কারণে ফেতনা ফ্যাসাদের প্রসার ঘটে। তাইতো ইসলাম নারীর ফেতনা থেকে সতর্ক করেছে, নবী সাঃ বলেন: (আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিক ক্ষতিকর কোন ফেতনা রেখে যাচ্ছি না।)[৪]

২- নিশ্চয় নারীদের সাজসজ্জা প্রকাশ আল্লাহর আদেশের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। আল্লাহর আদেশের দাবী হচ্ছে নারীরা অসুস্থ হৃদয়ের মানুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য নরম ও সুন্দর স্বরে কথা বলবে না, তারা তাদের গৃহেই অবস্থান করবে এবং সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয়ে পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣﴾ [হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো

(১) আল-মুকাদ্দিমা লি ইবনে খালদুন, পৃঃ (১৪৭)।
(২) সহীহ মুসলিম (১/৭৪, হাঃ ৯৫/৫৫)।
(৩) সহীহ মুসলিম (১/৬৯, হাঃ ৭৮-৪৯)।
(৪) সহীহ বুখারী (৩/৩৬১, হাঃ ৫০৯৬), সহীহ মুসলিম (হাঃ ৯৭-৭৪০)।

না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।][১]

৩- সাজসজ্জা প্রকাশ অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ার অন্যমত মাধ্যম। নারী সৌন্দর্য ও তার আকর্ষণীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করে, আর পুরুষ এতে আকৃষ্ট ও আকর্ষিত হয়; বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন লোকেরা বিভিন্ন ধরণের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় মাধ্যম প্রস্তুতে ব্যস্ত, যেমন পাতলা পোষাক, আলংকারিক পোষাক ও সীমাহীন পর্দাহীনতা। ফলে এখানে ফেতনা ব্যাপকতা লাভ করে, প্রবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে এবং লালসা ব্যাপৃত হয়েছে।[২]

আর নিঃসন্দেহে সাজসজ্জা প্রকাশ ও তাতে বিদ্যমান উত্তেজনা অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে পরিচালিত করছে; যা থেকে ইসলাম মানব সমাজকে পবিত্র করতে চায়। তাইতো ইসলাম নারীদেরকে সুগন্ধি ব্যবহার করে পুরুষদের মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে নিষেধ করেছে যেন প্রবৃত্তির চাহিদা ছড়িয়ে না পড়ে। এ মর্মে নবী সাঃ বলেছেন: (প্রতিটি চোখ ব্যভিচারী। কোন মহিলা যদি আতর লাগিয়ে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে যায় তবে সে হল এমন এমন অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।)[৩]

অনুরূপভাবে ইসলাম নারীদেরকে চলার সময় সজোরে পদক্ষেপ ফেলতে নিষেধ করেছে যেন তাদের সৌন্দর্য যেমন গয়নার শব্দ বা কাপড়ের কারুকার্য প্রকাশ না পায়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ٣١﴾ [তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে।][৪]

৪- সাজসজ্জা প্রকাশ নবী সাঃ এর পূর্ব সময়ের জাহেলী যুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ইসলাম বিরোধী প্রতিটি সমাজের এটি বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের অবস্থার চেয়েও কুৎসিত; পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত ছবি ও শব্দের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও মন্দের দিকে আহ্বানের পথ ও পদ্ধতির কারণে। তারা যে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে তা মুসলিম নারীদের মধ্যে হতে অন্ধ অনুকরণের দ্বারা সাজসজ্জা প্রকাশকারিণীদের নারীদের উপর প্রভাব ফেলছে। মহান আল্লাহ বলেন: [وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ] [তোমরা প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।][৫]

পরিপালনগত প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনা

পরিপালনগত প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) সূরা আল-আহযাবঃ (৩২-৩৩)।
(২) ফি জিলালীল কুরআন (৫/২৮৫৯)।
(৩) সুনানে তিরমিযি (৫/৯৮-৯৯, হাঃ ২৭৮৬), সুনানে নাসায়ী (৮/১৫৩, হাঃ ৫১২৬), ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
(৪) সূরা আন-নূর (৩১)।
(৫) সূরা আল-আহযাবঃ (৩৩)।

১- সাজসজ্জা প্রকাশ ও পর্দাহীনতার হুকুম বর্ণনা করা, ফাসেক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হতে নারীকে হেফাযতের হিকমত প্রকাশ করা এবং সমাজে মুরুব্বী, মা ও গৃহ শিক্ষিকা হিসেবে তার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা।

২- মহিলা সাহাবীদের পর্দা, শালীনতা ও সংযম পালনের দিক এবং কোন ধরণের অবহেলা ও শিথিলতা ছাড়াই তাদের ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের দিক প্রকাশ করা। আশা করা যায় এটি তাদের নিকট পর্দা ও শালীনতার ক্ষেত্রে নারী সাহাবীদের অনুসরণকে প্রিয় করে তুলবে।

৩- সাজসজ্জা প্রকাশের খারাপ দিকগুলো বর্ণনা করা, তা যে বিপর্যয় ও অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় তা প্রকাশ করা এবং এর কারণে পাশ্চাত্য নারীরা যে অবস্থায় পৌছেছে তা উল্লেখ করা; যার ফলে নারীরা পণ্যে পরিণত হয়েছে, সুস্থ অবস্থায় তার স্বাদ গ্রহণের জন্য ক্রয় করা হয় আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয় যেন কোন সামাজিক সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ তাকে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলস্বরূপ প্রশান্তিময় বৈবাহিক জীবন নষ্ট হয়ে গেছে এবং সন্তানদের লালনপালন ও পরিচর্যার প্রাণশক্তি মৃত্যুবরণ করেছে। নারী স্বাধীনতার আহ্বানকারীদের তা জানা উচিত, হয়ত তারা তাদের মত্ততা থেকে সম্বিত ফিরে পাবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসবে।

৪- সমাজকে দিকনির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে মসজিদ, পরিবার, মিডিয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রকাশ করা। তাদের অন্তরে লজ্জাশীলতা ও সংযমশীলতার বিজ বপন করা, বিশেষ করে প্রচার মাধ্যমগুলোতে, কেননা ভাল-মন্দ প্রচারে এগুলোর ব্যাপক ভুমিকা রয়েছে। এগুলোর যন্ত্রপাতি, নানাবিধ মাধ্যম এবং সারা পৃথিবীব্যাপী তা বিস্তৃত হওয়ার গুরুত্বের কারণে।

৫- সাজসজ্জা প্রকাশ ও অবাধ মেলামেশা বন্ধে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ। যেন তা সৎচরিত্র ও শালীনতা প্রচারে তাদের জন্য উৎসাহ প্রদানকারী হয়।

৬- মানুষ ধর্মীয় নির্দেশনা পালনে সম্মানবোধ করবে, দ্বীনি চরিত্র গ্রহণ করবে এবং এর আদেশসমূহ মেনে চলবে।

কৃপণতা

কৃপণতার অর্থঃ

আভিধানিক অর্থঃ

আরবী বুখল বা বাখল শব্দের অর্থ হল, দানশীলতার বিপরীত। বাখলা বলা যে জিনিস আপানাকে কৃপণতায় উদ্বুদ্ধ করে তাকে।

পারিভাষিক অর্থঃ

পরিভাষায় বুখল বলা হয়, দান হতে বিরত থাকার ইচ্ছা, কৃপণতাকে প্রাধান্য দেয়া এবং সকল দিক থেকে ব্যয় করা হতে বিরত থাকা।[১]

কৃপণতা একটি মন্দ ও অপছন্দনীয় গুণ। যেহেতু তাতে রয়েছে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্য এবং সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জিভূত করার আগ্রহ। তা অনেক সময় ঋণ দেয়া ও অন্যকে সহযোগিতার ভয়ে মানুষ দারিদ্রতা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে বা মেহমানকে সম্মান না করতে ও সন্তানদের জন্য খরচ না করতে প্ররোচিত করে। আর এটা অনেক সময় সন্তানদের ভিক্ষাবৃত্তি ও পিতার অনুকরণের দিকে নিয়ে যায়।

কৃপণতা কখনো সম্পদের ক্ষেত্রে, কখনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার কখনো নানা ধরণের আচরণগত রীতির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

কৃপণতার কারণসমূহ:

কৃপণতার কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

১- আশ-শুহহ (الشح): লোভসহকারে কৃপণতা, নবী সাঃ এ ধরণের কার্পণ্য থেকে নিষেধ করেছেন এবং এর চরম ক্ষতির কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: (তোমরা যুলুমকে ভয় কর। কেননা কিয়ামত দিবসে যুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতা থেকে সাবধান থেকো। কেননা এই কৃপণতাই তোমাদের পুর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তা তাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলুব্ধ করেছে।)[২] মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ [আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়; তারাই তো সফলকাম।][৩]

২- কৃপণতার আরেক কারণ হল, সম্পদের প্রতি ভালবাসা।[৪] আর এটা তাকে সম্পদ জমা করতে এবং পরিমাণ অনুযায়ী ও প্রয়োজনীয় পরিমাপে আবশ্যকীয় কাজে তা ব্যয় না করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

---

(১) আল-খুলুকুল কামেল (৪/৪৬৯)।
(২) সহীহ মুসলিম (৪/১৯৯৬, হাঃ ৫৬-২৫৭৮)।
(৩) সূরা আত-তাগাবুন (১৬)।
(৪) আল-খুলুকুল কামেল পৃঃ (৪৬৯)।

৩- মূর্খতা এবং ব্যয় ও বদান্যতার গুরুত্ব সম্পর্কে না জানা; অথচ তা সম্পদ বৃদ্ধি করে ও তার বরকত বাড়িয়ে দেয়। নবী সাঃ তার রবের পক্ষ থেকে হাদিসে কুদসীতে বলেন: (মহান আল্লাহ বলেন, হে, আদম সন্তান! তুমি খরচ কর, তাহলে আমিও খরচ করবো তোমার প্রতি।)[১] নবী সাঃ বলেছেন: (সাদকা করার ফলে সম্পদ হ্রাস পায় না।)[২]

কৃপণতার ক্ষতিসমূহ নিম্নরূপঃ

১- কৃপণতা ধর্মীয় দিক থেকে কৃপণের জন্য ক্ষতিকর। এটা তাকে যাকাত ও সাদকা করা, মেহমান ও প্রতিবেশীর সম্মান করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হতে বিরত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠ ﴾ [আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা কল্যাণকর, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কেয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে। আসমান ও যমীনের সত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।][৩] অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি যেন মনে না করে যে, সম্পদ জমা করা তার উপকারে আসবে। বরং তা তার জন্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে ক্ষতিকর এমনকি কোন কোন সময় দুনিয়ার ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর হতে পারে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তার সম্পদের পরিণতির সংবাদ দিয়ে বলেছেনে: [لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ] [যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কেয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে।][৪]

আর যাকাত দানে অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাস্তি দেয়া হবে। নবী সাঃ বলেছেন: (যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল।)[৫]

২- নিশ্চয় কৃপণতা ধ্বংসকারী এবং হত্যা, ছিনতাই ও লুণ্ঠনের দিকে আহবানকারী: সুতরাং যাকাত প্রদান না করার কারণে ও অভাবী লোকদের সাহায্য না করার কারণে, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা না থাকলে দরিদ্রতা তাদেরকে ছিনতাই, লুণ্ঠন ও হত্যা সংঘটিত করতে এবং সম্পদশালীদের সাথে শত্রুতা করতে বাধ্য করে। নবী সাঃ আমাদেরকে এ থেকে সতর্ক করেছেন এবং সমাজের উপর এর ক্ষতি বর্ণনা করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন: (তোমরা যুলুমকে ভয় কর। কেননা কিয়ামত দিবসে যুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতা থেকে সাবধান থেকো। কেননা এই কৃপণতাই তোমাদের পুর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তা তাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলুব্ধ করেছে।)[৬]

---

(১) সহীহ বুখারী (৩/৪২৪, হাঃ ৫৩৫২), সহীহ মুসলিম (২/৬৯০-৬৯১, হাঃ ৩৬-৯৯৩)।
(২) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) সূরা আলে ইমরানঃ (১৮০)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৪৪২)
(৫) সহীহ বুখারী (১/৪৩৩, হাঃ ১৪০৩), সহীহ মুসলিম (২/৬৮৫)।
(৬) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩- কৃপণতা বিনাশের দ্বার আর দান করা সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির দ্বার। নবী সাঃ বলেছেন: (প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।)[১]

৪- কৃপণতার ক্ষতির আরেকটি দিক হল, কৃপণ ব্যক্তি কৃপণতার দরুন নিজেকে ফকিরী হালতে ও নোংরা পোষাকে প্রকাশ করে। অথচ নবী সাঃ সাহাবী আহওয়াছকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তার মাঝে সম্পদ নিদর্শন দেখা যায়। আবু আহওয়াছ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (আমি একবার রাসূল সাঃ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে পুরাতন মলিন কাপড় পরিহিত খারাপ অবস্থায় দেখে বললেনঃ তোমার কি কোন মাল-সম্পদ আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সর্বপ্রকার সম্পদই দান করেছেন। তখন তিনি বললেনঃ যখন তোমাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।)[২]

৫- কৃপণতা করা আহলে কিতাবদের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٣٧ ﴾ [যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।][৩]

ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: কোন কোন সালাফ এই আয়াতটিকে মুহাম্মাদ সাঃ এর বিষয়ে ইহুদীদের নিকট যে জ্ঞান ছিল তা প্রকাশের কৃপণতা ও গোপন করার উপর প্রয়োগ করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: [وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا] [আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।][৪]

সুতরাং জ্ঞানের কৃপণতা ও সম্পদের কৃপণতার বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও পূর্বাপর আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় এখানে উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের কৃপণতা। আর এই ব্যাধি দ্বারা কিছু জ্ঞানের দাবীদার ব্যক্তিদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। তারা অনেক সময় কৃপণতা করে তাদের জ্ঞানকে গোপন করে, এই হিংসায় যে তারা যা পেয়েছে অন্যরা তা পেয়ে যাবে, আবার কখনো বা এর বিনিময়ে কোন দায়িত্ব বা সম্পদ গ্রহণ করে আর আশঙ্কা করে যে, প্রকাশ করলে তার দায়িত্ব ও সম্পদ কমে যাবে।[৫]

প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনা:

প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ:

১- মানুষ কৃপণতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। রাসূল সাঃ সবচেয়ে দানশীল ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়ার পরও আল্লাহর নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন: (**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ**

(১) সহীহ মুসলিম (২/৭০০, হাঃ ৫৭-১০১০)।
(২) সুনানে নাসায়ী (৮/১৯৬, হাঃ ৫২৯৪), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৩) সূরা আন-নিসাঃ (৩৭)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৫০৮)।
(৫) ইকতেযাইস সিরাতাল মুস্তাকীম, পৃঃ (৭)।

وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) (হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।)[১]

২- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামে দানের গুরুত্ব, তার সাওয়াব ও প্রতিদান বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক শিক্ষা প্রদানে তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে। দান হল সম্পদ বৃদ্ধি ও তাতে বরকত লাভের মাধ্যম। পক্ষান্তরে কৃপণতা হল হিংসা-বিদ্বেষ, জোর-জবরদস্তি, বিপর্যয়, রক্ত প্রবাহিত করা ও চুরির কারণ। আর কৃপণ ব্যক্তি ও সমাজের উপর এর ক্ষতি চরম।

৩- মানুষ ব্যয় করতে চেষ্টা করবে এবং নিজেকে দান করার উপর অভ্যস্ত করে তুলবে। তাহলে ব্যয়ের অনুভূতি সম্পদ পুঞ্জিভূত করার ভালবাসার উপর প্রাধান্য পাবে এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আর জান্নাত লাভের প্রবল আকাঙ্খা রাখবে; যার প্রশস্ততা আসমান ও যমিনের সমান।

৪- পিতা-মাতা ও মুরুব্বীগণ সঠিক লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবেন এবং অপচয়হীন দানের ক্ষেত্রে তারা সন্তানদের জন্য উত্তম আদর্শ হবেন।

৫- মানুষ সাহাবাদের দানশীলতা ও নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়গুলো খেয়াল করবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা আনসার সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বলেছেন: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।][২]

(১) সহীহ বুখারী (২/৩২৯-৩৩০, হাঃ ২৮৯৩), সহীহ মুসলিম (৪/২০৮, হাঃ ৫২-১৭০৬)।
(২) সূরা আল-হাশরঃ (৯)।

চুরি করা

চুরির অর্থঃ

চুরির আভিধানিক অর্থঃ

চুরি হল: যা তার মালিকানাধীন নয় তা গোপনে নিয়ে নেওয়া।[১]

পারিভাষিক অর্থঃ

পরিভাষায় চুরি হল: গোপনে কোন কিছু গ্রহণ করা।[২]

ইসলামী মূলনীতির বিপরীত অপশিক্ষার কারণে যেসব আচরণগত ত্রুটির উদ্ভব হয় তার অন্যতম হল, শরীয়তসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত অন্যের হক গ্রহণে উদাসীনতা ও তা উপভোগ করা, যার ফলে ভয়, আতঙ্ক এবং শান্তি ও স্বীয় সম্পদের নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হয়। ইসলামী দিকনির্দেশনার ব্যাপারে চিন্তাশীল ব্যক্তি লক্ষ্য করবে যে, এই চরিত্রগত অপরাধে জড়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা কঠোরতা আরোপ করেছে, এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨ ﴾ [আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।][৩] নবী সাঃ বলেছেন: (আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয় সে চোরের উপর যে একটি ডিম চুরি করেছে যার ফলে তার হাত কাটা গেছে বা একটি দড়ি চুরি করেছে যার ফলে তার হাত কাটা গেছে।)[৪]

চৌর্যবৃত্তির কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

১- একনিষ্ঠ ইসলামী মানহাজের উপর সঠিক প্রতিপালন না করা। পিতা-মাতা অনেক সময় তার সন্তানের হাতে এমন কিছু দেখে যা তাকে দেয়নি, তারপরও সে কোথা থেকে সেটা পেল তা জিজ্ঞেস করে না ও যাচাই করে দেখে না। এক্ষেত্রে তারা ঢিলেমি করে এমনকি যখন সন্তান বড় হয়ে যায় এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন পিতা-মাতার জন্য তাকে সঠিক শিক্ষা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে কখনো কখনো তারা তাকে চুরি ও এর মাধ্যমসমূহে জড়িয়ে যেতে ছেড়ে দেয়। কোন একটি আদালত আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে হাত কাটার রায় দিয়েছিল। অতঃপর যখন তা কার্যকরের সময় হল তখন সে উচ্চ স্বরে বলল: তোমরা আমার হাত কাটার পূর্বে শুনে রাখ! আমি সর্বপ্রথম আমার প্রতিবেশীর থেকে একটি ডিম চুরি করেছিলাম, কিন্তু আমার মা আমাকে সতর্ক করেনি এবং তা ফিরিয়ে দিতেও বলেনি, বরং বলেছিল:

---

(১) আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন পৃঃ (২৩১)।
(২) ফিকহুস সুন্নাহ (২/৪৮৬)।
(৩) সূরা আল-মায়েদাঃ (৩৮)।
(৪)বুখারী (৪/২৪৭, হাঃ ৬৭৮৩), মুসলিম (৩/১৩১৪, হাঃ (৭/১৬৮৭)।

আমার ছেলে বড় হয়ে গেছে। যদি আমার মায়ের মুখের ভাষা আমাকে অপরাধে জড়িত হতে উৎসাহিত না করত, তবে আমি সমাজে চোর হিসেবে আবির্ভুত হতাম না।[১]

২- চুরির শাস্তি প্রয়োগে উদাসীনতা বা একেবারে শাস্তি প্রয়োগ না করা দুর্বল মনের মানুষদের চুরি করতে উৎসাহিত করে। অথচ রাসূল সাঃ চুরির শাস্তি কার্যকরের ব্যাপারে কঠোরতা করে বলেন: (আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।)[২]

৩- চৌর্যবৃত্তির আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে, অন্যের নিকট যা আছে এবং তারা যা উপভোগ করছে তার প্রতি লোভ-লালসা। কেননা অনেক সময় লোভ পরোক্ষভাবে চুরি করতে উদ্বুদ্ধ করে।[৩]

চৌর্যবৃত্তির বিপদসমূহ নিম্নরূপঃ

১- তা চোরকে শাাস্তি স্বরূপ হাত কাটার সম্মুখীন করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨﴾ [আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।][৪]

২- তা চোরকে আল্লাহর লা'নতের মুখোমুখী করে। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে রাসূল সাঃ বলেন: (আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয় সে চোরের উপর যে একটি ডিম চুরি করেছে যার ফলে তার হাত কাটা গেছে বা একটি দড়ি চুরি করেছে যার ফলে তার হাত কাটা গেছে।)[৫]

৩- সমাজের লোকদের মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয় অধিক চুরি ও সম্পদ লুণ্ঠনের কারণে। যে সকল দেশ ইসলামী শরীয়ত ও উপকারী ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করে না সে সকল দেশে তা বিদ্যমান। আমেরিকাতে অপরাধ সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে প্রতি দুই মিনিটে একটি চুরি সংঘটিত হয়। বাড়ীতে প্রতি ২০ সেকেন্ডে এবং গাড়ীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে চুরি সংঘটিত হয়। তথা বছরে ২৮৫ মিলিয়ন চুরি সংঘটিত হয়।[৬]

৪- চৌর্যবৃত্তির আরেকটি বিপদ হল, চোর রাস্ট্রীয় শক্তির ধাওয়ার সম্মুখীন হয়, তাকে জেলে ঢোকানো হয় এবং সে শাস্তির মুখোমুখী হয়।

৫- চোরের ক্ষেত্রে সামাজিক বিশ্বাস নষ্ট হওয়া। তার অনিষ্ট থেকে কেউ নিরাপদ থাকে না। ফলে যারাই তাকে চিনে তার থেকে দূরে থাকে। সে পূর্ণ অনুতপ্ত না হলে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে না। তাই সে চারপাশের লোকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়।

৬- সে চুরির মাল খায়, যা তার জন্য হারাম।

---

(১) আখলাকুনাল ইজতেমাইয়া, পৃঃ (১৬২)।
(২) বুখারী (৪/২৪৮-২৪৯, হাঃ ৬৭৮৮), মুসলিম (৩/১৩১৫, হাঃ ৮/১৬৮৮)।
(৩) মুকাফাহাতুস সারেকা ফিল ইসলাম পৃঃ (২১৬)।
(৪) সূরা আল-মায়েদা (৩৮)।
(৫) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৬) মুশকিলাতুশ শাবাবাল জিনসিয়া পৃঃ (৪৬-৪৭)।

প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনা

প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনা নিম্নরূপঃ

১- চুরির শাস্তি কার্যকর করা; কেননা তা বাস্তবায়ন করলে একটা নষ্ট হাতকে বিচ্ছিন্ন করা হবে ও তার চিকিৎসা করা হবে এবং যাদের মনের মাঝে অন্যের সম্পদের উপর আক্রমণের অভিপ্রায় থাকে তার জন্য শিক্ষা হবে। সুতরাং শাস্তির মাঝেই শিক্ষণীয়, প্রতিকারমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক ইসলামী নির্দেশনা রয়েছে। কাজেই তা চোরের জন্য প্রতিকারমূলক এবং যার মনে চুরির ইচ্ছা আছে তার জন্য প্রতিরক্ষামূলক।

২- দায়িত্বশীলগণ এবং শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সতর্কতা অবলম্বন করবে। যেন সন্তানরা অন্যের হকের প্রতি সম্মান ও তার উপর সীমালঙ্ঘন না করার উপর গড়ে উঠে। তাদেরকে ছোট বেলা থেকেই আল্লাহর ভয়ে অন্যের সম্পদ চুরি না করতে ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

৩- অনুরূপভাবে পিতা-মাতার উচিত হবে অন্যের সম্পদের সম্মান করা এবং কোন ভাবেই তার উপর আক্রমণ না করা। কেননা তারাই সন্তানদের জন্য আদর্শ।

৪- অনুরূপভাবে সন্তানদের সম্পদের সম্মান করা। যেন সন্তানের হাত গোপনে সেদিকে না যায়। যাতে সন্তানরা অনুমতি নেয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয় এবং চুরির দিকে অগ্রসর না হয়।

৫- প্রচার মাধ্যমসমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামী চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি সচেতনতা প্রচার করবে এবং দুনিয়ায় এর শাস্তির বিষয়টি বর্ণনা করবে। আর প্রত্যেক খারাপ কাজের শাস্তি ও ভাল কাজের পরকালীন প্রতিদান বর্ণনা করবে। যেন মানুষেরা ইসলামী চরিত্রের ফযিলত জেনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে এবং খারাপ বিষয়ের শাস্তি ও তিরস্কারের বিষয় জেনে তা থেকে বিরত থাকতে পারে। কেননা মানুষ কে খারাপ কাজে জড়িত হতে উৎসাহিত করে এর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও দ্বীনি প্রতিবন্ধকতার অভাব।

ধোঁকা ও খিয়ানত

ধোঁকা ও খিয়ানতের অর্থঃ

ধোঁকা হল: কল্যাণ কামনার বিপরীত।[১]

বলা হয় (غشّه) তাকে ধোঁকা দিয়েছে: অর্থাৎ তার কল্যাণ কামনা করেনি এবং তার অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত প্রকাশ করেছে।[২]

খিয়ানত হল: এটিও কল্যাণ কামনার বিপরীত। কামুসুল মুহীতে বলা হয়েছে, খিয়ানত হল মানুষ তাকে আমনতদার মনে করবে কিন্তু সে ঐ বিষয়ে কল্যাণ কামনা করবে না।[৩] এর অন্তর্ভুক্ত হল ঘুষ গ্রহণ, কেননা এটাকে খিয়ানত হিসেবে গণ্য করা হয় যাকে একটি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

ঘুষ হল, মানুষ যা বিচারক বা অন্য কাউকে প্রদান করে ফয়সালা বা বিধানটি তার পক্ষে আনার জন্য।[৪]

সকল ক্ষেত্রে খিয়ানত খারাপ কাজ। তবে একটি থেকে অপরটি অধিক খারাপ। যে ব্যক্তি আপনার সাথে টাকা-পয়সার ব্যাপারে খিয়ানত করেছে সে ঐ ব্যক্তির মত নয় যে আপনার সাথে পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছে এবং বড় অপরাধ সংঘটন করেছে।[৫]

ধোঁকা ও খিয়ানতের প্রকারভেদঃ

ধোঁকা ও খিয়ানতের প্রকারভেদ নিম্নরূপঃ

১- গোপন বিষয় প্রকাশ: গোপনীয়তা প্রকাশের কারণে কত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং তার লক্ষ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যদি সে তা গোপন রাখত তাহলে এর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকত, পরিণতি থেকে মুক্ত থাকত এবং তার প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে আশাবাদী থাকত।[৬]

এজন্য একজন মুসলিমের উপর ওয়াজীব হল সে মানুষের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবে না। কারণ এর কারণে সে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন: গোপনীয়তা রক্ষার অধ্যায় শিরোনামে। এখানে তিনি আনাস বিন মালেক রাঃ এর হাদিস নিয়ে এসেছেন, তিনি বলেন: (একবার নবী সাঃ

---

(১) লিসানুল আরাব (৬/৩২৩)।
(২) আল-কামুসূল মুহিত (২/২৮১)।
(৩) পূর্বোক্ত (৪/২২০)।
(৪) আল মিসবাহুল মুনির (১/৩১০)।
(৫) আল-কাবায়ের লিয-যাহাবী পৃঃ (১১৯)।
(৬) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃঃ (৩০৭)।

আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। আমি তার পরেও কাউকে তা জানাইনি। এটা সম্পর্কে উম্মে সুলায়ম রাঃ (আমার স্ত্রী) আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাকেও বলি নি।)[১]

২- বিচারক কর্তৃক বিচার প্রার্থীর সাথে ধোঁকা: তার মাধ্যমে ধোঁকা সংঘটিত হয় তাদের উপর যুলুম করা, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ, তাদের রক্ত প্রবাহিত করা, তাদের সম্ভ্রমহানী করা, তাদের প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করা, তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে বাধা দেয়া, দ্বীন ও দুনিয়া বিষয়ক আবশ্যকীয় জ্ঞান হতে দূরে রাখা, শাস্তি প্রয়োগে অবহেলা, বিপর্যয়কারীদের বাধা না দেয়া এবং জিহাদ নষ্ট করা ইত্যাদি দ্বারা; যা কিছুতে বান্দাদের জন্য মঙ্গল নিহিত…।[২]

নবী সাঃ বলেছেন: (আল্লাহ তায়ালা যাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু তাতে খিয়ানাতকারীরূপে যদি তার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।)[৩] তিনি আরো বলেন: (মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের সার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রয়াস না চালায়, তবে সে মুসলিমদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।)[৪]

৩- লেনদেনের ক্ষেত্রে ধোঁকা মুসলিমদের সাথে ও তার আমানতদারিতার বিষয়ে খিয়ানত। অনেকেই প্রকার ও মানের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়; উপরের অংশে ভালগুলো রাখে আর মধ্যে ও নিচে নষ্টগুলো রাখে। আবার অনেকেই ওজন ও পরিমাণে **ধোঁকা** দেয়। অনেকেই আবার শপথ করার মাধ্যমে **ধোঁকা** দেয়; যেন মানুষেরা তার পণ্যের উপর বিশ্বাস করে, এরপর যখন বিশ্বাস করে তার পণ্য ক্রয় করে নিয়ে আসে তখন তাদের কাছে এর দোষগুলো স্পষ্ট হয়ে যায় যা সে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে গোপন রেখেছিল।

ধোঁকা থেকে সতর্ককারী ইসলামী দিকনির্দেশনাসমূহ অনেক। তার মধ্যে একটি হল, মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ ﴾ [দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় তথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।][৫] তিনি আরো বলেন: ﴿ فَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٨٥ ﴾ [কাজেই তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ার শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মুমিন হলে তোমাদের জন্য এটাই কল্যানকর।][৬]

নবী সাঃ বলেছেন: (যে ব্যাক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যাক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভূক্ত নয়।)[৭] আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত (একদা রাসূল সাঃ খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। তিনি স্তুপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন ফলে হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলো। তিনি বললেন, হে স্তুপের মালিক! এ কি ব্যাপার? লোকটি বলল, হে

---

(১) ফাতহুল বারী (১১/৮২)।
(২) সুবুলুস সালাম (৪/১৫৭৯)।
(৩) সহীহ বুখারী (৪/৩৩১, হাঃ ৭১৫১), মুসলিম (৩/১৪৬০, হাঃ ২১-১৪২)।
(৪) সহীহ মুসলিম (৩/১৪৬০, হাঃ ২১-১৪২)।
(৫) সূরা আল-মুতাফফিফীনঃ (১-৩)।
(৬) সূরা আল-আরাফঃ (৮৫)।
(৭) সহীহ মুসলিম (১/৯৯, হাঃ ১৬৪-১০১)।

আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তিনি বললেন, সেগুলো তুমি স্তুপের ওপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে, সে আমার দলভূক্ত নয়।)[১]

৩- মানুষের কার্যক্রম সহজ করার বিপরীতে ঘুষ গ্রহণ অথবা হককে বাতিল বা বাতিলকে হকে পরিণত করতে ঘুষ গ্রহণ খিয়ানত। অনুরূপভাবে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে ঘুষ প্রদানও খিয়ানত। এর মাধ্যমে অফিসসমূহ পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং তা যুলুমের স্থানে পরিবর্তিত হবে। মানুষের হকের বিষয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ঘুষ প্রদানও খিয়ানত। এজন্য রাসূল সাঃ ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে লা'নত করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: (ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।)[২]

মুস্তফা সেবায়ী বলেন: বর্তমানে সমাজের খারাপ অবস্থার বিষয়ে অভিযোগ বেড়ে গেছে, এমনকি একজন ব্যক্তিও পাবেন না যে সমাজের সুখ-শান্তির বিষয়ে সন্তুষ্টির সাথে কথা বলছে, যে তার নিজস্ব হকেব ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, এসকল অস্থিরতার একটায় কারণ পাবেন তা হল আমানতদারিতার অনুপস্থিতি।[৩]

৫- যে ব্যক্তি পরামর্শের ক্ষেত্রে আপনাকে আমানতদার মনে করেছে তার জন্য কল্যাণ কামনা না করা খিয়ানত। কেননা এ অবস্থায় সে তার জন্য সঠিক নসীহত উপস্থাপন করেনি। অথচ সে জানত যে, এর চেয়ে উত্তম নসীহা রয়েছে। কিন্তু লোভ বা হিংসার কারণে তাকে সঠিক নসীহা করেনি। রাসূল সাঃ বলেছেন: (যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।)[৪]

৬- মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের কল্যাণ নষ্ট করার মাধ্যমে তাদেরকে **ধোঁকা** দেয়া খিয়ানত। বিশেষ করে যাকে কোন কাজের বা অফিসের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নবী সাঃ **ধোঁকা** থেকে সতর্ক করে বলেছেন: (যে ব্যাক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যাক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।)[৫]

৭- অনেক মানুষ আছে যে সম্পদ ও পরিবারের ব্যাপারে খিয়ানত করে। যেমন আপনি একজনকে আমানতদার ভেবে তার দুনিয়াবী বিপদ দূর করার জন্য তাকে ঋণ দিলেন, কিন্তু সে আপনাকে তা ফেরত দিল না। এটি আমানতের খিয়ানত। যখন মিসরের বাদশা ইউসুফ আঃ-কে মিসরের ধনভান্ডারের দায়িত্ব দিতে চাইলেন, তখন তিনি ইউসুফ আঃ-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেন যে সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত, যা **ধোঁকা** ও খিয়ানতের বিপরীত। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِۦٓ أَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِيۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِينٌ أَمِينٞ ٥٤﴾] [আর বাদশা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব। তারপর বাদশা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন বলল, 'আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল আস্থাভাজন।]'[৬]

৭- আবার এমন মানুষও আছে যে অন্যের পরিবারের ব্যাপারে খিয়ানত করে কিংবা প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর পরিবারের বিষয়ে খিয়ানত করে। অথচ এগুলো ইসলামী চরিত্র নয়। বাদশার স্ত্রীর সাথে ইউসুফ আঃ-এর ঘটনায় কুরআনিক উপস্থাপনা রয়েছে ইউসুফ আঃ-এর আমানতদারিতা, তার সচ্চরিত্র ও তার খিয়ানত মুক্ত থাকার বিষয়ে।

---

(১) সহীহ মুসলিম (১/৯৯, হাঃ ১৬৪-১০২)।

(২) সুনানে আবু দাউদ (৪/৯-১০, হাঃ ৩৫৮০), সুনানে ইবনে মাজাহ (২/৭৭৫, হাঃ ২৩১৩), সুনানে তিরমিযি (২/৬২৩, হাঃ ১৩৩৬), ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, মুসনাদে আহমাদ (২/১৬৪), হাকেম (৪/১০৩)। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৩) আখলাকুনাল ইজতেমাইয়া পৃঃ (১০৭)।

(৪) সুনানে আবু দাউদ (৫/৩৪৫, হাঃ ৫১২৮), সুনানে তিরমিযি (৫/১১৫, হাঃ ২৮২২), তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৫) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) সূরা ইউসূফঃ (৫৪)।

ধোঁকাবাজি করার কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

১- মনের সংকীর্ণতা ও ধৈর্যের অভাব এমনকি সে কোন বিষয় গোপন রাখতে পারে না এবং ধৈর্যধারণ করতে পারে না।(১)

২- জ্ঞানীদের মত সতর্কতা এবং মেধাবীদের মত বিচক্ষণতা থেকে উদাসীনতা।(২)

৩- আমানতদারিতার গুণের বিষয়ে অবহেলা।

৪- মানুষের গোপন বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করা ও তা গোপন রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব না দেয়া।

৫- অহংকারবোধ করা ও মানুষকে হেয় করা এবং তাদের ও তাদের হকের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া।

৬- সম্পদ ও সম্পদ অর্জনের প্রতি তীব্র ভালবাসা এমনকি এটাই তার উপর প্রাধান্য পেয়ে গেছে। ফলে তা সঠিক ওজন না করা, পূর্ণ মাপ না দেয়া, পণ্যে ঠকবাজি করা ও ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে তাকে ধ্বংসে নিপতিত করেছে।

ধোঁকা ও খিয়ানতের বিপদসমূহঃ

১- কোন মানুষের জনগণের সাথে ধোঁকাবাজি ও খিয়ানত করা তাকে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির সম্মুখীন করবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে রাসূল সাঃ বলেছেন: (আল্লাহ তায়ালা যাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু তাতে খিয়ানাতকারীরূপে যদি তার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।)(৩) তিনি আরো বলেন: (মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের সার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রয়াস না চালায়, তবে সে মুসলিমদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।)(৪)

২- যে ব্যক্তি ওজন ও মাপে কম দিবে সে নিজেকে আল্লাহর আযাব ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ ﴾ [দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।](৫)

৩- ইসলামী দিকনির্দেশনা যা এগুলোকে হারাম করে ও এ থেকে সতর্ক করে তার সামনে ধোঁকা ও খিয়ানত ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মানসিক কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে। যেহেতু সে যে অপরাধ করেছে ও করছে তার কারণে আতঙ্ক ও পরকালীন অপেক্ষমাণ শাস্তির মধ্যে বসবাস করে। অনুরূপভাবে সে অনুভব করে যে, তার অর্জিত সম্পদ ও সম্মান স্বীয় প্রচেষ্টার কারণে নয়, বরং তা অর্জন হয়েছে খিয়ানত ও অপরাধের মাধ্যমে। তাই সে একনিষ্ঠ আমানতদার মুসলিমদের সামনে নিজেকে ছোট ও হীন মনে করে।

৪- অনুরূপভাবে ধোঁকাবাজ লোক দেখবে যে তার চার পাশের লোক তাকে অপছন্দ করছে ও তার থেকে দূরে যাচ্ছে। আর যে তার সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলে, তার বন্ধুত্ব মূলত সাময়িক, প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই তা শেষ হয়ে যাবে।

---

(১) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃঃ (৩০৭)।
(২) পূর্বোক্ত।
(৩) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৪) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৫) সূরা আল-মুতাফফিফীনঃ (১-৩)।

৫- ধোঁকা ও খিয়ানত মানুষের মাঝে ধ্বংস ও বিনাশ ঘটায়। যদি গোপন বিষয় প্রকাশের ক্ষেত্রে তা হয় তবে তা ঝগড়া ও দলাদলির সৃষ্টি করে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয় তবে তা হিংসা বিদ্বেষ তৈরী করে। পক্ষান্তরে যদি কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে হয় তবে ক্ষতি ও ধ্বংসের জন্ম দেয়।

প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনা

ধোঁকা ও খিয়ানতের ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপঃ

১- যাদের আমানতদারিতা হ্রাস পেয়েছে, যাদের মাঝে ধোঁকাবাজি বৃদ্ধি পেয়েছে, আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে ভালবেসেছে, মানুষ ও তাদের আমানতকে অবজ্ঞা করেছে, ফলে তারা আল্লাহ ও নিজেদের সাথে খিয়ানত করেছে, তাদেরকে মুরুব্বী ও উপদেশদাতা কর্তৃক উপদেশ দেওয়া। কেননা খিয়ানত অত্যান্ত মারাত্মক বিষয় এবং সমাজ ও ব্যক্তির উপর তার কুপ্রভাব দীর্ঘ। মহান আল্লাহ তা থেকে সতর্ক করেছেন, তিনি বলেন: [﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧ ﴾] [হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খেয়ানত করো না।](১) তিনি আরো বলেন: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعۡلَمَ أَنِّي لَمۡ أَخُنۡهُ بِٱلۡغَيۡبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي كَيۡدَ ٱلۡخَآئِنِينَ ٥٢﴾ [এটা এ জন্যে যে, যাতে সে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।](২) নবী সাঃ বলেছেন: (যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।)(৩) তিনি আরো বলেছেন: (মুনাফিকের আলামত তিনটি- যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; এবং তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে।)(৪)

২- ধৈর্যের শিক্ষা নেয়া ও তার উপর অভ্যস্ত হওয়া: কেননা তা গোপন বিষয়ের ছিপি, দারিদ্রতা সহ্য ও প্রতিকূলতার সাথে জীবন যাবনের পথ; সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে খিয়ানতের মাঝে জড়িত হওয়া ছাড়াই। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥ ﴾ [আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।](৫)

৩- দারিদ্রতা, স্বল্প জীবিকা ও বিপদের উপর ধৈর্যধারণের সওয়াবের কথা স্মরণ করা এবং এও স্মরণ রাখা যে, তা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ

(১) সূরা আল-আনফালঃ (২৭)।
(২) সূরা ইউসূফঃ (৫২)।
(৩) মুসনাদে আহমাদ (৩/১৩৫,১৪৫,২১০,২৫১)।
(৪) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৫) সূরা আল-বাকারাঃ (৪৫)।

ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ
مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧ [আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।][১]

৫- সামাজিক সমালোচনা: খিয়ানতকারী ও ঘুষগ্রহণকারীদের বিষয়ে আলোচনা এবং তাদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ইশারা করার মাধ্যমে সমালোচনা তাদের উপর প্রভাব ফেলে। কাজেই সমাজের ভাল মানুষদেরকে মাহফিল, খুতবা, প্রচার মাধ্যম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এসমস্ত খারাপ চরিত্রের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে তা নির্মূলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। আশা করা যায় এর ফলে সরাসরি নসীহতের উপর ভিত্তি করে কষ্টদায়ক সামাজিক সমালোচনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

(১) সূরা আল-বাকারাঃ (১৫৫-১৫৭)।

চতুর্থঃ অন্তরের খারাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অন্তর হল মানুষের শ্রেষ্ঠাংশ, এর মাধ্যমেই মানুষ সংশোধিত হয় আর এটা নষ্ট হয়ে গেলে আচরণ নষ্ট হয়ে যায় ও চরিত্র ধ্বংস হয়। নবী সাঃ বলেন: (জেনে রাখ! শরীরে একটি মাংসপিন্ড আছে যা ঠিক থাকলে সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। আর তা হল অন্তর।)[১]

অন্তরের খারাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে উদ্দেশ্য হল, অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচ্যুতিসমূহ। আর কখনো কখনো এর প্রভাব বাহ্যিক আচরণের মধ্যেও পড়ে। যেমন: হিংসা, রাগ ও খারাপ ধারণা ইত্যাদি। এ সকল আচরণের কেন্দ্র হল অন্তর। তবে ব্যক্তি কখনো তা কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ফলে তা বাহ্যিক আমলে রূপান্তরিত হয়, আবার কখনো গোপন রাখে ফলে তা অন্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপঃ

হিংসা

হিংসার অর্থ:

আভিধানিক অর্থঃ

রাগেব আল-আসবাহানী বলেন: হিংসা হল, নিয়ামতের অধিকারী ব্যক্তি হতে তা সরে যাওয়ার প্রত্যাশা করা, কখনো এর সাথে তা সরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা যুক্ত থাকে।[২]

পারিভাষিক অর্থঃ

ইবনে হাজার রহঃ বলেন: হিংসা হল নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে তা সরে যাওয়ার প্রত্যাশা করা।[৩]

মাহমূদ দিমাশকী বলেন: হিংসাকৃত ব্যক্তি হতে নিয়ামত সরে যাওয়ার প্রত্যাশা করা। এটি একটি মারাত্মক রোগ যাতে অনেক মানুষ আক্রান্ত।[৪]

হিংসার সংজ্ঞায় আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে মিল রয়েছে। এটি একটি রোগ যা দ্বারা অন্তর আক্রান্ত হয়, ফলে কোন মানুষের উপর আল্লাহর নিয়ামত দেখলে সে কষ্ট পায়। তাইতো মানুষের সাথে হিংসুকের চলাফেরা বিপরীতমূখী হয়; আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অপছন্দ করার কারণে। যখন বিষয়টি তার নিকট আরো গুরুতর হয় এবং হিংসা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে তখন তাদের থেকে নিয়ামত সরে যাওয়ার প্রত্যাশা করে, আবার কখনো তা সরিয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করে। তাই মনের উপর এর ক্ষতি বিরাট, সমাজের উপর এর অনিষ্ট দীর্ঘ এবং তার পরিণতি হল সুস্পষ্ট লোকসান। এটি সম্পর্ক নষ্ট করা, বন্ধুত্ব নিঃশেষ করা, ভালবাসা ও মানুষের মাঝের পারস্পরিক বন্ধন ধ্বংস করার পথ এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টিকারী।

হিংসার সীমারেখাঃ

হিংসা মানব স্বভাবের অন্তর্নিহিত বিষয়।[৫] যদি তা ঈর্ষা পর্যায়ে থাকে তবে তা প্রতিযোগিতার দিকে নিয়ে যায় এবং এর সীমা লংঘন করে না। ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেনঃ হিংসার একটি সীমা আছে, তা হল পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা এবং তার সমপর্যায়ের কারো অগ্রগামী হওয়ার ক্ষেত্রে অত্মসম্মানবোধ অনুভব করা। যখন এই সীমা অতিক্রম করে তখন তা যুলুমে পরিণত হয় এবং হিংসাকৃত ব্যক্তি থেকে নিয়ামত সরে

---

(১) সহীহ বুখারী (১/৩৪, হাঃ ৫২)।
(২) আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন পৃঃ (১১৮)।
(৩) ফাতহুল বারী (১/১৬৬)।
(৪) আদাবুল খুলুক ফিল ইসলাম, পৃঃ (১৫৭)।
(৫) জামেউল উলুম ওয়াল হেকাম, পৃঃ (৩১৮)।

যাওয়ার কামনা করে ও তাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করে। আর যখন এই সীমার থেকে কম থাকে তখন সে হীনমন্য ও দুর্বল সংকল্পের অধিকারী হয়।[১]

সুতরাং যখন তার সীমা অতিক্রম করে তখন হিংসায় পরিণত হয়, আর যখন এতে ঘাটতি থাকে তখন সে কাপুরুষে পরিণত হয়। আর যখন এটি তার সীমার মধ্যে থাকে তখন তা গ্রহণীয় ঈর্ষা পর্যায়ে থাকে।

হিংসার প্রকারভেদ:

মনে হিংসার উপস্থিতির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে মানুষ কয়েকভাগ বিভক্ত। এই হিংসার উপস্থিতি তার আচরণ ও চলফেরার পরিবর্তন ঘটায়। হিংসাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১- একজন মানুষ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের নিকট নিয়ামত দেখতে অপছন্দ করবে। এর তিনটি ধরণ রয়েছে:

ক- হিংসুক হিংসাকৃত ব্যক্তির নিকট নিয়ামতের উপস্থিতি ও তা উপভোগ করতে দেখে তা তার নিকট থেকে সরে যাওয়ার কামনা করবে, তবে তা তার নিকট স্থান্তরিত হওয়ার আশা করবে না। এদিকে ইঙ্গিত করে সনয়ানী রহঃ বলেন: একপ্রকার হল, সে এই নিয়ামতকে অপছন্দ করবে এবং তা সরে যাওয়ার কামনা করবে। আর এই অবস্থাকে হিংসা বলা হয়।[২]

খ- আবার কেউ কেউ সেই নিয়ামত সরে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপকরণ গ্রহণ করে থাকেন। তাদের কেউ কথা ও কাজের দ্বারা হিংসাকৃত ব্যক্তির উপর জুলুম করার মাধ্যমে তার থেকে সেই নিয়ামত সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।[৩]

গ- আরেক প্রকার লোক আছে যারা হিংসাকৃত ব্যক্তি থেকে নিয়ামত সরে গিয়ে তার নিকট চলে আসার প্রত্যাশা করে। এদিকে ইঙ্গিত করে ইবনে রজব রহঃ বলেন: তাদের কেউ কেউ তা নিজের নিকট স্থান্তরিত করার চেষ্টা করে।[৪]

এ ধরণগুলো হিংসার জঘন্য ও নিষিদ্ধ ধরণ। ইবনে হাজার রহঃ বলেন: যখন সে অন্যের নিকট এমন কিছু দেখে যা তার নিকট নেই, তখন সে ঐ ব্যক্তির থেকে তা সরে যাওয়ার কামনা করে, যেন তার থেকে উপরে উঠতে পারে বা তার সমান হতে পারে। এধরণের কাজে জড়িত ব্যক্তি ঘৃণিত যদি সে এরূপ বিষয় অন্তর, কথা বা কাজ দ্বারা করে।[৫]

২- একজন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের উপর নিয়ামত দেখে তা সরে যাওয়ার প্রত্যাশা করে না, কিন্তু সেও তার অনুরূপ নিয়ামত কামনা করে। একে ঈর্ষা বলা হয়। ঈর্ষা হল, মনের মধ্যে অন্যের অনুরূপ নিয়ামতের

---

(১) আল- ফাওয়ায়েদ, ইবনুল কায়্যিম, পৃঃ (১৫৭)।
(২) সুবুলুস সালাম (৪/১৫৬৫)।
(৩) জামেউল উলুম ওয়াল হেকাম, পৃঃ (৩০৮)।
(৪) পূর্বোক্ত ,পৃঃ (৩০৮)।
(৫) ফাতহুল বারী (১/১৬৬)।

আশা রাখা। এটি প্রশংসনীয়। কেননা এর সাথে দৃঢ় সংকল্প ও কাজের প্রতি ভালবাসা থাকলে তা প্রতিযোগিতার দিকে নিয়ে যায়।[১]

ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন: সে অন্য ব্যক্তির তার উপর শ্রেষ্ঠত্বকে অপছন্দ করে, তাই সে তার মত বা তার চেয়ে উত্তম হতে চায়। এটা হল হিংসা, এটাকে অনেকে ঈর্ষা বলে নামকরণ করেছেন।[২]

ইবনে হাজার রহঃ বলেন: ঈর্ষা হল, সে তার জন্য অন্যের সমপরিমাণ নিয়ামত চায়, তবে তা ঐ ব্যক্তির থেকে সরে গিয়ে নয়। এ ব্যাপারে আগ্রহী থাকাকে বলা হয় মুনাফাসা বা প্রতিযোগিতা। আর এটি যদি আনুগত্যের কাজে হয় তবে তা প্রশংসনীয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝٢٦﴾ [আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা।][৩] আর যদি তা পাপ কাজে হয় তবে তা নিন্দনীয়। যেমনটি হাদিসে এসেছে (তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর না)। আবার যদি তা জায়েয কাজের ক্ষেত্রে হয় তাবে তা বৈধ।[৪]

৩- দরকারি হিংসা। এটা এমন হিংসা যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে। নবী সাঃ বলেছেন: (দু'টি বিষয় ছাড়া হিংসা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবারাত্র তা তিলাওয়াত করে। যা দেখে অপর ব্যক্তি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে আমাকে যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, তা হলে আমিও অনুরূপ করতাম, সে যেরূপ করছে। আরেক ব্যক্তি হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যখাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অপর ব্যক্তি বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, সে যা করেছে।)[৫] এখানে ঈর্ষাকে হিংসা বলা হয়েছে রূপক অর্থে। এটা হল প্রতিযোগিতার হিংসা, যার কারণে হিংসুক ব্যক্তি হিংসাকৃত ব্যক্তির মত হতে চায়। এটা লাঞ্ছনাকর হিংসা নয় যার কারণে হিংসুক হিংসাকৃত ব্যক্তির থেকে নিয়ামত সরে যাওয়ার প্রত্যাশা করে।[৬] উমর বিন খাত্তাব রাঃ আবু বকর সিদ্দিক রাঃ-এর সাথে সাদকা করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। যায়েদ বিন আসলাম হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি উমর বিন খাত্তাব রাঃকে বলতে শুনেছি (একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মালও ছিলো। আমি (মনে মনে) বললাম, আজ আমি আবু বকর রাঃ এর অগ্রগামী হবো, যদিও আমি কোন দিন দানে তার অগ্রগামী হতে পারিনি। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? আমি বললাম, এর সম-পরিমান। উমর রাঃ বলেন, আর আবু বকর রাঃ তার সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। তখন আমি বললাম, আমি কখনো কোনো বিষয়েই আপনাকে অতিক্রম করতে পারবো না।)[৭]

---

(১) আল-খুলুকুল কামেল (৪/৪২০)।
(২) ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া (১/১১২)।
(৩) সূরা আল-মুতাফফিফীনঃ (২৬)।
(৪) ফাতহুল বারী (১/১৬৭)।
(৫) সহীহ বুখারী (৪/৪১১, হাঃ ৭৫২৮)।
(৬) আল- ফাওয়ায়েদ, ইবনুল কায়্যিম, পৃঃ (১৫৭)।
(৭) সুনানে তিরমিযি (৫/৫৭৪, হাঃ ৩৬৭৫), তিনি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

৪- কিছু মানুষ আছে যারা হিংসাকে দমন করে; যা তাকে হিংসাকৃত ব্যক্তির সাথে সদাচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সে হিংসার মহাবিপদের সময় নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে হিংসাকৃত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তার জন্য দোয়া করার মাধ্যমে। ইবনে রজব রহঃ বলেন: "আরেক প্রকার লোক রয়েছে যখন সে মনের মাঝে হিংসা অনুভব করে, তখন তা দূরীভূত করতে, হিংসাকৃত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করতে, তার জন্য দোয়া করতে ও তার মর্যাদা প্রচার করতে চেষ্টা করে। এমনকি সে তার হিংসাকে মহব্বতে পরিবর্তন করে যে, অপর মুসলিম তার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর এটা ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরের অন্তর্ভুক্ত"।[১]

হিংসার কারণসমূহঃ

১- রিযিক বন্টনে আল্লাহর হিকমত ও ইচ্ছার ব্যাপারে দূর্বল ঈমান ও আল্লাহ যা দান করেছেন তার উপর তুষ্ট না হওয়া। আর এটা মানুষকে আল্লাহর বান্দাদের থেকে নিয়ামত সরে যাওয়ার প্রত্যাশা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা হল আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা এবং আল্লাহর পূর্ণ হিকমতের ব্যাপারে ঈমানের দুর্বলতা।[২]

২- হিংসাকৃত ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ যা তার নিয়ামতকে অপছন্দ করার দিকে নিয়ে যায়। মাওরদী রহঃ এর প্রতি ইঙ্গিত করে মত প্রদান করেছেন যে, হিংসার কারণ হল হিংসাকৃত ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ যার কারণে তার কোন মর্যাদা প্রকাশ পেলে বা কোন শুকরিয়াযোগ্য অর্জন দেখলে কষ্ট অনুভব করে। তাই শত্রুতার আড়ালে হিংসা বিস্তার করে। এ ধরণের হিংসা ব্যাপক নয় যদিও তা সর্বাধিক ক্ষতিকর; কেননা সে সকল মানুষের সাথে হিংসা করে না।[৩]

৩- হিংসুকের উপর হিংসাকৃত ব্যক্তির এমন শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ যা অর্জন করতে হিংসুক অক্ষম। তাই সে তার চেয়ে অগ্রগামী হওয়া ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়াকে অপছন্দ করে। এর ফলে সে হিংসা করে, যদি এরূপ না হত তবে সে হিংসা থেকে বিরত থাকত।[৪] আর এটা প্রত্যেক মানুষের স্বকীয়তা ও নির্দিষ্ট সক্ষমতার বিষয়ে অসন্তুষ্টি ও অস্বীকৃতির ফলস্বরূপ। কেননা কিছু মানুষকে আল্লাহ তায়ালা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ক্ষমতা দিয়েছেন, অথচ তার সমবয়সী অপরজনকে কষ্ট ও বোঝা বহনের ক্ষমতা দিয়েছেন। সুতরাং প্রথমজনের উচিত ডাক্তারী করা আর দ্বিতীয়জনের উচিত মেশিনারিজ বা কৃষিকাজ ইত্যাদি শিক্ষা করা। একজন অপরজনের দিকে দেখবে না, পরস্পর হিংসা করবে না এবং একে অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। কেননা হিংসা করা নিন্দিত কাজ এবং তুচ্ছজ্ঞান করারও ঘৃণীত কাজ।

৪- একই লক্ষ্য উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা করা, ফলে হিংসুক তার কাঙ্খিত বিষয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় করে। যেমন একই কর্ম বা একই পদ অর্জনের জন্য প্রতিযোগী ব্যক্তিরা।[৫]

৫- পিতা-মাতা ও মুরুব্বী কর্তৃক অন্যদের উপর কোন সন্তান বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রধান্য দেয়া; ইনসাফ বহির্ভূত কোন আবেগের কারণে। যা তাদের মাঝে পারস্পরিক হিংসার বিজ বপন করে। অথবা কোন প্রতিষ্ঠান প্রধান ও দায়িত্বশীল কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া তার অন্যান্য সহকর্মীকে বাদ দিয়ে; কোন

(১) জামেউল উলুম ওয়াল হেকাম, পৃঃ (৩০৯)।
(২) আল-আখলাক আল-ইসলামীয়া (১/৭৮৯)।
(৩) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃঃ (২৭০-২৭১)।
(৪) পূর্বোক্ত পৃঃ (২৭১)।
(৫) আল-খুলুকুল কামেল (৪/৪২২), তারবিয়াতুল ইসলাম ওয়া ইদ্দিয়াতুত তাহরীর পৃঃ (৩৩১)।

বিশেষ সম্পর্ক বা স্বার্থ থাকার কারণে যা মূলত প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ নয়। ফলস্বরূপ তাদের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

হিংসার বিপদসমূহঃ

১- হিংসা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক কষ্টের কারণ। যেহেতু এর ফলে মানুষের জীবন কর্দমাক্ত হয় যা তাকে উৎকণ্ঠিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে, তার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং অন্তর চিন্তিত হয়। যেহেতু বঞ্চিত ও ঈর্ষার ব্যাথা এবং বাধাপ্রাপ্ত লোলুপতা, প্রত্যাখ্যাত লিপ্সা, দমিত লোভ, নিয়ন্ত্রিত চাহিদা ও আহত হৃদয়ের ব্যাথা কঠিন শক্ত স্নায়ুগুলোকে চুর্ণ করছে।[১] অনুরূপভাবে হিংসুক হিংসার আফসোস ও শরীরের রুগ্নতার ব্যাথায় কাতর হয়। অতঃপর তার আফসোসের কোন সীমা থাকে না এবং তার রোগমুক্তির কোন আশা দেখে না।[২] যার ফলে সে অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয়, তার হৃদয় অন্ধ হয় ও তার বিবেক লোপ পায়।[৩]

২- হিংসা করার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধাজ্ঞার বিপরীত কর্ম করা হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কেননা কারো প্রতি ধারণা পোষন করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা পরস্পর দোষ অন্বেষন করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর প্রতিযোগিতা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষন করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না। বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।)[৪]

৩- ঘৃণীত হিংসার মাধ্যমে আল্লাহর বন্টিত রিযিকের ব্যাপারে বিরোধিতা করা হয়। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন আবার যার জন্য ইচ্ছা বিলম্বিত করেন। অনুরূপভাবে হিংসা করা ঈমানের হকীকতের বিপরীত; যেহেতু ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না। কেননা রাসূল সাঃ বলেছেন: (কোন মুমিনের পেটে আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের আগুনের শিখা একত্রিত হবে না। আর আল্লাহর বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হবে না।)[৫]

৪- হিংসা করা ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদেরকে হিংসুক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٩﴾ [আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।][৬]

---

(১) আল-আখলাকাল কামেল (১/৮০৫)।
(২) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃঃ (২৭৩)।
(৩) আদাবুল খুলুক ফিল ইসলাম (১৫৯)।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/১০৩, হাঃ ৬০৬৪), মুসলিম (৪/১৯৮৫, হাঃ ২৮/২৫৬৩)।
(৫) সুনানে ইবনে মাজাহ (২/৯২৭, হাঃ ২৭৭৪), সুনানে নাসায়ী (৬/১৩, হাঃ ৩১০৯), হাকেম (২/৭২), তিনি হাদিসটিকে মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন, শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬) সূরা আল-বাকারাঃ (১০৯)।

৫- এটি পূর্ববর্তী জাতির রোগ। রাসূল সাঃ বলেছেন: (পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের রোগ তোমাদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হল হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা। এ হল মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে বরং তা দ্বীনকে মুণ্ডন (ধ্বংস) করে দেয়। সে সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। এই ভালবাসা কেমন করে সুদৃঢ় হয় তা তোমাদের বলব কি? তা হল তোমরা পরস্পর সালামের প্রসার ঘটাও।)[১]

৬- হিংসা হিংসুকের মর্যাদা হ্রাস ঘটায়, নিয়ামতপ্রাপ্তদেরকে অপছন্দ করার ফলস্বরূপ। মানুষেরা তার থেকে দূরে সরে যায় এবং নিন্দিত আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা তার প্রতি ইঙ্গিত করে, তার ও তার আচরণ থেকে দূরে থাকার জন্য। মাওরদী এইদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, হিংসার ফলে তার মান-মর্যাদার অবনতি ঘটে। যেহেতু মানুষেরা তাকে এড়িয়ে চলে। আগের বাগধারায় বলা হয়েছে, হিংসুক নেতা হতে পারে না।[২]

৭- হিংসার বিপদের আরেকটি দিক হল, সমাজের উপর তার কুপ্রভাব। যেহেতু চরম হিংসা তাকে হিংসাকৃত ব্যক্তি থেকে নিয়ামত সরিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে এপথে সে কথা বা কর্ম বা উভয়ের মাধ্যমে অপরাধে জড়েয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে এটি চোগলখোরী ও গীবতের একটি অন্যতম কারণ। যেহেতু হিংসুক হিংসাকৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে যেন তার মর্যাদা হ্রাস পায় ও সে হেয় হয়। অনুরূপভাবে হিংসাকৃত ব্যক্তির প্রতি হিংসুকের লুকায়িত বিষয়ের ফলস্বরূপ তা বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে।

(১) সুনানে তিরমিযি (৪/৫৭৩, হাঃ ২৫১০), মুসনাদে আহমাদ (১/১৬৫), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
(২) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃঃ (২৭৩)।

প্রতিকারমূলক পরিপালনের রূপরেখা

হিংসার বিপদের ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক পরিপালনের রূপরেখা নিম্নরূপঃ

১- মানুষ তার জন্য উপকারী জ্ঞান অর্জন করবে, আর তা হল কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান; যা হিংসার ময়লা থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও মনকে পবিত্র করে এবং হৃদয়ের মাঝে তাকওয়া ও অন্যের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ তার উপর যে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন তার জন্য আনন্দ এবং তিনি যা দিয়েছেন তার প্রতি সন্তুষ্টি ও পরিতুষ্টি সৃষ্টি করে। সাথে সাথে সেগুলো উত্তম পন্থায় ব্যয় করার সঠিক পদ্ধতি অনুসন্ধান করবে। আর এটা পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব যে, তারা স্বীয় জাতি ও সাধারণ মানুষকে ইসলামী চরিত্রের উপর গড়ে তুলবে এবং তা তাদের অন্তরে গেঁথে দিবে।

২- সমাজ হিংসার ক্ষতি, ভয়াবহতা ও বিপদ অনুধাবন করবে, যা ভালকাজসমূহকে গলধঃকরণ করে খারাপ অবস্থায় নিপতিত করে। অনেক মানুষই জানে যে, হিংসা ঘৃণীত, কিন্তু তারা জানে না যে, তা ইহুদী ও পূর্ববতীদের চরিত্র এবং এই বিষয়ে ইসলামের চরম নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও জানে না। তারা এও জানে না যে, হিংসা ও ঈমান একসাথে একত্রিত হতে পারে না। যেমনটি হিংসার বিপদসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৩- মানুষ অন্যের জন্য কল্যাণ কামনার বিষয়ে ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত হবে। সুতরাং যদি সে মনের মাঝে অন্যের বিষয়ে হিংসা অনুভব করে, তাহলে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে ও তার জন্য দোয়া করতে চেষ্টা করবে। হতে পারে এরূপ বারবার করার ফলে ও এতে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে তার মনের হিংসা দূরীভুত হবে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾] [নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।][১]

ইবনু তাইমিয়া রহঃ বলেন: কেউ যদি অন্যের বিষয়ে মনের মাঝে হিংসা পায় তাহলে সে যেন তার সাথে তাকওয়া ও ধৈর্যের সাথে ব্যবহার করে এবং মনে মনে হিংসাকে অপছন্দ করে।[২] আর হিংসার পরিবর্তে সেটা ঈর্ষায় পরিবর্তন করবে। আর ঈর্ষা হল সে হিংসাকৃত ব্যক্তির অনুরূপ হতে আকাঙ্খা করবে তবে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে নিয়ামত সরে গিয়ে নয় এবং এটাকে কল্যাণকর পথে ব্যয়ের নিয়ত দ্বারা শক্তিশালী করবে।

৪- সে দোয়া ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর সে আল্লাহর নিকট চাইবে যে, তিনি যেন তাকে হিংসার রোগ হতে মুক্তি দেন ও রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ ١٨٦﴾] [আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।][৩] আর মানুষের প্রতি হিংসা

(১) সূরা আর-রাদঃ (১১)।
(২) ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া (১০/১২৫)।
(৩) সূরা আল-বাকারাঃ (১৮৬)।

করার কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٩﴾] [আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।][১]

৫- মানুষ তাদের সুন্দর স্বভাব, চরিত্র ও জীবনী বিষয়ে জানবে ও চিন্তা করবে যাদের অন্তর হিংসা থেকে পবিত্র এবং মানুষদের তাদের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের মূল্যায়ন করবে। আর তারা যে, নির্মল চিত্ত ও মানসিক প্রশান্তি উপভোগ করে তা অনুধাবন করবে। এগুলো শুধু তারাই অনুধাবন করতে পারবে যাদের অন্তর হিংসা হতে মুক্ত। আমাদের জন্য আনসারী সাহাবীদের জীবনীতে রয়েছে উত্তম দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾] [আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুতঃ যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।][২]

৬- হিংসা সৃষ্টিকারী কারণসমূহ অপসারণ করা। যেমন জুলুম করা এবং ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা না করা। সুতরাং পিতা-মাতা, মুরুব্বীগণ, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও দয়িত্বশীলগণ তাদের অধীনস্তদের ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখবে। যাতে করে তাদের মাঝে ভালবাসা ও ঐক্য তৈরী হয়। বস্তুত ইনসাফ ভালবাসা ও সন্তুষ্টির আগমণ ঘটায়, পক্ষান্তরে জুলুম প্রতিযোগিতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। যদি কোন মুরুব্বী, পিতা-মাতা বা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি দেখে যে, বিশেষ কোন কারণে কারো প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন তাহলে সে যেন এ ব্যাপারে সহনশীল ও বিচক্ষণ হয়; যাতে অন্যরা সে বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে টের না পায় এবং সে বিষয়টিকে অবস্থা বিবেচনায় সমাধান করবে। আমাদের জন্য ইউসুফ আঃ ও তার ভাইদের ঘটনায় এ বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿إِذۡ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٨﴾] [স্মরণ করুন, যখন তারা বলেছিল, আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই তো আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।][৩]

---

(১) সূরা আল-বাকারাঃ (১৯৯)।
(২) সূরা আল-হাশরঃ (৯)।
(৩) সূরা ইউসুফঃ (৮)।

ক্রোধ

ক্রোধের অর্থঃ

আভিধানিক অর্থঃ

ক্রোধ হল: সন্তুষ্টির বিপরীত।

ক্রোধের পারিভাষিক অর্থঃ

ইবনে রজব রহঃ বলেন: ক্রোধ হল, কষ্টদায়ক কিছু আপতিত হওয়ার আশঙ্কায় তা প্রতিরোধ করার জন্য বা যার থেকে কষ্ট পেয়েছে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অন্তরের ফুটন্ত অবস্থা।[১]

এভাবেও বলা যায়: মনের স্পন্দন যার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় হৃদয়ের রক্ত টগবগ করে।[২]

ক্রোধের কারণসমূহঃ

১- অন্যদের হতে মন যা অপছন্দ করে তার আক্রমণ।[৩]

২- জুলুম বা বঞ্চিতের শিকার হওয়ার অনুভব করা এবং বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে মেজাজ খারাপ হওয়া। যেমন গরম আবহাওয়া। এ সবগুলোই দ্রুত রাগান্বিত হতে সাহায্য করে।[৪]

৩- ক্রোধ সৃষ্টির আরেকটি অন্যতম কারণ হল, অসুস্থতা, কাজের ব্যস্ততা, নিয়মিত রাত্রী জাগরণ এবং লোভের মাঝে নিমজ্জিত থাকা; যা শরীর ও মনের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এগুলো হল ক্রোধের বীজের মত। আর সবচেয়ে বড় কারণ হল এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া।

জরুরী কারণগুলোর নিরাময় করতে হবে তা সংশোধন করে নেওয়ার মাধ্যমে যাতে মনের মাঝে পঙ্কিলতা তৈরী না হয়। এর পর ধারাবাহিকভাবে সেগুলো প্রতিহত করতে হবে।[৫]

ক্রোধের প্রকৃতি:

মানুষ স্বভাবগতভাবে রাগের অধিকারী। যদি সে তা হারিয়ে ফেলে তবে তার অনুভূতিগুলো নিস্তেজ হয়ে যাবে, সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমের আত্মমর্যাদায় উত্তেজিত হবে না এবং তার বীরত্ব নষ্ট হয়ে সে কাপুরুষে পরিণত হবে। কাজেই ক্রোধ হল উভয় ধার বিশিষ্ট অস্ত্র। ইবনুল কায়্যিম জাওযীয়া রহঃ বলেন: ক্রোধের সীমা রয়েছে তা হল প্রশংসনীয় বীরত্ব এবং খারাপ ও ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট হতে মুক্ত থাকা। আর এটা হল ক্রোধের পূর্ণতা। আর

(১) ইবনে রজব রচিত জামেউল উলুম ওয়াল হেকাম, পৃঃ (১৩৮)।
(২) আল-খুলুকুল কামেল (১/৩৬৭)।
(৩) আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া পৃঃ (২৫৮)।
(৪) আল-উসুস আন-নাফসিয়া লিননুমু, পৃঃ (২৯৪)।
(৫) আল-খুলুকুল কামেল (৪/৩৮৭)।

যখন তার সীমা অতিক্রম করে তখন এর অধিকারী সীমালঙ্ঘন করে ও জুলুম করে। আর যদি তা নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে কম থাকে তবে সে কাপুরুষ হয় এবং খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে না।[১]

আলী বিন আবু তালেব রাঃ বলেন: সহনশীলতার সীমা হল ক্রোধের উত্তেজনা হতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা।[২]

ক্রোধের প্রকারভেদ:

ক্রোধের প্রকৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, তা তিন প্রকারঃ

১- এমন ক্রোধ যা মানুষকে বীরত্ব, দ্বীন ও মুসলিম সম্ভ্রমের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং খারাপ ও ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট হতে মুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরণের ক্রোধ প্রশংসনীয় ও কাঙ্খিত। আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে সহীহ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, (পর্দার ভেতরে কুমারীদের চেয়েও নবী সাঃ বেশী লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তার কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তার চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম।)[৩] যখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ রাসূল সাঃ নিকট এক ব্যক্তির এই বক্তব্য পৌছালেন (এ বন্টনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি।) তখন তা তার জন্য কষ্টকর হল, তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং রাগান্বিত হলেন। কিন্তু তারপরও শুধু এটুকুই বললেন: (মূসা আঃ কে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।)[৪] আবার তিনি যখন এমন কিছু দেখতেন বা শুনতেন যা আল্লাহ অপছন্দ করেন তখন রাগান্বিত হতেন এবং সে বিষয়ে কথা বলতেন, চুপ থাকতেন না। তিনি একবার আয়েশা রাঃ গৃহে প্রবেশ করলেন, অতঃপর একখানা পর্দা দেখলেন যাতে ছবি ছিল। তা দেখে নবী সাঃ এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর বললেন: (কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ঐসব লোকের যারা এ সব ছবি অঙ্কণ করে।)[৫] মুগিরা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু উবাদা রাঃ বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পরপুরুষকে দেখি তাহলে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ (তোমরা কি সা'দ এর আত্নমর্যাদাবোধে বিস্মিত হচ্ছ? আমি ওর চেয়েও বেশি আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি আত্মসম্মানের অধিকারী।)[৬]

২- কাপুরুষতা, আত্মমর্যাদাবোধ না থাকা এবং খারাপ ও লাঞ্ছনাকর বিষয়ে চুপ থাকার ফলস্বরূপ মানুষের মাঝে যে ক্রোধহীনতার সৃষ্টি হয় তা প্রত্যাখাত ও অপ্রশংসনীয়।

৩- মানুষের ক্রোধ তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে। ফলে তার পরিমাপের বাইরে চলে যাবে এবং তার শিরাগুলো ফেঁপে উঠবে, যার দরুন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তার জিহ্বা দিয়ে অশ্লীল শব্দ বের হবে ও হাত সঠিক স্থানের বিপরীতে গিয়ে পড়বে এবং ক্রোধের ফলে তার ফয়সালার ক্ষেত্রে জুলুম করবে, সহনশীলতার অংশ তার মাঝ থেকে হারিয়ে যাবে এবং সে বিবেক বহির্ভুত কথা বলবে। নবী সাঃ বলেছেন: (প্রকৃত বীর সে নয়, সে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, সে ক্রোধের সময় নিজেকে

(১) ফাওয়ায়েদ ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়া, পৃঃ (১৫৬)।
(২) আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া পৃঃ (২৫২)।
(৩) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/১১০, হাঃ ৬১০০), সহীহ মুসলিম (২/৭৩৯, হাঃ ১৪১-১০৬২)।
(৫) সহীহ বুখারী (৪/১১১)।
(৬) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।)[১] আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল: আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন: তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার একই কথা বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বারেই বললেন: রাগ করো না।)[২]

ক্রোধের বিপদসমূহঃ

১- ক্রোধ হল বিভিন্ন বিষয়ে অমনোযোগিতার দ্বার; কেননা তা বিভিন্ন বিষয়ের শেষপরিণতি অনুধাবনে বিবেক ও বিচক্ষণতার পথগুলো বন্ধ করে দেয় এবং অমনোযোগিতার কারণগুলো উন্মুক্ত করে। তখন মানুষ অন্যমনষ্ক ও রক্ত গরম থাকা অবস্থায় কাজ করে। যার ফলে হয়ত কাউকে হত্যা করে বা কাউকে স্পর্শ করে বা পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে, কখনো বা জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এমন কথা বলে যার কারণে ক্রোধ দমে যাওয়ার পর অনুতপ্ত হয়; কিন্তু সে সময় অনুতাপ কোন কাজে আসে না।

২- অনুপোযুক্ত স্থানে চরমভাবে রেগে যাওয়া মানুষের মর্যদা, গাম্ভীর্য ও প্রভাব কমিয়ে দেয়; যেহেতু ক্রোধান্বিত ব্যক্তির মাঝে ভয়ঙ্কর আকৃতি অঙ্কিত হয়। যেমন শিরা ফেপে উঠা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং তার শরীরের অস্বাভাবিক নড়াচড়া, এর সাথে তার মুখ থেকে অশালীন বাক্য বের হওয়া।

৩- ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা তাকে ক্রোধ সংবরণ করার প্রতিদান হতে বঞ্চিত করবে। নবী সাঃ বলেছেন: (প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্তেও যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সম্মুখে ডাকবেন এবং যে হুরকে সে চায় তাকে গ্রহণের ইখতিয়ার দিবেন।)[৩]

প্রতিকারমূলক পরিপালনের রূপরেখা

ক্রোধের প্রতিকারমূলক পরিপালনের রূপরেখা নিম্নরূপঃ

১- মানুষ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যেমনটি ঐ ব্যক্তির হাদিসে এসেছে যার রাগ বেড়ে গেছিল, তখন নবী সাঃ বলেছিলেন: (আমি এমন একটি দোয়া জানি, যদি লোকটি পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে "আউযূবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম" আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।)[৪]

২- মানুষ তার অবস্থার পরিবর্তন করবে। নবী সাঃ বলেছেন: (যদি তোমদের কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তবে সে যেন বসে পড়ে। যদি এতে রাগ চলে যায়, তবে ভাল; নয়তো সে শুয়ে পড়বে।)[৫]

৩- একজন মুসলিম ক্রোধ সংবরণকারীদের ফযিলতের কথা স্মরণ করবে। মহান আল্লা তাদের প্রশংসা করে বলেন: [﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

(১) সহীহ বুখারী (৪/১১২, হাঃ ৬১১৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০১৪, হাঃ ১০৭-২৬০৯)।
(২) সহীহ বুখারী (৪/৯১২, হাঃ ৬১১৬)।
(৩) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৩৭-১৩৮, হাঃ ৪৭৭৭), সুনানে তিরমিযি (৪/৩২৬-৩২৭, হাঃ ২০২১), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৪) সহীহ বুখারী (৪/১১২, হাঃ ৬১১৫)।
(৫) মুসনাদে আহমাদ (৫/১৫২), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আল-জামে আস-সগীর (৬৯৪)।

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٣٥ [যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন; আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।][১] নবী সাঃ বলেছেন: (প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্তেও যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সম্মুখে ডাকবেন এবং যে হুরকে সে চায় তাকে গ্রহণের ইখতিয়ার দিবেন।)[২] তিনি আরো বলেছেন: (আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।)[৩]

৪- একজন মানুষ স্মরণ করবে ও চিন্তা করবে ক্রোধের সময় সহনশীল ব্যক্তির অবস্থা এবং রাগান্বিত ব্যক্তির অবস্থা। প্রথমজনের প্রতি মানুষের হৃদয় ও আত্মা স্নেহশীল ও আকৃষ্ট হয়। আর দ্বিতীয়জনের থেকে বিবেকবানরা দূরে থাকে এবং মানুষেরা তার কর্ম থেকে বেঁচে চলে।

---

(১) সূরা আলে ইমরানঃ (১৩৪-১৩৫)।
(২) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) সুনানে ইবনে মাজাহ (২/১৪০১, হাঃ ৪১৮৯), মুসনাদে আহমাদ (১/৩২৭) (২/১২৮), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

ধারণা পোষণ করা

খারাপ ধারণা পোষণ করার অর্থঃ

ধারণা হল: কোন বিষয়ে উত্থাপিত সন্দেহ, পরবর্তীতে সে সন্দেহকে বাস্তাবায়ন করা ও দৃঢ় করা।[১]

ধারণা হল, পরিবার আত্মীয় ও সাধারণ মানুষকে অযাচিতভাবে অপবাদ দেয়া ও বিশ্বাসঘাতকতা করা।[২]

ইসলাম খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে নিষেধ করেছে, যার বর্ণনা আল্লাহর কিতাব নবী সাঃ এর সুন্নাতে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ﴾] [হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ।][৩] তিনি আরো বলেন: [﴿وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا ٢٨﴾] [অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে; আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনই কাজে আসে না।][৪]

নবী সাঃ বলেছেন: (তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হতে বেঁচে থাক। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।)[৫] সুতরাং কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র ধারণা ও অনুমানের বশবর্তী হয়ে কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা, অপবাদ দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। খাত্তাবী রহঃ বলেন: আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণা এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হল যা ধারণাকৃত বস্তুর ক্ষতি করে সে ধরণের ধারণার বাস্তবায়ন পরিত্যাগ করা। অনুরূপভাবে অন্তরে দলীল বিহীন যা কিছু উদিত হয় তাও উদ্দেশ্য; কেননা মানুষের মনে সৃষ্ট প্রাথমিক ধারণা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যা করতে সক্ষম নয় তা করতে বাধ্য করা হয় না।[৬]

ধারণা পোষণ করার কারণসমূহঃ

১- কোন ব্যক্তির থেকে আশঙ্কা করা: এটা অনেক সময় মানুষকে সন্দেহ ও তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অপবাদের মধ্যে নিপতিত করে। ফলে তার কথা ও কাজকে অপব্যাখ্যা করে।

২- কোন ব্যক্তির সম্পর্কে শ্রুত গল্প বা কথা যা সাধারণত সত্য নয় তার আলোকে ভুল কল্পনা। তাই সে তার সাধারণ কাজকে খারাপ অর্থে প্রয়োগ করে।

৩- অপশিক্ষা, তার এমন এক পরিবেশে বসবাস করার কারণে যেখানে মানুষের চলাফেরাকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ফলে তার মাঝে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব থেকে সে খারাপ ধারণাসমূহ প্রবেশ করে। ফলস্বরূপ তার চরিত্র এ খারাপ আচরণে অভ্যস্ত হয়।

---

(১) আন-নিহায়া ফি গারিবীল হাদিস (৩/১৬৩)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/২২৭)।
(৩) সূরা আল-হুজুরাতঃ (১২)।
(৪) সূরা আন-নাজমঃ (২৮)।
(৫) সহীহ বুখারী (৪/১০৩, হাঃ ৬০৬৪)।
(৬) ফাতহুল বারী (১০/৪৮১)।

৪- অন্যদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে অন্তর পরিপূর্ণ থাকা যা তাকে আর চারপাশের সকল মানুষ সম্পর্কে বা কিছু মানুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণে উৎসাহিত করে।

৫- সন্দেহজনক ও অপবাদমূলক স্থানে প্রকাশ পাওয়া যাদিও তা অনিচ্ছায় হয়, এটা অন্যদেরকে তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতে অনুপ্রাণিত করে। কেননা তারা তার কারণ সম্পর্কে অবগত নয়। তাই ইসলাম সন্দেহপূর্ণ স্থান থেকে নিষেধ করেছে। নবী সাঃ বলেন: (হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানেনা। যে ব্যাক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে রক্ষা করতে পারবে।)[১]

৬- খারাপ ধারণার কুপ্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা: তার ফলে সৃষ্ট পাপ ও সামাজিক বিছিন্নতা।

বিপদসমূহঃ

খারাপ ধারণার মারত্মক কুপ্রভাব রয়েছে ধারণা পোষণকারী ও যার বিষয়ে ধারণা করা হয় তার উপর। কখনো তা সমাজের উপরও প্রভাব ফেলে। সংক্ষেপে খারাপ ধারণার বিপদসমূহ নিম্নরূপঃ

১- খারাপ ধারণা পোষণকারীর উপর পাপ অর্পিত হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ﴾] [নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ।][২]

কাজেই যার ব্যাপারে ধারণা করা হচ্ছে তার থেকে যদি ভাল ও কল্যাণকামিতা লক্ষ্য করা যায় এবং বাহ্যিকভাবে তার আমানতদারিতা দেখা যায়, তবে তার ক্ষেত্রে খারাপ ও খিয়ানতের ধারণা করা হারাম।[৩]

২- মানুষ এ ধরণের চরিত্রের লোকদেরকে অপছন্দ করে, তারা তার সন্দেহ ও ধারণাকে ভয় করে এবং তার সাথে আলাপচারিতা এড়িয়ে চলে, এ আশঙ্কায় যে, হয়ত তারা অনিচ্ছায় কোন ভুল করবে, পরবর্তীতে তা খারাপ অর্থে প্রয়োগ করা হবে। অনেক সময় সফরে তার সঙ্গী হওয়াকে অপছন্দ করা হয়; তার খারাপ ধারণার ভয়ে।

৩- আবার অনেক সময় খারাপ ধারণা তাকে অন্যদের সাথে গোয়েন্দাগিরি করে তাদের গোপন অবস্থা নির্ণয়ে উদ্বুদ্ধ করে; যার ফলে সে অন্যান্য খারাপ চরিত্রের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

৪- অনেক সময় খারাপ ধারণা অপবাদকে সত্যরূপে বা প্রায় সত্যরূপে ছড়িয়ে দিতে আগ্রগামী করে। যার ফলে ধারণাকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে অপবাদ রটানো হয় অথচ তিনি তা থেকে মুক্ত। অনেক সময় এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়, যার কারণে তার সম্ভ্রমহানী হয়।

৫- ধারণাকৃত ব্যক্তির অযাচিত অপবাদ প্রচার করা, ধারণাকারী ও ধারণাকৃত ব্যক্তি এবং সমাজের অন্যান্যদের মাঝে বিদ্বেষ পোষণ ও সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়, যার ফলে সমাজে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়।

৬- খারাপ ধারণা পোষণকারীর মাঝে উদ্বেগ-অস্থিরতার সৃষ্টি; কেননা সে অন্যদের কর্মকাণ্ডকে অপব্যাখ্যা করে, যা তাকে তাদের আচরণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে ও সেগুলোকে খারাপ অর্থে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে তার মনের মাঝে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

প্রতিকারমূলক দিকনির্দেশনাঃ

---

(১) সহীহ বুখারী (১/৩৪, হাঃ ৫২)।
(২) সূরা আল-হুজুরাতঃ (১২)।
(৩) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন(১৬/২১৭)।

১- মানুষকে সুদৃঢ় আক্বীদার গোড়ে তোলা, যা তাদেরকে প্রশংসনীয় চরিত্র গ্রহণে এবং নিন্দিত চরিত্র বর্জনে সক্ষম করে তুলবে। আর খারাপ চরিত্র থেকে অন্তরকে পুতঃপবিত্র করবে।

২- মানুষ খারাপ ধারণা পোষণ করার পাপের বিষয়ে জেনে তা থেকে বিরত থাকবে।

৩- অন্যদের বক্তব্যকে কোন প্রকার অপব্যাখ্যা ছাড়াই যথাসম্ভব ভাল অর্থে প্রয়োগ করবে। যেমনটি উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেছেন: (তোমার ভায়ের মুখ থেকে নির্গত কোন শব্দকে ভাল অর্থে প্রয়োগ করো, যতক্ষণ তুমি সেটাকে ভাল অর্থে প্রয়োগে সুযোগ পাও।)[১]

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/২২৭)।

অহঙ্কার করা

অহঙ্কারের অর্থঃ

আভিধানিক অর্থঃ

আরবী কিবর, তাকাব্বুর ও ইস্তেকবার (الكبر ، والتكبر ، والاستكبار) এর অর্থ কাছাকাছি। আর এটা এমন অবস্থা যখন মানুষ নিজেকে নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে; নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করার মাধ্যমে। সবচেয়ে জঘন্য অহঙ্কার হল আল্লাহর উপর অহঙ্কার করা; হক গ্রহণ ও আল্লাহর ইবাদত পালন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। অহঙ্কার দুইভাবে হয়ে থাকেঃ

একঃ মানুষ বড় হওয়ার পথ অনুসন্ধান করবে। এটা যদি আবশ্যকীয় বিষয়ে ও আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে হয় তবে তা প্রশংসনীয়।

দুইঃ সে আত্মতুষ্টি প্রকাশ করবে। ফলে সে নিজের ব্যাপারে এমন কিছু প্রকাশ করবে যা তার মাঝে নেই। আর এটা নিন্দনীয়।[১]

পারিভাষিক অর্থঃ

অহঙ্কারের পারিভাষিক অর্থ রাসূল সাঃ এই হাদিস থেকে সুস্পষ্ট হয়, তিনি বলেছেন: (যার অন্তরে অণু পরিমান অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যাক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহঙ্কার? রাসুল সাঃ বললেনঃ আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। **অহঙ্কার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।**)[২]

হাদিসে বর্ণিত (غمط) শব্দের অর্থ হল, কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা। এবং (بطر الحق) এর অর্থ হল, আত্মম্ভরিতার কারণে সত্যকে প্রতিরোধ করা ও অস্বীকার করা।[৩] অহঙ্কার হল একটি গোপন চরিত্র, আর তার কর্ম হল এর ফল; তাই এর উৎস হল নিজের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা।[৪]

ইমাম নববী বলেন: অহঙ্কার হল, মানুষের উপর নিজেকে বড় মনে করা ও তাদেরকে তুচ্ছ মনে করা এবং সত্যকে প্রতিহত করা।[৫]

অহঙ্কার প্রকাশের কারণসমূহঃ

১- ব্যক্তির ঈমানের দুর্বলতা ও তার এ জ্ঞানের অভাব যে, অহঙ্কার একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং এটা কোন সৃষ্ট জীবের জন্য উপযুক্ত নয়।

---

(১) আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন পৃঃ (৪২১)।
(২) সহীহ মুসলিম (১/৯৩, হাঃ ১৪৭/৯১)।
(৩) শরহু সহীহ মুসলিম লিন নববী (২/৯০)।
(৪) আল-খুলুকুল কামেল (৪/৩৭৮)।
(৫) শরহু সহীহ মুসলিম লিন নববী (২/৯১)।

২- আত্মঅহমিকা বা আমিত্ববাদের মন্দ প্রভাব ও চরম পরিণতি রয়েছে। এটাই অহঙ্কার ও গর্বের মধ্যে নিপতিত হওয়ার পথ। আত্ম-অহমিকাবোধের কতগুলো কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে সমচেয়ে শক্তিশালী কারণ হল, নিকট লোকদের দ্বারা অত্যাধিক প্রশংসা ও চাটুকারদের তোষামোদি; যারা মুনাফেকীকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করেছে।[১]

বিবেক যত লোপ পায় চিন্তা-ভাবনা ও বোধশক্তি তত হ্রাস পায় এবং ঐ ব্যক্তি নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিবেকবান ভাবতে থাকে।[২] আবার কখনো আত্ম-অহমিকা মানুষের মাঝে সুপ্ত থাকে, অতঃপর যখন সে কিছু সম্পদ বা মর্যাদা অর্জন করে তখন তা তার মাঝে প্রকাশ পায় এবং তার বিবেক এটা দমিয়ে ও গোপন রাখতে অপারগ হয়।[৩] আর জ্ঞানের পূর্ণতা তো শরয়ী ইলমের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম।

৩- বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের উপর নিজেকে বড় মনে করা এবং সমাজে তার অবস্থানের কারণে গর্ববোধ করা।[৪] আর এটা মনের মাঝে সুপ্ত অহঙ্কারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য।

৪- অহঙ্কারীর মনের মাঝে অনুভূত ত্রুটি ও জ্ঞানের ঘাটতিকে গোপন করার আগ্রহ। তাই সে আগ্রহী থাকে নিজেকে মানুষের চোখে বড় হিসেবে প্রকাশ করতে এবং তাদের নিকট তার ত্রুটি যেন প্রকাশ না পায়।[৫]

চরম ঘাটতি আচরণে এমন প্রভাব তৈরী করে যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয় বা তা স্বীকার করে নেওয়াও সহজ নয়। যেহেতু সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন সে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যার ফলে তার মাঝে আত্ম-অহমিকার সৃষ্টি হয়।

৫- অনুরূপভাবে এর আরেকটি বড় কারণ হল কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা এবং সমপর্যায়ের লোকদের সাথে উঠাবসা কম করা।[৬]

অহঙ্কারের প্রকারভেদঃ

১- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর অহঙ্কার করা। এটা সর্বনিকৃষ্ট ও ঘৃণীত প্রকার; কেননা তা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবকে অস্বীকার করা এবং সৃষ্টজীবের প্রতি স্রষ্টার নিয়ামত অমান্য করা। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ﴾] [তবে কি যখনি কোন রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনি তোমরা অহংকার করেছ?][৭] তিনি আরো বলেন: [﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾﴾] [আর যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা

---

(১) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন পৃঃ (২৩৯)।
(২) আল-আখলাক ওয়াস সিয়ার, পৃঃ (৭৬)।
(৩) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৭৬)।
(৪) আল-আখলাকুল েইসলামিয়া ওয়া উসুসুহা (১/৭১৮)।
(৫) পূর্বোক্ত।
(৬) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন পৃঃ (২৩৯)।
(৭) সূরা আল-বাকারাঃ (৮৭)।

আমাদের রবকে দেখি না কেন? তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।][১]

ইবলিস তো আদাম আঃ কে সিজদা করা হতে বিরত ছিল অহঙ্কারের কারণেই-এটা ছিল সম্মানসূচক সিজদা ইবাদত হিসেবে সিজদা নয়- ফলে সে কাফেরদের অন্তর্গত হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٤﴾] [আর স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।][২]

২- মানুষের উপর গর্ববোধ করা, তাদেরকে ছোট মনে করা এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা; নিজের শারিরিক, অর্থগত বা জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে। তাই সে স্বীয় মনে বড়ত্ব অনুভব করে এবং অন্যরা তার চেয়ে ছোট, যদিও তারা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদার কারণে শ্রেষ্ঠ হোক না কেন। আর এটিই পার্থিব জাতিগত বর্ণবাদের সূচনা। ইসলাম এ থেকে নিষেধ ও সতর্ক করেছে। বিষয়টি রাসূল সাঃ এর এই হাদিসের দিকনির্দেশনা থেকে স্পষ্ট হয়, তিনি বলেন: (আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। এমনকি কেউ যেন কারো উপর গর্ব না করে এবং কেউ যেন কারো উপর সীমালঙ্ঘন না করে।)[৩]

সর্বনিকৃষ্ট অহঙ্কার হল, যে ব্যক্তি মানুষের উপর স্বীয় জ্ঞান নিয়ে গর্ব করে ও মর্যাদার কারণে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কেননা এ ধরণের লোক তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। কারণ যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য ইলম অন্বেষণ করে, ইলম তাকে বিনয়ী করে, তার হৃদয় নম্র হয়, আত্ম প্রশান্ত হয় এবং সে নিজেকে পর্যাবেক্ষণ করে। তাই কোন ধরণের উদাসীনতা করে না এবং সর্বাস্থায় তার মূল্যায়ন করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কেউ তার মনের ব্যাপারে উদাসীন থাকে তবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাবে।[৪]

৩- মানসিক অহঙ্কারঃ তা হল পোষাকে গর্ব ও অহঙ্কার অনুভব করা। সে হয়ত মানুষের সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না বরং তাদের সাথে নম্র আচরণ করে, কিন্তু সে পোষাকে অহমিকা দেখায়। এটা তাকে অনেক সময় নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে উদ্বুদ্ধ করে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেন: (এক ব্যাক্তি চিত্তাকর্ষক এক জোড়া কাপড় পরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পথ চলছিল; হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে নিচের দিকে ধ্বসে যেতে থাকবে।)[৫] মহান আল্লাহ এ ধরণের আচরণ থেকে নিষেধ করে বলেন: [﴿وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ ١٨﴾] [আর তুমি মানুষের প্রতি অবজ্ঞাভরে তোমার গাল বাঁকা কর না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।][৬]

(১) সূরা আল-ফুরকানঃ (২১)।
(২) সূরা আল-বাকারাঃ (৩৪)।
(৩) সহীহ মুসলিম (৪/২১৯৮-২১৯৯, হাঃ ৬৪/২৮৬৫)।
(৪) যাহাবী রচিত, আল-কাবায়ের, পৃঃ (৭৬)।
(৫) সহীহ বুখারী (৪/৫৪, হাঃ ২০৮৮)।
(৬) সূরা লোকমানঃ (১৮)।

তা হল কোন প্রকার কারণ ও প্রয়োজন ছাড়াই আনন্দের সাথে চলা। এ ধরণের চরিত্রের অধিকারীরা সর্বদা অহঙ্কার ও গর্বের সাথে চলে।(১) এর অর্থ এই নয় যে, সুন্দর পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করা হচ্ছে কিন্তু নিষিদ্ধ হল অহঙ্কার, গর্ব ও অহমিকা বোধ করা।

রাসূল সাঃ বলেছেন: (যার অন্তরে অণু পরিমান অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যাক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহঙ্কার? রাসুল সাঃ বললেনঃ আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। **অহঙ্কার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।**)(২)

এই খারাপ চরিত্র থেকে নিষেধ করার পর চলার ক্ষেত্রে তার বিকল্প উত্তম চরিত্রের রূপরেখা অঙ্কন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩﴾] [আর তুমি তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।](৩)

কুরতুবী রহঃ বলেন: অর্থাৎ এ ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন, কাজেই আপনি মুমূর্ষ ব্যক্তির ন্যায় ধীরে চলবেন না এবং ধূর্ত লোকের মত দ্রুত চলবেন না।(৪)

তবে নবী সাঃ এর থেকে যে বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি যখন হাটতেন তখন দ্রুত চলতেন এবং আয়েশা রাঃ হতে উমর রাঃ এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনিও হাটার সময় দ্রুত চলতেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা মুমূর্ষ ব্যক্তির মত ধীরে চলতেন বরং তার চেয়ে দ্রুত চলতেন।(৫)

অহঙ্কারের বিপদসমূহঃ

১- সত্য বঞ্চিত হওয়া এবং অন্তর আল্লাহর আয়াতসমূহ বুঝতে ও তার বিধানসমূহ অনুধাবন করতে অন্ধ হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿سَأَصۡرِفُ عَنۡ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلرُّشۡدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلۡغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَٰفِلِينَ ١٤٦﴾] [যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।](৬) তিনি আরো বলেন: [﴿ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡۖ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلۡبِ مُتَكَبِّرٖ جَبَّارٖ ٣٥﴾] [যারা নিজেদের কাছে (তাদের দাবীর সমর্থনে) কোন দলীল-প্রমাণ

(১) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (১৪/৪৮)।
(২) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) সূরা লোকমানঃ (১৯)।
(৪) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (১৪/৪৮)।
(৫) পূর্বোক্ত।
(৬) সূরা আল-আরাফঃ (১৪৬)।

না আসলেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণার যোগ্য। এভাবে আল্লাহ মোহর করে দেন প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে।][১]

২- আল্লাহর ক্রোধ ও ঘৃণায় নিপতিত হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡتَكۡبِرِينَ ٢٣﴾] [এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে আর যা প্রকাশ্যে করে, তিনি অহঙ্কারীদেরকে ভালবাসেন না।][২]

৩- অহঙ্কারীকে মানুষ ঘৃণা করে ও অপছন্দ করে, যেহেতু সে নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করে ও অন্যদের মর্যাদাহানী করে, সেহেতু তার বিপরীতে তারা তাকে ঘৃণা করে ও ভালবাসে না। কেউ কেউ যদিও তার সাথে ভদ্রতা দেখায়, তারা মূলত তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা করে, অথবা দুনিয়ার কোন কিছু পাওয়ার আশায় করে, পেয়ে গেলে তার থেকে দূরে সরে যাবে। এটা তাকে মানসিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়; যখন সে লক্ষ্য করে যে মানুষেরা তার সাথে তাদের প্রয়োজনের জন্য সৌজন্যমূলক আচরণ করছে, যখন তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন তারা তার নিকট হতে পলায়ন করবে যেমনভাবে অস্ত্রের আওয়াজ শুনে পাখি তার বাসা থেকে পলায়ন করে। যেমনটি ঐ সমস্ত লোকদের অবস্থা হয়ে থাকে যারা চাকুরী জীবনে ছিল অহঙ্কারী তাদের যখন অবসরে পাঠানো হয়। যদি অহঙ্কারীরা এদের অবস্থা দেখে শিক্ষা নিত!

মাওরদী বলেন: অহঙ্কার ঘৃণার সৃষ্টি করে, ঐক্য বিনষ্ট করে ও বন্ধুদের অন্তরকে উত্তেজিত করে, খারাপ দিক বর্ণনায় এগুলোই যথেষ্ট।[৩]

৪- অহঙ্কারীর নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ও সেগুলোকে সংশোধন না করা। কেননা তার ইন্দ্রিয়গুলো অহঙ্কার, গর্ব, অহমিকা ও গৌরবের মাধ্যে বাঁধা। তারা মনে তারা ভাল কাজ করছে অথচ তারা অহমিকার ভ্রষ্টতায় পথহারা। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤﴾] [বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জনাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে।][৪]

(১) সূরা গাফেরঃ (৩৫)।
(২) সূরা আন-নাহলঃ (২৩)।
(৩) আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন পৃঃ (২৩৯)।
(৪) সূরা আল-কাহাফঃ (১০৩-১০৪)।

প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনা

অহঙ্কারের জন্য প্রতিকারমূলক পরিপালনগত দিকনির্দেশনাগুলো হলঃ

১- মানুষ অহঙ্কারের অসীম গুনাহ ও শাস্তির কথা স্মরণ করবে। আর এও স্মরণ করবে যে অহঙ্কারী আল্লাহর চাদর নিয়ে বিতর্ককারীর মত। রাসূল সাঃ আল্লাহ তায়ালা থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ বলেন (হাদিসে কুদসী): (অহঙ্কার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গী স্বরূপ। কেউ এ দু'টির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।)[১] রাসূল সাঃ বলেছেন: (যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।)[২] তিনি আরো বলেন: (আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা দুর্বল এবং অসহায়; কিন্তু তারা যদি কোন ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম করে বসেন, তাহলে তিনি তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না? তারা রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী।)[৩]

২- সে আল্লাহর নিকট বিনয়ী ব্যক্তির প্রতিদান ও তার জন্য প্রস্তুতকৃত নিয়ামতের কথা স্মরণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾] [এটা আখেরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।][৪]

রাসূল সাঃ বলেছেন: (সাদকাহ করলে মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা (ক্ষমাকারীর) সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কেউ আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য বিনয়ী হলে, আল্লাহ তাকে উচ্চ করেন।)[৫]

৩- সে ঔদ্ধত্য অহঙ্কারীদের সাথে উঠাবসা করবে না, যারা মানুষের হৃদয়কে নষ্ট করে দেয় এবং তাদেরকে এমন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে যা অন্তরের ক্ষতি করবে কোন উপকার করবে না; কারণ কেউ কারো সাথে উঠাবসা করলে তাদের সাদৃশ্য ধারণ করে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।)[৬] পক্ষান্তরে সৎকর্মশীল বিনয়ীদের সাথে উঠাবসা করলে মানুষ বিনয়ী হয়।

৪- মানুষ তার আসল সৃষ্টিরহস্যে ও পেটে যা বহন করছে সেদিকে দৃষ্টি দিবে, যদি সে তা অনুধাবন করতে পারে তবে সে অহমিকা মুক্ত থাকবে। এজন্য কুরআনূল কারীম আমাদের মূল সৃষ্টির দিকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ ﴾]

---

(১) সহীহ মুসলিম (৪/২০২৩, হাঃ ১৩৬/২৬২০)। সুনানে আবু দাউদ (৪/৩৫১, হাঃ ৪০৯০)।
(২) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) সহীহ বুখারী (৩/৩১৫, হাঃ ৪৯১৮), সহীহ মুসলিম (৪/২১৯০, হাঃ ২৮৫৩)।
(৪) সূরা আল-কাসাসঃ (৮৩)।
(৫) সহীহ মুসলিম (৪/২০০১, হাঃ ৬৯/২৫৮৮)।
(৬) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৬৮, হাঃ ৪৮৩৩), সুনানে তিরমিযি (৪/৫০৯, হাঃ ২৩৭৮)। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[অতএব মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিৎ, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।][১]

৫- বিবেকবান সম্ভ্রান্ত সৎলোকদের নিকট অহঙ্কারীদের অবস্থা ও তাদের সামাজিক অবস্থানের বিষয়ে চিন্তা করবে।

৬- মানুষের সবশেষ প্রত্যাবর্তন স্থলের বিষয়ে চিন্তা করবে; মৃত্যু ও তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে স্মরণ করা এবং কবর যিয়ারত করার মাধ্যমে। কেননা তা হৃদয়কে নরম ও কোমল করে। নবী সাঃ বলেছেন: (…তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।)[২]

(১) সূরা আত-ত্বরেকঃ (৫-৭)।
(২) সহীহ মুসলিম (২/৬৭১, হাঃ ১০৮/৯৭৬)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ

চারিত্রিক বিচ্যুতির কারণসমূহঃ

প্রকৃতি ও পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে চারিত্রিক বিচ্যুতিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ব্যক্তি ও সমাজের উপর তার বিপদ ও ক্ষতির ভিত্তিতে এর প্রভাব কম বেশি হয়ে থাকে। অপর দিক থেকে সমাজের ভিন্নতার কারণেও চারিত্রিক বিচ্যুতির ভিন্নতা হয়ে থাকে; বিচ্যুতির উপকরণসমূহের শক্তির তারতম্যে কারণে। যেমন দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের দূর্বলতা, বিচ্যুত আক্বীদা, সামাজিক প্রতিপালন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতি স্নায়ু যুদ্ধের প্রভাব, লালন-পালনের ধরণ ইত্যাদি অন্যান্য উপকরণসমূহ। যখন এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব বেড়ে যায় তখন বিচ্যুতির পরিমাণও বৃদ্ধি পায় এবং তা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে।

মানুষের চারিত্রিক বিচ্যুতির কারণ হিসেবে কোন একটি নির্দিষ্ট কারণকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে এ কারণগুলো তার প্রভাবের শক্তি বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এগুলোর প্রতিরোধ বা গুরুত্বারোপ জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট দিকের উপর ভিত্তি করে সম্ভব নয়।[১] কেননা বিচ্যুতির কারণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন, উদাহরণস্বরূপ সন্তানের উপর পিতার ইতিবাচক বা নেতিবাচক আচরণের প্রভাব রয়েছে। যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিতরাতের উপর। এরপর তা মা-বাপ তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে।)[২] অনুরূপভাবে বন্ধুর উপর বন্ধুর প্রভাব রয়েছে, যেমনটি রাসূল সাঃ বলেছেন: (মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।)[৩]

কাজেই বিচ্যুতির ঘটনাটি অবশ্যই একাধিক কারণের ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরী হতে হবে এবং বিচ্যুতির ঘটনাটি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যেন এটি একটি আক্বীদাগত, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এব পরিপালনগত ইত্যাদি সমস্যার সাথে সম্পর্কিত সকল কিছু নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়।[৪]

সুতরাং চারিত্রিক বিচ্যুতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কারণগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। কেননা মূল কারণ জানা গেলে চিকিৎসা দেয়া ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হয়।

এই পরিচ্ছেদে আমরা যে কারণগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করব সেগুলো হল:

১- দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের অভাব।

২- মনস্তাত্ত্বিক অসঙ্গতি।

৩- আর্থিক কারণসমূহ।

---

(১) আত-তারবিয়া ইসলামিয়া ওয়া দাওরুহা ফি ইলাজিল আহদাসিল জানেহীন, পৃঃ (৩৭২)।
(২) পূর্বে তাখরিজ উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৬৮, হাঃ ৪৮৩৩), সুনানে তিরমিযি (৪/৫০৯, হাঃ ২৩৭৮)। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
(৪) আস-সুলুকীল ইজরামী ওয়াত তাফসীরুল ইসলামী, পৃঃ (১৫৮-১৫৯)।

৪- সামাজিক পরিবেশ।

প্রথমতঃ দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের অভাবঃ

নিঃসন্দেহে দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের অভাব চারিত্রিক বিচ্যুতির অন্যতম ও প্রধান কারণ। কেননা এ অবস্থায় মানুষ হঠাৎ মৃত্যু বা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। সুতরাং সেই দিনের উপভোগে তার চিন্তা নিবদ্ধিত যা প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে, ভোগের গণ্ডিতে এবং বিচ্যুতির স্রোতের অধীনে; যা তাকে ডানে বামে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাইতো তার নিকট ভাল-মন্দ একাকার হয়ে গেছে। আর তার চাহিদের স্রোত যেদিকে প্রবাহিত করে সে সেই প্রবাহের অধীন। ফলে তা তাকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। ফলস্বরূপ তার মাঝে উদাসীনতা, মন্দ চিন্তা ও বিকৃত আচরণের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যা তার জন্য বিচ্যুত আচরণ করা ও তার দিকে অগ্রসর হওয়াকে সহজ করে দেয়। নিচের পয়েন্টগুলো থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবেঃ

বিচ্যুতি ও উদাসীনতাঃ

উদাসীনতা হল: অসতর্কতার দরুণ মানুষের মাঝে যে অন্যমনস্কের সৃষ্টি হয়।(১) যখন মানুষের এরূপ অবস্থা হয় তখন তার মাঝে দ্বীনি নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায়। আর মানুষের নিকট যখন দ্বীনি নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায় তখন তার ইন্দ্রীয়গুলোকে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য তথা ভাল কাজ, সত্য শ্রবণ, জ্ঞানার্জন ও সতর্কতায় ব্যবহারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সে চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ ١٧٩﴾] [আর আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল।](২) মহান আল্লাহ আরো বলেন: [﴿وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٦ يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَٰفِلُونَ ٧﴾] [এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যাতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে গাফিল।](৩) অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার উপার্জন বিষয়ক জ্ঞান আছে। কাজেই তারা তা অর্জনে অধিক মেধাবী কিন্তু দ্বীনি বিষয় এবং পরকালে যা তাদের উপকারে আসবে সে বিষয়ে তারা গাফিল।(৪)

সুতরাং এটাই তার পথ ও পন্থা। কেননা শয়তান তার বন্ধু। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ٣٦﴾] [আর যে রহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।](৫) অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে হেদায়াতের পথ থেকে

(১) আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন পৃঃ (৩৬২)।
(২) সূরা আল-আরাফঃ (১৭৯)।
(৩) সূরা আর-রূম (৬-৭)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৪৩৭)।
(৫) সূরা আয-যুখরুফঃ (৩৬)।

গাফিল ছিল, আমি তার জন্য শয়তানকে নিযুক্ত করে দিব, যে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে।[১]

যে সমস্ত কারণ মানুষকে গাফলতির দিকে নিয়ে যায় তার অন্যতম হল, জায়েয কাজে শিথিলতা ও অধিক পরিমাণে তাতে মগ্ন থাকা। ফলে তা গাফলতির অবির্ভাব ঘটায়, যা অধিক আশাবাদী হওয়ার কারণ। ফলস্বরূপ সে পাপ কাজের দিকে অগ্রসর হয়।[২]

এ সকল গাফেলরা তাদের গাফলতির প্রভাবে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হয় না। ফলে তাদেরকে দেখবেন যে, তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, তা উপভোগ করছে ও তাতেই তারা আনন্দিত।

আর এ সবগুলোই হয়ে থাকে অন্তরে দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের বা একেবারে নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে।

দ্বীন নষ্ট হয় হয়ত বাতিল বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী কথা বলার কারণে অথবা বিশ্বাসের বিপরীত আমল করার কারণে। প্রথম ধরণ হল বিদআত, আর দ্বিতীয় ধরণ হল, ফাসেকী আমল। প্রথমটি হয়ে থাকে সন্দেহের কারণে আর দ্বিতীয়টি হয়ে থাকে প্রবৃত্তির কারণে।[৩] ইসলামী শিক্ষার ভুমিকা হল ভুল বিশ্বাসের রাস্তাকে বিশুদ্ধ করা যেন মানুষেরা সঠিক আচরণের দিকে ফিরে আসে। কেননা মানুষের অন্তরে একনিষ্ট দ্বীন ও বিশুদ্ধ আকিদা না থাকলে তার অকল্যাণ ও ফাসাদের পরিমাণ ব্যাপক আকার ধারণ করে, ফেতনা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যবোধ ধ্বংস হয়। ফলে বাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতারণা ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে কোন সততা, প্রতিশ্রুতিশীলতা, আমানতদারিতা ও লজ্জাবোধ থাকে। কেননা তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধকে নষ্ট করেছে; আর তা হল আংশিক নয় বরং সম্পূর্ণরূপে এবং শুধু কথায় নয় বরং বাস্তবে আল্লাহর মানহাজকে গ্রহণ করা।[৪]

বিচ্যুতি ও অস্থিরতাঃ

মানসিক অস্থিরতা ও দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের অভাবের মাঝে জোড়ালো সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি কিছু মানসিক রোগ ব্যক্তির মাঝে চারিত্রিক বিচ্যুতি ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ সাইকোপ্যাথি রোগ। তা এমন অসুস্থ অবস্থা যা পুনরাবৃত্তিমূলক আবেগপ্রবণ আচরণে নিজেকে প্রকাশ করে, এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজকে তুচ্ছ মনে করে এবং এর প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে। যেহেতু ভুক্তভোগী নিজেকে নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা বা বঞ্চনা ও হতাশার সম্ভাবনায় ভুগছেন। তাই তিনি দুনিয়াবী আনন্দগুলি স্থগিত করতে অক্ষম, বরং তার চাহিদা এবং উদ্দেশ্যগুলি মেটাতে দ্রুত অগ্রসর হয়।[৫]

মানুষের চারিত্রিক বিচ্যুতি সংঘটনকারী এই মানসিক উপসর্গগুলো নিয়ে গবেষণাকারী ব্যক্তি লক্ষ্য করবে যে, এই উপসর্গগুলো মূলত মানসিক প্রশান্তি যা মানুষকে এই প্রভাবগুলো মোকাবেলা করার সুযোগ করে দেয় তার অভাবে সৃষ্ট। আর এটা মানসিক প্রশান্তি ও আস্থার কারণগুলোর সাথে সম্পর্ক কম থাকার কারণে হয়ে থাকে। মূলত যা আল্লাহর প্রতি শক্তিশালী ঈমানের প্রমাণ বহন করে। তাইতো এর পরে সে কোন ক্ষতি ও বিপদের আশঙ্কা করে না। কেননা জীবনের এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে যেখানে মানুষ আল্লাহর অভিমুখী হতে

---

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/১৩৮)।
(২) ফাতহুল বারী (১/৬১)।
(৩) ইকতেযাইস সিরাত আল-মুস্তাকীম, পৃঃ (২৫)।
(৪) কালেমাত ফিল আখলাক পৃঃ (৬২)।
(৫) মুকাদ্দামা ফি ইলমিন নাফসিল ইজতেমায়ী ওয়া দিরাসাত আল-মুসলিমীন, পৃঃ (১৫৮-১৫৯)।

বাধ্য, চায় সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন। বস্তুত জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে যা পূরো জীবনকে ধ্বংস করে দেয়, এ অবস্থায় কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসীগণই স্থির থাকতে পারে।[১] মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨ ﴾] [যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।][২] তিনি আরো বলেন:

﴿ فَمَن يُؤۡمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخۡسٗا وَلَا رَهَقٗا ١٣ ﴾ [সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না।][৩]

বিচ্যুতি ও অমূলক কল্পনাঃ

কিছু মানুষের দ্বীনের ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তারা মনে করে যে, দ্বীন হল আমল ব্যতীত শুধু মৌখিক স্বীকৃতি, অথবা দ্বীন আমলের সমষ্টি কিন্তু তা যখন যেভাবে ইচ্ছা আদায় করা যাবে। এদেরকে তাদের ধারণা বিচ্যুতি ও নিম্ন চরিত্রের দিকে নিয়ে যায়। কেননা তারা মনের চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। যদি প্রকৃত ধারণার ক্ষেত্রে তাদের অন্তর ও দৃষ্টি সতর্ক হত এবং তাদের কল্পনা সঠিক হত, তবে অবশ্যই তাদের চরিত্র সংশোধন হত। জাহেলী যুগে নষ্ট চরিত্রের ব্যাপকতা ছিল; যেমন মেয়ে সন্তানকে জীবিত প্রোথিত করা, মদ পান ও যিনা করা। কিন্তু যখন তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল এবং মেনে নিল যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তখন তাদের এসকল চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল। ফলে তারা পথ হারানোর পর পথ পেল, অধঃপতনের পর তারা সমুন্নত হল, চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী হল, পৃথিবী সংকীর্ণ হওয়ার পর প্রশস্ত হল, তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল ও তাদের মধ্য থেকে আমিত্ববাদ দূরীভুত হল। আর যুলুমের স্থল ভ্রাতৃত্বে পরিবর্তিত হল।[৪] এই সবগুলোই হয়েছিল তাদের আক্বিদাগত ও ইবাদতগত ধারণা বিশুদ্ধ হওয়ার পর। ফলে তাদের মধ্য থেকে বিচ্যুতি বিদায় নিল এবং সে স্থানে উত্তম চরিত্র আগমন করল।

মাঠ পর্যায়ে গবেষণার আলোকে বিচ্যুতিঃ

মিসরে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে দ্বীনি নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ার সাথে বিচ্যুতির সম্পর্ক কত গভীর। আর চারিত্রিক বিচ্যুতির পিছনে দুর্বল দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই গবেষণা প্রমাণ করেছে যেঃ

১- চুরির অপরাধের সাথে জড়িত বেনামাযির পরিমাণ ৭১.৮%।

২- বেরোযাদার চুরির সাথে জড়িত অপরাধীর পরিমাণ ৫৩.৫%।[৫]

---

(১) ফি জিলালিল কুরআন (৪/১৩/২০৬)।
(২) সূরা আর-রাদ (২৮)।
(৩) সূরা আল-জীনঃ (১৩)।
(৪) ওয়াকিউনাল মুয়াসারা, পৃঃ (১৬৮)।
(৫) আল-জারিমা ফিল মুজতামা পৃঃ (৩৮৫)।

৩- আরেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইস্কান্দারিয়ার বিচারালয়ে আগত বিচ্যুত ঘটনাসমূহের সাথে জড়িত সকলেই আক্বিদাকে একটি প্রচলিত ধারণা বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের মাঝে একজনকেও পাওয়া যায়নি যে দ্বীনি ফরয বিধানসমূহকে পরিপূর্ণভাবে পালন করে।[১] আর এটাই চারিত্রিক বিচ্যুরিত পিছনে দুর্বল দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের দৃঢ় সম্পর্ককে প্রমাণ করে।

অনুরূপভাবে টেকনোলজিতে আগ্রগামী বিশ্বের সমাজে চিন্তাগত চরম সমস্যা বিদ্যমান। যেমন, বিভিন্ন রূপে ও প্রকারে জাতিগত ও অর্থগত বিবাদ, বিকৃত চিন্তা, নষ্ট চরিত্র এবং অত্যাচার।

এ সকল বিচ্যুতিগুলো প্রকাশ পেয়েছে দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিতে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে চলাফেরা করে যেন সে নিজেই চারিত্রিক মূল্যবোধের মাপকাঠি।[২]

দ্বিতীয়তঃ মানসিক অসঙ্গতি

নফস বা আত্মা মৌলিক দিক থেকে এক, তবে তার অবস্থাগত দিক থেকে তিন প্রকার: নফসে মুতমাইন্না, নফসে আম্মারা বিস-সু ও নফসে লাওয়ামা। সুতরাং আত্মা যদি আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়, তাঁর যিকিরে প্রশান্তি পায়, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর সাক্ষাতে আগ্রহী থাকে ও তাঁর নৈকট্য লাভে আনন্দিত হয়, তবে তা নফসে মুতমাইন্না। আর যখন এর বিপরীত হয় তখন তা নফসে আম্মারা বিস-সু; তা এই ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি অনুযায়ী খারাপ কর্ম ও বাতিল অনুসরণের আদেশ করে। ফলে তা সকল খারাপের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। তৃতীয় অবস্থা হল নফসে লাওয়ামা, এটা মুমিনের অবস্থা। সে নিজেকে প্রতিটি অবস্থার জন্য তিরস্কার করে ও সকল কাজে ঘাটতি মনে করে। ফলে সে লজ্জিত হয় ও আফসোস করে। পক্ষান্তরে পাপী সামনে অগ্রসর হতেই থাকে নিজেকে কখনো তিরস্কার করে না।[৩]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অন্তরের রোগ ও তার নিরাময়ের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এবং নবী সাঃ এর সুন্নাতেও তা বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ ﴾] [তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।][৪] তিনি আরো বলেন [﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ﴾] [সুতরাং যাদের অন্তরে অসুখ রয়েছে আপনি তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ওদের সাথে মিলিত হতে দেখবেন এ বলে, আমরা আশংকা করছি যে, কোন বিপদ আমাদের আক্রান্ত করবে।][৫] তিনি অন্যত্র বলেন: [﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ ﴾] [হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে,

---

(১) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৩৮৬)।
(২) হাজাতুনা ইলাল ঈমান ওয়াল আখলাক বিজিওয়ারিল ইলমে ওয়াত তেকনুলোজিয়া, পৃঃ (৩০৪)।
(৩) ইগাসাতুল লাহফান পৃঃ (৯১-৯৪)।
(৪) সূরা আল-বাকারাঃ (১০)।
(৫) সূরা আল-মায়েদাঃ (৫২)।

সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।][১] তিনি আরো বলেছেন: [﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧﴾] [হে মানবসকল! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও অন্তরসমূহে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।][২] নবী সাঃ বলেছেন: (তারা জানেনা তো জিজ্ঞাসা করল না কেন? কেননা অজ্ঞতার চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা।)[৩]

মানসিক অসঙ্গতিকে অন্তরের রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যা চারিত্রিক বিচ্যুতি ঘটায়। আর তা দুই প্রকারঃ

- অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া।
- স্বাভাবিক চলাচল ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

এর উভয়টির অনুপস্থিতির কারণে কষ্ট ও শাস্তি হয়। কেননা আনন্দের কারণ হল সামঞ্জস্যশীলতার অনুভূতি আর কষ্টের কারণ হল অসঙ্গতির অনুভূতি।[৪]

অন্তরের রোগ দুর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সংকীর্ণ দিগন্তের দিকে নিয়ে যায়। কেননা মানসিক প্রবৃত্তি ও চাহিদা এবং তার দুনিয়াবী কল্যাণের বৈশিষ্ট্য হল, তা মানুষের দূরদৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় বা তাকে রাতকানা করে দেয় বা তার উপর কোন ধরণের পর্দা বিস্তার করে দেয়; এর ফলে মানুষ হককে বাতিল ও বাতিলকে হক হিসেবে দেখে, তার বিষয়গুলো গুলিয়ে যায় এবং যেকোন জিনিসের ধারণা তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়। এর এটা পর্দার পুরুত্ব অনুযায়ী হয়ে থাকে।[৫] ফলে তার মাঝে মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়; পর্দা যে পরিমাণ তার দূরদৃষ্টিকে আড়াল করে সে অনুসারে।

মানসিক অস্থিরতাঃ

কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদের মাঝে বোধ শক্তির ক্ষেত্রে অস্থিরতা নেই, কিন্তু তাদের খারাপ আচরণ এমন নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত যায়, যে পর্যন্ত অস্থির বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেতে পারে না। তাদের কাউকে দেখা যায় এমন কিছু আচরণের সাথে জড়িত যা সঠিক চরিত্র ও বিশুদ্ধ স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ধরণের বিচ্যুত আচরণের অন্তর্গত হল, মাদক গ্রহণ ও তা প্রসার করা, সমকামিতা ইত্যাদি বিচ্যুত আচরণসমূহ।[৬] যার লক্ষণ হল, বিপদের সময়ে ভয়, অস্থিরতা, খাবার গ্রহণ থেকে দূরে থাকা ও ক্ষুধা মন্দা, চরম লজ্জাশীলতা, দ্রুত রাগান্বিত হওয়া, আনুগত্য না করা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা, দ্রুত বিভ্রান্ত হওয়া, কঠিন অভিমান, আক্রমণাত্বক শত্রুতার দিকে অগ্রসর হওয়া, দিবা স্বপ্ন দেখা, মিথ্যা বলা, মাঝে মাঝে চুরি করা ইত্যাদি।[৭] যেহেতু এসকল অস্থিরতার কোন ওষুধ পাওয়া যায় না সেহেতু তাদের চরিত্রের মাঝে বিপদজনক প্রভাব ফেলে।

---

(১) সূরা আল-আহযাবঃ (৩২)।
(২) সূরা ইউনুসঃ (৫৭)।
(৩) সুনানে আবু দাউদ (১/২৩৯-২৪০, হাঃ ৩৩৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (১/১৮৯, হাঃ ৫৭২), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
(৪) আত-তুহফা আল-ইরাকিয়া ফি আমালিল কালবিয়া, পৃঃ (১৬৩)।
(৫) বাসায়ের লিল মুসলিম আল মুয়াসের, পৃঃ (১১৯)।
(৬) ইলমুল আমরাদ আন-নাফসিয়া ওয়াল আকলিয়া, পৃঃ (৪৭৯-৪৭০)।
(৭) মুকাদ্দামাতুল খাদামাতুল ইজতেমাইয়া, পৃঃ (৪২৪)।

মানসিক সঙ্গতিঃ

সঙ্গতি বলতে, ব্যক্তির চারপাশের সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা, যেখানে ব্যক্তি তার চারপাশের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করে নিতে সক্ষম এবং সে পরিবেশ ও সমাজে আপতিত সমস্যাগুলোকে সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম।[১] আর মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হবে ইসলামী মানহাজের আলোকে। সুতরাং মানসিক সঙ্গতি হল, একটি চলমান কর্মতৎপরতা যা আচরণ ও সামাজিক পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাতে পরিবর্তন পরিমার্জনের মাধ্যমে যেন ব্যক্তি ও পরিবেশের মাঝে ইসলামী মুলনীতির আলোকে ভারসাম্য তৈরী হয়।

সুতরাং ইতিবাচক মানসিক সঙ্গতি ব্যক্তি, সমাজ ও কর্মের মাঝে সামঞ্জস্যতার দাবী রাখে। যাতে ব্যক্তি উপযুক্ত অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য অনুভব করে যা তাকে নিজ ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও পেশা সম্পর্কে প্রশান্তি দেবে।[২] ব্যক্তি যখন সঠিক পদ্ধতিতে এই তিনটি দিক তথা নিজ সত্ত্বা, সমাজ ও পেশার মাঝে সমন্বয় করতে পারে না তখন সে পরোক্ষ মাধ্যমে তা প্রকাশের চেষ্টা করে। সে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করে যে তা তাকে উচ্চমানের সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি এনে দিবে। এই পরোক্ষ মাধ্যমগুলোকে মানসিক আচরণ বিশেষজ্ঞগণ (**মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা কৌশল**) বলে অভিহিত করেন। তা হল কতগুলো মাধ্যম ও উপকরণের সমষ্টি যা একজন ব্যক্তি বাস্তবায়ন করে। এগুলোর কাজ হল হাকিকতকে বিকৃত করা এবং কতগুলো যুক্তি দাঁড় করানো যেন ব্যক্তি অধঃপতন ও সংঘাত হতে সৃষ্ট অস্থিরতা ও মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পায়; যা তার মনের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। এর লক্ষ্য হল, নিজেকে রক্ষা করা, তার পক্ষ হতে প্রতিহত করা, মনের বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করা, আত্মসম্মানবোধ রক্ষা করা ও মনের প্রশান্তি বাস্তবায়ন করা।[৩] পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, মানুষের নিকট হয়ত ইতিবাচক মানসিক সঙ্গতি অথবা অগ্রহণযোগ্য ও অযৌক্তিক নেতিবাচক মানসিক সঙ্গতি রয়েছে। কেননা মানুষ যখন কোন সমস্যা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুভব করে, যেমন চাহিদা পূরণে অর্থের প্রয়োজনীয়তা তখন সে বুঝতে পার যে, এটা অর্জনের একমাত্র পথ হল, পরিশ্রম, ধৈর্যধারণ ও একটা ভাল মানের আয়ের উৎস। তাই সে সঞ্চয় করতে থাকে যাতে তার নিকট প্রয়োজীয় পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়। কিন্তু যখন এটা পূর্ণ করতে পারে না, তখন সে আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আর এটা তার চোখের সামনেই রাখে এ আশায় যে, আল্লাহ হয়ত কোন সুযোগ নিয়ে আসবেন। তাই সে এটা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। এই ধরণের ব্যক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য সঙ্গতি রয়েছে। কেননা তখনই এটা গ্রহণযোগ্য সঙ্গতি বলে গণ্য হবে, যখন ব্যক্তি সকল সম্ভবনা ও সাম্ভব্য ফলাফলের আলোকে তার সমস্যাগুলোর সমাধান করবে।[৪] অতঃপর তা বাস্তবায়নের জন্য এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে যা ইসলামী মানহাজের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর যখন মানুষ স্বীয় ক্ষমতা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী তার সমস্যাগুলোর যথাপোযুক্ত সমাধান করতে অপারগ হবে, তখন সে কতগুলো (প্রতিরক্ষামূলক কৌশল) পদ্ধতি অবলম্বনের দিকে যাবে; যা এক ধরণের বাস্তবতাকে বিকৃত করা। মানুষ এগুলো করে থাকে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সাধনের লক্ষ্যেঃ

(১) আস-সুলুকুল ইজরামী ওয়াত তাফসীরুল ইসলামী (১/১৪৫)।
(২) আস-সিহহা আন-নাফসিয়া ওয়াল ইলাজান নাফসী, পৃঃ (২৯)।
(৩) পূর্বোক্ত পৃঃ (৪১)।
(৪) আস-সিহহা আন-নাফসিয়া, পৃঃ (২১৭)।

ব্যক্তি তার অস্থিরতা অবস্থা ও তদসংশ্লিষ্ট পাপের অনুভূতি থেকে বেঁচে থাকবে।

ব্যক্তি তার স্বীয় ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করবে।[১]

প্রতিরক্ষা কৌশলের আড়ালে সে তার প্রবৃত্তি ও ভোগকে বাস্তবায়ন করবে।

প্রতিরক্ষা কৌশলসমূহঃ

তা হল ব্যক্তির প্রবঞ্চনার পথের আশ্রয় নেয়া যখন সে এমন বিপদের সম্মুখীন হয় যা সমাধান করার ক্ষমতা নেই, অথবা সে নিজে ভুল পথে চলে বুঝতে পেরে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রবঞ্চনাকর দায়মুক্তির আশ্রয় নিবে।

প্রতিরক্ষা কৌশলসমূহের অন্তর্গত হল:

যখন মানুষ অনুভব করবে যে, তার কাজটি আবশ্যকীয় কর্মের বিপরীত, তখন সে তার বিকৃত আচরণকে দায়মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবে কতগুলো খোড়া যুক্তির মাধ্যমে। এই যুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

১- যৌক্তিকতা অনুসন্ধানঃ

যখন মানুষ তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিফল হবে, বা ওয়াজীব আদায় করতে ত্রুটি করবে, অথবা ভাল চরিত্রের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে খারাপ আচরণ করবে, তখন সে তার এই আচরণকে দায়মুক্তি দেয়ার জন্য কতগুলো দুর্বল ওযর অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে। যেন তার থেকে অভ্যন্তরীণ বা সামাজিক তিরস্কার দূরীভূত হয়। সুতরাং তা এমন কৌশল যা ব্যক্তি তার খারাপ আচরণকে দায়মুক্তি দেয়ার জন্য পেশ করে।

উদাহরণস্বরূপঃ বেতন রয়েছে এমন কাজে যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত পুরো সময় দেয়, আর মনে মনে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, অফিস তার ও তার সহকর্মীদের মাঝে ইনসাফ করেনি, অথবা কাজের তুলনায় বেতন কম বা তার অধিকাংশ সহকর্মীগণ তার চেয়ে কম পরিশ্রম করে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের যুক্তি যা সে তার মনে প্রাশান্তি দেয়ার জন্য অনুসন্ধান করে থাকে।

২- অন্যের উপর দায় চাপানোঃ

এর অর্থ হল, তার নিজের মনের মাঝে বিদ্যমান অনাকাঙ্খিত গুণাবলীকে অন্যের উপর চাপানো, সেটাকে বিরাট করে প্রকাশ করার পরে।[২]

সুতরাং মানুষ যখন কোন কাজ করে, অতঃপর বুঝতে পারে যে, এটি উত্তম চরিত্রের সাাথে সাংঘর্ষিক তখন তা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়। অথবা যখন কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, তখন তার কারণটা অন্যের উপর চাপায়। যেমন একজন ছাত্র বলল যে কঠিন প্রশ্নই আমার ফেল করার কারণ। বা কোন ব্যক্তি বলল

(১) পূর্বোক্ত, পৃঃ (২১৯)।
(২) আস-সিহহা আন-নাফসিয়া, পৃঃ (২২১)।

যে, প্রয়োজনই এটা করতে বা পরিত্যাগে বাধ্য করেছে। অথবা অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এটাকে সুশোভিত করেছে বা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে।

৩- অন্যের রূপ ধারণঃ

এটা অন্যের উপর দায় চাপানো বিপরীত। কেননা এই অবস্থায় ব্যক্তি অন্যের মাঝ বিদ্যমান ভাল গুণগুলোকে নিজের বলে প্রচার করে। সুতরাং সে নিজের জন্য অন্যের মাঝে বিদ্যমান ভাল বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধার করে। আর নিজেকে অন্য ব্যক্তির আকৃতিতে প্রকাশ করে যার মাঝে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান। অথবা ব্যক্তি নিজেকে অন্য ব্যক্তি বা দলের সাথে মিলিয়ে ফেলে যাদের মাঝে আকর্ষণীয় গুণ রয়েছে, অথচ সে গুণ তার মাঝে নেই।[১]

অন্যের আকৃতি ধারণ করা তা যেকোন ভাবেই হোক না কেন, একটি ভুল পদ্ধতি ও মানসিক অসঙ্গতির খারাপ উদাহরণ।[২] তা কয়েকটি উদাহরণ হতে স্পষ্ট হয়, যেমন কোন সমস্যায় পড়লে যেকোন সরকারী ব্যক্তির রূপ ধারণ করা, বা আলেম না হয়েও আলেমের রূপ ধারণ করা অথবা কোন দলের নেতার রূপ ধারণ করবে অথচ সে তার উপযুক্ত নয়।

৪- নেতিবাচক মনোভাবঃ

তা হল প্রতিরোধমূলক কর্ম সাধন। তা হা-বোধক বা না-বোধক হতে পারে। তখনই হা-বোধক হবে যখন সে তার থেকে প্রত্যাশিত বিষয়ের বিপরীত কর্ম করে। আর না-বোধক হবে যখন সে প্রত্যাশিত কর্ম করা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং তা দায়িত্ববোধ ও চাপের প্রতিরোধ যখন কোন ব্যক্তি প্রত্যাশার বিপরীত কর্ম করে, বা তা করা থেকে বিরত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, চুপ থাকা, প্রতিরোধ করা, বিরোধিতা করা, তর্ক করা, বিদ্রোহ করা, একগুঁয়েমি করা ও প্রত্যাখ্যান করা।[৩]

কাজেই আপনি যখন এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে সুপারিশ চাইবেন অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু অর্থ ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে, তখন সে মধ্যস্থতা করা থেকে বিরত থাকবে। এটা হল না-বোধক কর্ম। আর যদি সে ঋণদাতার নিকট ঋণ গ্রহীতার অবস্থানকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করে ও ঋণ প্রদান না করতে উৎসাহিত করে তবে সে দাবির বিপরীত কর্ম করল।

মধ্যস্থতাকারী এই দুই ধরণের আচরণই তার মানসিক রোগের প্রমাণ বহন করে। এর কারণ হতে পারে সে ঋণগ্রহীতাকে অপছন্দ করে, বা তার সাথে হিংসা করে ইত্যাদি বিকৃত আচরণ।

৫- শত্রুতাঃ

প্রতিরক্ষামূলক কৌশল কোন কোন সময় শত্রুতার রূপ ধারণ করে। আর তা হল কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে আক্রমণ করা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি যুক্তি পেশ করবে যে, ঐটা-ই মূল ঘটনার অনুঘটক এবং তার

---

(১) আস-সিহহা আন-নাফসিয়া ওয়াল ইলাজান নাফসী, পৃঃ (৪২)।
(২) মুশকিলাতুশ শাবাব ওয়াল মানহাজাল ইসলামী ফি ইলাজিহা, পৃঃ (৮৫-৮৬)।
(৩) আস-সিহহা আন-নাফসিয়া ওয়াল ইলাজান নাফসী, পৃঃ (৪৪)।

অক্ষমতার জন্য সে-ই দায়ী। এ ধরণের কৌশলগুলো ষড়যন্ত্র, নিন্দা, অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ আকারে প্রকাশ পায়।[১] এ সবগুলোই চারিত্রিক বিচ্যুতির রূপ, যার কোন গ্রহণযোগ্য যৌক্তিকতা নেই।

৬- পশ্চাৎপদতাঃ

সাফল্যহীন আচরণ ও সঙ্গতি হতে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যায়। বিশেষত মানুষ যখন এমন সমস্যার সম্মুখীন হয় যা সে মোকাবেলা করতে পারে না। যেমন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের পথে চলে।[২] তখন সে নিম্ন স্তরের দিকে ফিরে যায় প্রতিরক্ষা কৌশলের অংশ হিসেবে।

এ থেকে স্পষ্ট হল যে, মানুষ যখন তার ক্ষমতা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে না, তখন তার প্রয়োজন পূরণের জন্য বিকৃত ধরণের বিচ্যুত চরিত্রের দিকে অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রে সে সহযোগিতা নেয় এমন সব প্রতিরক্ষা কৌশল ও যুক্তির, যার ছায়ার নিচে সে তার প্রবৃত্তি ও ভোগ চরিতার্থ করতে পারবে।

প্রতিরক্ষা কৌশলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ

ক- ব্যক্তির মনের ব্যাথা থেকে বেঁচে থাকা; নফসে লাওয়ামার প্রভাবের ফলস্বরূপ।

খ- অন্যদের সমালোচনা বা সম্ভাব্য সমালোচনা থেকে মুক্তি পাওয়া।

গ- মনের ব্যাথা থেকে রক্ষা পাওয়া যা একজন ব্যক্তি ব্যর্থতার কারণে বা সাফল্যহীন হওয়ার কারণে অনুভব করে।

প্রতিরক্ষা কৌশল বিদ্যমান থাকার কারণসমূহঃ

- মানসিক যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখা, বিকল্প প্রকাশের মাধ্যমে যা তার মনের মাঝে প্রবেশ করে। আর এটাই হল প্রতিরক্ষা কৌশল।
- বাস্তবতা থেকে পলায়ন করা; তা মোকাবেলা করার ক্ষমতা না থাকার কারণে।
- ভুল ও নিষ্ফলতা মোকাবেলায় সহযোগিতাকারী সঠিক পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ব্যর্থতা এবং পূর্বে এ ধরণের পরিস্থিতিতে পড়া থেকে বিরত থাকা।

এটা পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সঠিক শিক্ষার অভাবের কারণে হয়ে থাকে।

দীর্ঘস্থায়ীভাবে প্রতিরক্ষা কৌশল প্রয়োগের ভয়াবহতাঃ

(১) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৪৪)।
(২) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৪৪)।

যদিও প্রতিরক্ষা কৌশল মনের অভ্যন্তরের কষ্টকে লাঘব করে; যা তাকে পর্যুদস্ত করে ও পীড়িত করে। তবে দীর্ঘস্থায়ীভাবে তা প্রয়োগ ব্যক্তিকে ব্যর্থ, মিথ্যাবাদী ও অন্যদের মোকাবেলা করতে অক্ষম করে তোলে।

মানসিক অসঙ্গতির কারণসূহঃ

মানসিক অসঙ্গতি যা তার মাঝে অস্থিরতা ও চারিত্রিক বিচ্যুতি নিয়ে আসে তার অন্যতম কারণ হল: উচ্চাকাঙ্খা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর নির্ভরশীলতা, অধিক পরিমাণে খাওয়া ইত্যাদি।[১] নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

১- আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর নির্ভরশীলতাঃ

ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন: সবচেয়ে লাঞ্ছিত মানুষ সে-ই ব্যক্তি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর নির্ভর করে। কেননা এর কারণে তার যে সফলতা ও কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যায় তার পরিমাণ যা কিছু অর্জিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আর সে ধ্বংস ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ ব্যক্তির উদাহরণ হল মাকড়সার ঘর দ্বারা গরম ও ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষাকারীর ন্যায়।[২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর নির্ভরতার আরেকটি দিক হল, ইবাদত আদায়ে ত্রুটি করে অর্থের প্রতি ভালবাসা ও তা অর্জনের চেষ্টায় লেগে থাকা। অথবা মানুষ গণক, জাদুকর ও দাজ্জালদের কথার উপর নির্ভর করবে। এসকল কাজ মানসিক অস্থিরতার কারণ।

২- আকাঙ্খা করা ও তুষ্ট না হওয়াঃ

মানব মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, মালিকানার প্রতি ভালবাসা। এই বৈশিষ্ট্যের ফলস্বরূপ তার মাঝে উচ্চাকাঙ্খার বিষয়টি প্রকাশ পায়। যেহেতু মানুষ তার আশার কল্পনাকে অঙ্কন করে যদিও তা দুর্বল বিষয় হোক না কেন; সে ঐ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম নয় আল্লাহ প্রদত্ত তার স্বাভাবিক ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দ্বারা, বিশেষ করে তার আকাঙ্খা যদি এমন হয় যা অর্জন করা দূরূহ। সে আশা করে বিশাল অট্রালিকা, সুন্দর বাহন, আরামদায়ক বিছান ও নেতৃত্ব। এমনকি তার আশার কারণে মন্দকে ভাল বলে ও কঠিনকে সহজ বলে মনে হয়। কাজেই মিথ্যা আকাঙ্খা ও বাতিল কল্পনা এর আরোহী কে নিয়ে খেলা করতে থাকে যেমন কুকুর মৃত দেহ নিয়ে খেলা করতে থাকে। আর এটাই প্রত্যক নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য আত্মার অবলম্বন।[৩] আর এই কাল্পনিক আকাঙ্খার ফলে বিচ্যুতি, পাপ, ক্লান্তি ও কষ্টে নিপতিত হয়।

৩- অধিক পরিমাণ খাবার গ্রহণঃ

একজন ব্যক্তির অপচয় ও ব্যাপক পরিমাণে খাবার গ্রহণ তাকে আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ও তাকে ব্যস্ত রাখে পেটের চাহিদা পূরণে। আর যখন তা পেয়ে যায় তখন তার ব্যয়পদ্ধতি ও তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা তাকে ব্যস্ত রাখে। তার উপর প্রবৃত্তির উৎসগুলো, শয়তানের পথগুলো প্রভাব

(১) মাদারিজুস সালেকীন (১/৪৮৮-৪৯৪)।
(২) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৪৯২)।
(৩) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৪৯১)।

বিস্তার করে। যে শয়তান মানুষের শিরায় রক্তের মত প্রবাহিত হয়।[১] আর যখন শয়তানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধীনে প্রবৃত্তি উৎসগুলো শক্তিশালী হয় তখন মানুষ ভাল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে খারাপ পথে পরিচালিত হয়; তার অস্থির মনের চাহিদা পূরণের জন্য। বিশেষ করে যখন খাবারের পরিমাণ সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা অনুপস্থিত থাকে। এ মর্মে রাসূল সাঃ বলেছেন: (মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।)[২]

চারত্রিক বিচ্যুতির একটি অন্যতম কারণ মানসিক অসঙ্গতি সংশ্লিষ্ট আলোচনা করা হল। নিচে আরেকটি অন্যতম দিক তথা অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক কারণসমূহ

মানব জীবনের উপর অর্থনীতির একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে, তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে এর ভূমিকার কারণে; যেমন খাদ্য, পানীয়, পোষাক, বাসস্থান ইত্যাদি আরো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খরচ। নিঃসন্দেহে ব্যক্তির আচরণে তার আর্থিক সমৃদ্ধি ও ঘাতটির প্রভাব রয়েছে। আর অর্থনীতির প্রভাব শুধুমাত্র যুব সমাজের উপর সীমাবদ্ধ নয়। বরং ছোট শিশুদের উপর এর সরাসরি প্রভাব রয়েছে; পরিতৃপ্ত হওয়া বা বঞ্চিত হওয়ার দিক থেকে এবং অবহেলা বা দেখাশুনা ও নিরাপত্তা বা নিরাপত্তাহীনতা দিক থেকে।[৩] এই অনুচ্ছেদে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো আলাচনা করা হবে:

ক- বিচ্যুতির সহযোগিতাকারী অর্থনৈতিক কারণসমূহ, তা হল দুইটি কারণ দারিদ্রতা ও প্রাচুর্যতা।

খ- সে সমস্ত প্রভাবক যা দারিদ্রতা ও প্রচুর্যতার সাথে মিলিত হলে তা চারিত্রিক বিচ্যুতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

গ- অর্থনৈতিক নীতিমালা ও বিচ্যুতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব। আর মানুষের জন্য কোনটি অধিক কল্যাণকর।

ক- **বিচ্যুতির সহযোগিতাকারী অর্থনৈতিক কারণসমূহঃ**

প্রথমতঃ প্রাচুর্যতা:

(১) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৪৯৩)।
(২) সুনানে তিরমিযি (৪/৫০৯-৫১০, হাঃ ২৩৮০) তিনি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৩) মুকাদ্দামাতুল খাদামাতুল ইজতেমাইয়া, পৃঃ (৪৪০)।

প্রাচুর্যতার অর্থ হল নিয়ামতপূর্ণ ও বিলাসী জীবন। দুর্বল দ্বীনি নিয়ন্ত্রণ, খেল-তামাশা ও অশ্লীলতার প্রসার, দুর্বল চারিত্রিক প্রতিপালনের সাথে অর্থিক প্রাচুর্য ও অধিক পরিমাণ নগদ অর্থের উপস্থিতি বিলাসী ব্যক্তিদেরকে খারাপ চরিত্রের দিক নিয়ে যায়; তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। নিম্নের পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে প্রাচুর্যের বিচ্যুতির বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করা সম্ভবঃ

- **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:**

ব্যক্তির নিকট অধিক পরিমাণে নগদ টাকার উপস্থিতি এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে তাতে দীর্ঘ সময় ব্যস্ত থাকা, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ। আর এ কর্মটাই স্বয়ং উন্নত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। শিল্প সমাজের বৈশিষ্ট্য হল একদিকে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ও শিক্ষার উপর প্রভাব, অপর দিকে ব্যক্তি নিজেকে পরিবার থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে। সেখানে পতিতাবৃত্তি এবং পাপ ও অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।[১] এই রোগগুলো যে কোন সমাজকে টুকরা টুকরা করে দেয়। কেননা প্রাচুর্যতা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও মানবসমাজের সম্পর্ক নষ্ট করার সবচেয়ে শক্তিশালী ও নোংরা কারণ। প্রবৃত্তির চারণক্ষেত্রে ডুবে থাকা ও লোলুপ স্বভাবকে পরিতৃপ্ত করা আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধের অনুভূতিকে হত্যা করে এবং খারাপ চরিত্রকে তার অধঃপতিত জীবনের নিটক প্রিয় করে তোলে যা তাকে অতল গহ্বরে নিয়ে যায়।[২] ফলে সে সামাজিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে তার আর্থিক দিক ও উচ্চাভিলাষ পূরণে ব্যস্ত থাকে।

- **খেল-তামাশার জীবন:**

অর্থনৈতিক প্রাচুর্যতা অধিকাংশ সময় খেল-তামাশা ও চাহিদা পূরণে সময় নষ্ট করার দিকে নিয়ে যায়; যা দ্বীনি গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পর্যাপ্ত খাদ্য ও আরামদায়ক স্থানের প্রভাবে হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে কিছু পরিবারের নিকট আর্থিক প্রাচুর্যতা ও বিনোদন মাধ্যমের উপস্থিতি অনেক সময় যুব সমাজকে চরিত্র নষ্টকারী হারাম বিনোদন উপভোগের দিকে নিয়ে যায়। ধনাঢ্য নারীদের বিনোদনকে জনৈক লেখক বর্ণনা করেছেন এইভাবে, মা একদল যিয়ারতকারীকে অভ্যর্থনা জানায় যেন তারা তাদের অধিকাংশ সময়কে তাস খেলা, স্বামী-স্ত্রী ও প্রেমিকদের সম্পর্কে বকবকানি করে এবং অর্থ ও জিনিসপত্র নিয়ে আলাপ করে সময় কাটাতে পারে।[৩]

- **মাদকদ্রব্যঃ**

যে ধনী ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষার উপর গড়ে উঠেনি সে তার সম্পদ প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যয় করে যদিও তা হারাম হয় না কেন। যেমন মাদক ও এ জাতীয় বস্তু। কাতারের অপরাধ বিশ্লেষণ অধিদপ্তর উপসাগরীয়

(১) আস-সুলুকুল ইজরামী ওয়াত তাফসীরুল ইসলামী, (১/১১১)।
(২) সুনানুল্লাহ ফিল মুজতামা মিন খিলালিল কুরআন, পৃঃ (৩৬-৩৭০।
(৩) ইলমুল ইজতেমা আল-হাদারী আত-তামাদ্দুন ফিশ শারকীল আওসাত, পৃঃ (১১৭-১৭৮)।

দেশসমূহের মাদক গ্রহণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে যাতে প্রমাণিত হয় যে, এর কারণ হল উপসাগরীয় দেশসমূহের আর্থিক সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যতা।[১]

- **অহঙ্কার-অহমিকা:**

যে ব্যক্তি অর্থের সঠিক ব্যয় জানেনা তার নিকট অধিক পরিমাণ অর্থের উপস্থিতি তাকে হক থেকে বিচ্যুত করে দেয়। কেননা সে চিন্তা করে যে, সে এমন কিছুর মালিক যা অন্যরা খুজে ফিরছে। তাই অনেক সময় তা বাতিল পন্থায় ব্যয় করে, ফলে সে নিজে ও অন্যকে ইসলামী চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট করে দেয়। সে এ সম্পদের মাধ্যমে কিছু মানুষকে অপদস্থ করে, তাদের উপর গর্ব করে এবং কল্যাণের পথের দায়ীদের সাথে শত্রুতা করে। কেননা অপচয়কারীরা সংশোধনকারী ও কল্যাণকামীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত থেকে পলায়ন করে ও তাতে বাধা দেয় এবং মানুষদেরকে এ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। রাসূলগণের দাওয়াত ও তাদের বাস্তব আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে, যা তারা পরিত্যাগ করতে পারে না।[২] মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ٣٤﴾] [আর আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তার সাথে কুফরী করি।][৩] কারূন যাকে আল্লাহ তায়ালা এত ধনভান্ডার দান করেছিলেন যে, তার চাবি বহন করতে একদল শক্তিশালী লোক লাগত। যখন তাকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সম্পদ দিয়ে আখেরাত অনুসন্ধান করতে ও দুনিয়ায় তার অংশ ভুলে না যেতে আহবান জানাল, তখন সে বলল আল্লাহ তাকে এই সম্পদ দিয়েছেন কারণ আল্লাহ জানেন যে, আমিই এর হকদার।[৪] মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ أَوَلَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبۡلِهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرُ جَمۡعٗاۚ وَلَا يُسۡـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٧٨﴾] [আর আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না। সে বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি। সে কি জানত না আল্লাহ তার আগে ধ্বংস করেছেন বহু প্রজন্মকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল বেশী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।][৫]

- **প্রাচুর্যতা ও যুলুমঃ**

আল্লাহর সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আনন্দের সময়ে সম্পদ থাকলে সে অনেক সময় তা বান্দাদের উপর যুলুম করার জন্য ব্যয় করে। এর মাধ্যমে সে উত্তম চরিত্র থেকে নিকৃষ্ট চরিত্রের দিকে যায়। কেননা প্রাচুর্যতা ও

---

(১) আল-আয়ামেল আল-মুয়াদ্দিয়া ইলা তায়াতিল মুখাদ্দিরাত, পৃঃ (৪২২)।
(২) আল-ইসলাম ওয়া দরুরিয়াতুল হায়া, পৃঃ (১৫২-১৫৩)।
(৩) সূরাা সাবাঃ (৩৪)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৩/৪০৯-৪১০)।
(৫) সূরা আল-কাসাসঃ (৭৭-৭৮)।

যুলুমের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যুলুম প্রাচুর্যের সাথেই থাকে এবং প্রাচুর্যতা যুলুমের অন্যতম কারণ।[১] মহান আল্লাহ বলেন: [﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُو۟لُوا۟ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟ فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾﴾] [অতএব তোমাদের পূর্বের প্রজন্মসমূহের মধ্যে এমন প্রজ্ঞাবান কেন হয়নি, যারা যমীনে ফাসাদ করা থেকে নিষেধ করত? অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। আর যারা যুলম করেছে, তারা বিলাসিতার পেছনে পড়ে ছিল এবং তারা ছিল অপরাধী।][২]

দ্বিতীয়ত: দারিদ্রতাঃ

ফকির বলা হয়: যার কিছুই নেই বা তার ও তার অধীনস্ত পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অর্ধেকের কম পরিমাণের মালিক।

আর মিসকিন বলা হয়: যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় জিনিসের অর্ধেক বা অধিকাংশের মালিক কিন্তু তার নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ নেই।[৩]

অর্থাৎ তাদের উভয়রই অতিরিক্ত আর্থিক উৎসের প্রয়োজন। আর নিঃসন্দেহে মানুষের আচরণের উপর দারিদ্রতার প্রভাব রয়েছে যদি তার মাঝে ঈমান ও সঠিক চরিত্র না থাকে। কেননা অনেক সময় বঞ্চিত দরিদ্রকে তার কষ্ট ও বঞ্চনা এমন আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে যা উত্তম ও সম্মানিত চরিত্রবানরা পছন্দ করে না- বিশেষ করে যদি তার প্রতিবেশীরা নিয়ামতপ্রাপ্ত বিত্তশালী হয়-।[৪] রাসূল সাঃ দারিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, হাদিসে এসেছে, তিনি বলেছেন: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ) (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী, দরিদ্রতা ও কবর ’আযাব হতে আশ্রয় চাই।)[৫] তিনি আরো বলেছেন: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ) (হে আল্লাহ! আমি দরিদ্রতা হতে, তোমার কম অনুকম্পা ও অসম্মানী হতে এবং আমি কারো প্রতি জুলুম করা হতে বা নিজে অত্যাচারিত হওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[৬] অনুরূপভাবে দারিদ্রতা ব্যক্তিকে ঋণগ্রস্থতার দিকে নিয়ে যায়, আর ঋণগ্রস্থতা মিথ্যা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দিকে অগ্রসর করে। রাসূল সাঃ এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন, (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ،) (হে আল্লাহ্! গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্থতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।) তখন এক ব্যাক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্থতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

(১) আল-ইসলাম ওয়া দরুরিয়াতুল হায়া, পৃঃ (১৫৩)।
(২) সূরা হুদঃ (১১৬)।
(৩) মুশকিলাতুল ফাকর ওয়া কায়ফা আলাজাহাল ইসলাম, পৃঃ (৮১)।
(৪) পূর্বোক্ত, পৃঃ (১৩)।
(৫) সুনানে নাসায়ী (৩/৭৩-৭৪, হাঃ ১৩৪৭), আহমাদ (৫/৩৬,৩৯,৪২), শায়খ আলবানী হাদিসটির সনদকে সহীহ বলেছেন।
(৬) সুনানে আবু দাউদ (২/১৯০-১৯১, হাঃ ১৫৪৪), সুনানে নাসায়ী (৮/২৬১, হাঃ ৫৪৬২), আহমাদ (২/৩০৫-৩২৫), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যখন কোন ব্যাক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।)[১]

নিশ্চয় ব্যক্তির আচরণ ও তার জীবনধারায় নগদ অর্থ প্রবাহের ঘাটতির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে; যেহেতু তার প্রভাব শিক্ষা, জীবিকা ও স্বাস্থ্যের উপর প্রকাশ পায়। আর এটা আচরণের ধরণ ও তার বিচ্যুতির উপর প্রভাব ফেলে। নিচের পয়েন্টগুলোতে এটা আরো স্পষ্ট হবেঃ

- **দারিদ্রতা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রভাবঃ**

শিক্ষার উপর দারিদ্রতার প্রভার রয়েছে। সুতরাং অল্প উপার্জন পিতা বা পরিবারকে বাধ্য করে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে কাটাতে; পরিবারের প্রয়োজনের অনুসন্ধান করতে। ফলে সে সন্তানদের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। সে তাদেরকে সমাজের বিচ্যুতির প্রভাবকের সামনে ছেড়ে দেয়। অনুরূপভাবে অতি দারিদ্রতা পিতাকে রুক্ষ মেজাজী ও দ্রুত রাগান্বিত করে তোলে। যার ফলে সে রূঢ় ও কঠোর স্বভাবের হয়। আবার অনেক সময় সে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে সন্তানদের সহযোগিতা নেয় যা তাদের শিক্ষার সুযোগকে নষ্ট করে বা তাদের পড়া লেখার সময় কমিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে বাড়িও পড়ালেখার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।[২] এ সকল অবস্থা পারিবারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, মূর্খতার দ্বারকে উম্মুক্ত করে এবং বিচ্যুতির জানালাকে খোলা রাখে; যা সন্তানদেরকে চারিত্রিক বিচ্যুতির সম্মুখীন করে।

- **দারিদ্রতা ও বেকারত্বঃ**

কিছু কিছু সমাজে ব্যাপকহারে বেকরাত্ব বিদ্যমান। আর এটা ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুপ প্রভাব বিস্তার করে। ড. আব্দুল মাজিদ সায়্যেদ মানসুর ইঙ্গিত করেছেন যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহে কর্মজীবিদের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি গৃহহীন হওয়া, বিভ্রান্তি ও ভিক্ষাবৃত্তির অপরাধের হার বৃদ্ধি করছে, অনুরূপভাবে অশ্লীলতা ও যৌন অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩] আর এগুলো অনেক সময় পারিবারিক দারিদ্রতা ও আবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণের আশার কারণে হয়ে থাকে। ফলে পরিবার বিচ্যুতির কারণে শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় উপার্জনের দিকে যায়। আবার অনেকে মনে করেন যে, দারিদ্রতা, অনির্দিষ্ট জীবিকা ও কষ্টসাধ্য কাজ মাদক গ্রহণ ও তা বিক্রয় প্রসারে সাহায্য করে; বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ঘাতটি পূরণে মাধ্যম হিসেবে।[৪]

পরিবারের কর্তা ও কিশোর অপরাধের মাঝে সম্পর্কের ভিত্তি এই যে, পরিবার প্রধানের বেকারত্ব তার পরিবারের জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক অবস্থা যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে তার দায়িত্বের ত্রুটি; এর ফলে পরিবার তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটির সম্মুখীন হয়। আবার অনেক সময় পিতা ও পরিবারের কর্তার

---

(১) সহীহ বুখারী (১/২৬৮, হাঃ ৮৩২, সহীহ মুসলিম (১/৪১২, হাঃ ১২৯-৫৮৯)।
(২) মুকাদ্দামাতুল খাদামাতাল ইজতেমাইয়া, পৃঃ (৪৪২-৪৪৩)।
(৩) আস-সুলুকুল ইজরামী ওয়াত তাফসীরুল ইসলামী (১/১১০)।
(৪) আল-আয়ামেল আল-মুয়াদ্দিয়া ইলা তায়াতিল মুখাদ্দারাত, পৃঃ (৪৫৮)।

বেকারত্ব মা ও সন্তানদেরকে রিযিকের উৎস অনুসন্ধানে বাধ্য করে। এই অবস্থাগুলো অনেক সময় বিচ্যুতি ঘটার দিকে নিয়ে যায়।[১]

- **দারিদ্রতা ও শিশু-কিশোরঃ**

স্বল্প আয় বা একেবারেই আয় না থাকা, পিতা কর্তৃক কিশোর সন্তানদেরকে অতি অল্প বয়সে কাজ করাতে উৎসাহিত করে। যদিও কিছু কিছু কাজে জড়িত হওয়া যেমন কফিশপ বা বিনোদন কেন্দ্রে কাজ করা কিশোরদেরকে অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। কিছু কিছু গবেষণা প্রমাণ করেছে, যে সমস্ত কিশোররা কাজ করে তাদের মাঝে অপরাধের প্রবণতা যারা কাজ করে না তাদের চেয়ে দ্বিগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত বেশি। অনুরূপভাবে কিশোরদের অল্প বয়সে কর্মে জড়িত হওয়া প্রাপ্ত বয়স্ক বিচ্যুতদের থেকে তাদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা নিয়ে আসে; কিশোরদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা না থাকার ফলে।[২]

- **দারিদ্রতা ও তোষামোদঃ**

তীব্র দারিদ্রতা অনেক সময় বিচ্যুত ব্যক্তিকে কর্ম সম্পাদনের বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে তাকে লেনদেনে তোষামোদি ও চাটুকারিতার দিকে নিয়ে যায়। এই দিকে ইঙ্গিত করে ইবনুল জাওযী রহঃ বলেনঃ আমরা এমন কিছু লোকদের দেখেছি, যারা শাসকদের নিকট থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদেরকে ধোঁকা দেয়। কেউ তাদের তোষামোদি করে, কেউ বা নাজায়েয পর্যায়ের প্রশংসা করে আবার কেউ বা খারাপ কাজ দেখে চুপ থাকে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের চাটুকারিতা করে দারিদ্রতার কারণে।[৩]

- **দারিদ্রতা ও সুস্থ্যতাঃ**

দারিদ্রতা শারিরিক সুস্থ্যতার জন্য বিপদজনক যেহেতু এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে অখাদ্য ও খারাপ বাসস্থান। তা মানসিক সুস্থ্যতার জন্যও বিপদজনক কেননা এর কারণে অস্থিরতা, অসন্তোষ, উদ্বেগ ও বিরক্তির অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়।[4] দারিদ্রতার সাথে অ্যানিমিয়া, যক্ষা ও হাড়ের রিকেটস রোগ ইত্যাদি জটিল রোগের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।[৫] আর এটা খাবার ও ঔষুধের মূল্য জোগাড় করার জন্য বিচ্যুত আচরণ ভিক্ষা বৃত্তির দিকে নিয়ে যায়।

খ- বিচ্যুতির অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে সহযোগী কারণসমূহঃ

এই প্রভাবকের ক্ষেত্রে কতগুলো প্রশ্ন আসে, সেগুলো হল:

শুধুমাত্র দারিদ্রতা বা ধনাঢ্যতা অথবা উভয়টি বিচ্যুত আচরণের জন্য দায়ী? নাকি অন্য কোন প্রভাবক আছে যেগুলো এর যেকোন একটি বা উভয়টির সাথে সম্পৃক্ত হলে বিচ্যুতি সংঘটিত হয়?

---

(১) আল-জারিমা ফিল মুজতামা, পৃঃ (৩৮০)।
(২) পূর্বোক্ত (৩৭৮)।
(৩) সয়দুল খাতের, পৃঃ (১৬১)।
(৪) মুশকিলাতুল ফাকর ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম পৃঃ (১৬)।
(৫) মুকাদ্দামাতুল খাদামাত আল ইজতেমাইয়া পৃঃ (৪৪২)।

এই প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, গবেষকগণ এই বিষয়টি নিয়ে তাদের পরিবেশে গবেষণা চালিয়েছে। তাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, দারিদ্রতার সাথে বিচ্যুতির সম্পর্ক খুবই দূর্বল এবং দারিদ্রতাই একমাত্র বিচ্যুতির কারণ নয়। কেননা অনেক দরিদ্র কিশোরদের মাঝে বীরত্ব ও আমানতদারিতার গুণ বিদ্যমান। বিচ্যুতি তাদেরকে চুরি করতে বা শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় উপার্জন করতে আকৃষ্ট করেনি। বরং তারা বিচ্যুত লোকদেরকে ঘৃণা করে। অপরদিকে অনেক ধনাঢ্য পরিবারে বেড়ে উঠা কিশোরদেরকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়।(১) এ ব্যাপারে আমরা একটি উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি যা প্রমাণ করে যে, দরিদ্রদেরকে তাদের দারিদ্রতা চারিত্রিক বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়নি। এই উদাহরণের নমুনা হলেন চারশ জন দরিদ্র মুহাজির সাহাবী, যাদের মদিনায় কোন বাসস্থান ছিলনা, কোন নিকট আত্মীয় ছিলনা তথাপি তাদের নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছিল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য, তারা রাসূল সাঃ কর্তৃক প্রেরিত সারিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা হলেন আহলে সুফফার সাহাবীগণ।(২) মহান আল্লাহ বলেন: [﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾﴾] [এগুলো অভাবগ্রস্থ লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না; আত্মসম্মানবোধে না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে; আপনি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে ব্যাপারে সবিশেষ জ্ঞানী।](৩)

অর্থনৈতিক দিক থেকে ধনাঢ্যতার আরেকটি উদাহরণ হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র তথাপি অন্য সমাজের চেয়ে তাদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।(৪)

অনুরূপভাবে দারিদ্রতার সাথে বিচ্যুতির সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণার ফলাফলগুলো বৈপরিত্যপূর্ণ। এই দিকে ইঙ্গিত করে বিচ্যুতি বিষয়ক একজন গবেষক বলেন: অর্থনৈতিক কারণ ও কিশোর অপরাধের সম্পর্ক বিষয়ক পরিচালিত গবেষণাগুলোর ফলাফল পরস্পর বিরোধী।(৫) এর কারণ হিসেবে বলেন: এসমস্ত গবেষণার পদ্ধতিগত ঘাটতির কারণে, কেননা তা সূক্ষ্ম তুলনা বা অপরাধীদের নিদিষ্ট নীতির দলের উপর নির্ভর করে তৈরী করা হয়নি। এমনকি এসমস্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কোন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়নি।(৬)

সুতরাং এই উপসংহারে আসা যায় যে, স্বয়ং দারিদ্রতা বা ধনাঢ্যতা বিচ্যুতির কারণ নয়; তবে যদি তার সাথে যুক্ত হয় ইসলামী মূল্যবোধের চরিত্রের উপর দুর্বল প্রতিপালন। এর ফলে দারিদ্রতা বা ধনাঢ্যতা চারিত্রিক বিচ্যুতির প্রভাবক কারণ হিসেবে প্রকাশ পায়। কেননা এমন অনেক ধনী ব্যক্তি পাওয়া যায় যে তার সম্পদের হেফাযত করে এবং একমাত্র শরীয়তসম্মত পন্থায় তা ব্যয় করে। আবার এমন দরিদ্র পাওয়া যায় যে বিচ্যুত না হয়ে তার দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করে। আমার দৃষ্টিতে এর মূল হল প্রতিপালন ও দ্বীনি নিয়ন্ত্রণ। যদি তা দুর্বল হয় বা অনুপস্থিত হয় তাহলে বিচ্যুতির ক্ষেত্রে দারিদ্রতা বা ধনাঢ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

গ- **অর্থনৈতিক নীতিমালা ও বিচ্যুতির ক্ষেত্রে এর প্রভাবঃ**

---

(১) পূর্বোক্ত পৃঃ (৪৪১)।
(২) মাদারিজুস সালেকীন (২/৪৫৬)।
(৩) সূরা আল-বাকারাঃ (২৭৩)।
(৪) আল- জারিমা ফিল মুজতামা, পৃঃ (৩৮৪)।
(৫) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৩৭২)।
(৬) পূর্বোক্ত, পৃঃ (৩৭২)।

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে প্রচলিত হচ্ছে তিনটি নীতি: ইসলামী নীতি, পুঁজিবাদী নীতি ও সমাজতান্ত্রিক নীতি। বাস্তবধর্মী গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, মানব রচিত অর্থনৈতিক নীতি ব্যার্থ হয়েছে, কেননা তা চারিত্রিক বিচ্যুতির ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের জন্য কার্যকর নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছে। তন্মধ্যে উদাহরণস্বরূপ, ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি; যা যাকাত, সাদকা ও ইহসানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মনে করে, দারিদ্রতা নির্মূলের একমাত্র উপায় হল ধনীদেরকে নির্মূল করা, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ও তাদের প্রাচুর্যতা থেকে বঞ্চিত করা। বরং তারা এর চেয়েও দূরে গেছে মালিকানা বাতিলের কারণে বিশেষত উৎপাদিত সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন যমীন ও অস্ত্র ইত্যাদি। তারা দরিদ্র সমাজকে ধনীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের প্রসার ঘটিয়েছে এবং সংঘাতের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে। এমনকি সবশেষে যারা সংখ্যায় বেশি তারাই বিজয়ী হয়েছে। আর তারা হল সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী যাদেরকে তারা সর্বহারা বলে।(১) এর অর্থ হল চারিত্রিক মূলনীতি থেকে সমাজের বিচ্যুত হয়ে খারাপ চরিত্র যেমন সংঘাত, বিদ্বেষ এর দিকে যাওয়া। আর মালিকানার প্রতি আগ্রহের প্রবণতাকে শেষ করে দেওয়া; যার অনুপস্থিতি চারিত্রিক বিচ্যুতির অনেকগুলো কারণকে প্রকাশ করে যার অন্যতম হল মানসিক টেনশন।

অনেক বিতর্ক সংঘটিত হয়েছে বিচ্যুতি ও অপরাধ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজে অপরাধী চরিত্রের জন্য দায়ী। এই মতটি প্রকাশ করেন ইতালিয়ান চিন্তাবিদ (তুরানি), সবচেয়ে প্রশিদ্ধ যে ব্যক্তি পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে সমাজে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জন্য দায়ী করেছন তিনি হল্যান্ডের চিন্তাবিদ ইউনজার। উদাহরণস্বরূপ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আলোকে মানুষকে ধনী-গরিব দুই ভাগে ভাগ করাই সরাসরি চুরির অপরাধের সাথে সম্পর্কিত।(২)

পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী-গরিবের সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। সুতরাং তা ধনী-গরিবের মাঝে শত্রুতা-সংঘাত সৃষ্টিকারী সকল মতবাদ বা মানুষের মাঝে শ্রেণীবিন্যাসের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। আর কেনই বা তা করবে? অথচ ভ্রাতৃত্ব হল ঈমানের সমার্থবোধক ও ইসলামের ফলস্বরূপ।(৩) মহান আল্লাহ বলেন: [﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ﴾] [মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও।](৪)

ইসলাম তাদের মাঝের সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ববোধের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক হিসেবে দেখে, ভ্রাতৃত্ববন্ধন রক্ষা, সাদকা ও ইহসান করার মাধ্যমে; দরিদ্রের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য, যেন শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করে বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যেতে না পারে।

মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে দান সাদকার আদেশ করে বলেন: [﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ﴾] [আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর।](৫) তিনি আরো বলেনঃ [﴿يَٰٓأَيُّهَا

---

(১) মুশকিলাতুল ফাকর ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম পৃঃ (৯)।
(২) আল-জারিমা ফিল মুজতামা পৃঃ (৩৮২)।
(৩) মুশকিলাতুল ফাকর ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম পৃঃ (২৭)।
(৪) সূরা আল-হুজুরাতঃ (১০)।
(৫) সূরা আল-হাদীদঃ (৭)।

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٥٤﴾ [হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর কাফেররাই যালিম।][১]

দারিদ্রতার সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম ধনীদেরকে দরিদ্রদের জন্য দান যেমন যাকাত ও সাদকা করতে এবং সচ্ছল নিকট আত্মীয়দেরকে দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনুরূপভাবে দারিদ্রতা বিমোচনের জন্য সঠিক সমাধানের নির্দেশনা দিয়েছে। এর বর্ণনা পবিত্র কুরআনে নূহ আঃ এর জবানে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন: [﴿فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ١٢﴾] [অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।][২]

ইবনে আব্বাস রাঃ ও অন্যান্যরা বলেন: অর্থাৎ যখন তোমরা তাওবা করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং মানুষদেরকে খাবার খাওয়াবে তখন তোমাদের রিযিক বৃদ্ধি পাবে।[৩] অনুরূপভাবে ইসলাম আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের আশার প্রাঞ্জলতা রোপন করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ [﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢﴾] [তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।][৪] তিনি আরো বলেনঃ [﴿سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧﴾] [অবশ্যই আল্লাহ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি।][৫]

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দারিদ্র চিরস্থায়ী নয়। বরং তা পরিবর্তনশীল। আবার কখনো দূরীভূত হয়ে আবার ফিরে আসে। আজকের দিনের দরিদ্র ব্যক্তিরা হতে পারে আগামীকাল ধনী।[৬] কেননা রিযিক আল্লাহর হাতে। আর ইসলামে মানুষের মর্যাদা অর্থের ভিত্তিতে নয় বরং তাকওয়ার ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ﴾] [তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন।][৭] নবী সাঃ বলেছেন: (বহু এমন লোকও আছে যার মাথা উষ্কখুষ্ক ধুলোভরা, যাদেরকে দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন।)[৮]

---

(১) সূরা আল-বাকারাঃ (২৫৪)।
(২) সূরা নূহঃ (১০-১২)।
(৩) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৪৫৩)।
(৪) সূরা আন-নূরঃ (৩২)।
(৫) সূরা আত-ত্বলাকঃ (৭)।
(৬) মুশকিলাতুল ফাকর ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম পৃঃ (১৩৩)।
(৭) সূরা আল-হুজুরাতঃ (১৩)।
(৮) সহীহ মুসলিম (৪/২০২৪, হাঃ ১৩৮-২৬২২)।

অপরদিকে ধনীদের জন্য সম্পদ ব্যবহারে ইসলামের দিকনির্দেশনা হল, এমন নির্দেশনা যা অপচয় ও বিচ্যুতি হতে মুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَلَا تُسْرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾] [আর তোমরা অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।][১] তিনি আরো বলেন: [﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ٢٧﴾] [এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রাবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।][২] তিনি অন্যত্র বলেন: [﴿وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَاۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧﴾] [আর আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।][৩]

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থা, যা আন্তরিক বন্ধন সৃষ্টি করে; সঠিক সামাজিক সংহতির মাধ্যমে। যা ব্যক্তিকে তার প্রিয় বস্তুকে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর নিকট সাওয়াব ও প্রতিদানের আশায়। আর পারস্পরিক সহযোগিতা দারিদ্রতার ফলে সৃষ্ট গরিবদের বিচ্যুতির বিপক্ষে দাঁড়াতে সাহায্য করে এবং ধনীদের বিচ্যুতিপূর্ণ বিলাসিতার বিপরীতে দাঁড়াতেও সাহায্য করে। যদিও মুসলিম সমাজে ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে বিচ্যুতির পদস্খলন বিদ্যমান কিন্তু সেটা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং ইসলামী শিক্ষার মানহাজ বাস্তবায়ন না করার কারণে।

পূর্বের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কিছু ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে বিদ্যমান বিচ্যুতির জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আর দারিদ্রতা বা ধনাঢ্যতা দ্বীনি নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক চারিত্রিক প্রতিপালনের অনুপস্থিতি বা দুর্বলতার সময় এবং বিপর্যয়কর পরিবেশের উপস্থিতিতে চারিত্রিক বিচ্যুতির অন্যতম কারণ।

চতুর্থতঃ সামাজিক পরিবেশ

পরিবেশ বলতে বুঝায়, মানুষের চার পাশে পরিবেষ্টিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকসমূহ।[৪] আর এটা মানুষের আচরণে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের চারপাশে বেষ্টিত পারিবারিক, গোত্রীয়, শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি বিভিন্ন দল এবং সংস্কৃতি ও বিশ্বাসগত বিভিন্ন ধরণ যা অনেক সময় এক জাতীয় আবার কখনো বা ভিন্নভিন্ন হয়। মানুষকে প্রায়ই তাদের সাথে উঠবসা করতে হয় আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠী হওয়া বা প্রতিবেশীর হুকুমে হওয়ার কারণে। নিশ্চয় এদের সকলের ব্যক্তি জীবনে প্রভাব রয়েছে তার অনুরাগ ও চারিত্রিক পথের ধরণ অনুযায়ী এবং ব্যক্তির সে প্রভাবকগুলো গ্রহণ করার স্তর অনুসারে।

---

(১) সূরা আল-আনআমঃ (১৪১)।
(২) সূরা আল-ইসরাঃ (২৬-২৭)।
(৩) সূরা আল-কাসাসঃ (৭৭)।
(৪) আল খুলুকুল কামেল (১/৬৫)।

সঙ্গী দুই ধরণের হয়ে থাকে: অসৎ সঙ্গী ও সৎ সঙ্গী। কোন ব্যক্তির খারাপ লোকদের সাথে উঠাবসা তার জন্য বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, দুর্বলতা, তাদের পক্ষ হতে বহনের অযোগ্য বোঝা, স্বীয় কল্যাণ বিনষ্ট করা, কল্যাণ বাদ দিয়ে তাদের সাথে ব্যস্ত থাকা এবং তাদের চাহিদার মাঝে নিজের চিন্তাকে নিবনদ্ধ রাখাকে আবশ্যক করে। এরপর তার আল্লাহ ও আখেরাতের জন্য কী বাকী থাকবে?(১) এমনকি আল্লাহর হক নষ্ট করার কারণে যখন পরিতাপ ও আফসোসের দিন আসবে, তখন আফসোস ও পরিতাপ কোন উপকারে আসবে না। সে সময় অত্যাচারী তার উভয় হাত কামড়াতে থাকবে এবং আকাঙ্খা করবে যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করত আর রাসূলের পথকে যদি আঁকড়ে ধরত। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧ يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ٢٨ لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا ٢٩﴾] [যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌছার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।](২) আরেকটি কুরআনিক উদাহরণ রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۢ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ ٦٧﴾] [বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অন্যের শত্রু, মুত্তাকীরা ছাড়া।](৩) তিনি আরো বলেন: [﴿إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ ٱلۡأَسۡبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةٗ فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧﴾] [যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী তাদেরকে দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা কখনো আগুন থেকে বহির্গমণকারী নয়।](৪)

এজন্য সালাফগণ বলতেন: তোমরা দু'ধরণের মানুষ থেকে সতর্ক থাক। এক: প্রবৃত্তি অনুসরণকারী যাকে তার প্রবৃত্তি ফেতনাগ্রস্থ করে রেখেছে, দুই: দুনিয়া পাগল ব্যক্তি যাকে দুনিয়া অন্ধ করে রেখেছে। তারা আরো বলতেন: তোমরা পাপাচারী আলেম ও মূর্খ ইবাদতকারীর ফেতনা থেকে সতর্ক থাক। কেননা তাদের ফেতনাটা সকলের জন্য ফেতনা।(৫)

সুতরাং খারাপ বন্ধুগণ মানুষকে খারাপ পথই দেখাবে, ফলে তারা তার স্বভাবকে খারাপে রূপান্তরিত করবে এবং তার কাছে খারাপ আমলসমূহকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করবে। এমনকি যখন খারাপ চরিত্রে জড়িয়ে পড়বে ও তার কাছে নত হয়ে যাবে এবং সে অধঃপতনের গহ্বরে নিপতিত হবে, তখন সে মর্যাদাবান লোকদের নিকট অপছন্দনীয় ও বিবেকবানদের হতে প্রত্যাখাত হবে। নিকৃষ্ট লোকেরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে আর

(১) মাদারিজুস সালেকীন (১/৪৮৯)।
(২) সূরা আল-ফুরকানঃ (২৭-২৯)।
(৩) সূরা আয-যুখরুফঃ (৬৭)।
(৪) সূরা আল-বাকারাঃ (১৬৬-১৬৭)।
(৫) ইকতেযাইস সিরাতাল মুস্তাকীম, পৃঃ (২৫)।

উত্তম লোকেরো তার থেকে সতর্ক থাকবে। অনুরূপভাবে সে কষ্ট-ক্লেশের মাঝে থাকবে তার উপর খারাপ স্বভাব ও বিকৃত আচরণ ভর করা এবং তার বিচ্যুতির কারণে। এখানে নিচের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা আবশ্যকঃ

জীবন বা কর্মের কারণে খারাপ লোকের সাথে উঠাবসার প্রয়োজন দেখা দিলে একজন মুসলিম কী করবে? তাদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে তাদের অকল্যাণ থেকে বাঁচার উপায় কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, এ সকল ক্ষেত্রে তাদের সাথে লেনদেনের সময় হিকমত অবলম্বন করা আবশ্যক। এর বর্ণনা দিয়ে ইবনুল কায়্যিম আল জাওযীয়া বলেন: তাদের সাথে উঠাবসা করা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের এড়িয়ে চলা সম্ভব না হয়, তবে তাদের সাথে সহমত পোষণ করা থেকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, তার সাহায্যকারী ও শক্তি না থাকলে তাদের কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করবে, কেননা তারা অবশ্যই তাকে কষ্ট দিবে। তবে এই কষ্টের পর তাদের, মুমিনদের ও বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে সম্মান, ভালবাসা, মর্যাদা ও প্রশংসা আসবে।[১]

আর যদি উঠাবসা জায়েয বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে চেষ্টা করবে যেন সেই মজলিসকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগানো যায়, নিজেকে এব্যাপারে উৎসাহিত করবে ও অন্তরকে শক্ত করবে। যদি তার সক্ষমতা এটা করতে অপারগ হয় তবে সে যেন তাদের মাঝ থেকে সেরূপভাবে বেরিয়ে যায় যেরূপভাবে আটার খামির থেকে চুলকে বের করে দেয়া হয়। তাদের মাঝে তার অবস্থা যেন হয়, উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত, কাছে থেকেও দূরে এবং জাগ্রত থেকেও ঘুমন্ত।[২]

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার তথা সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গ গ্রহণ, এটা কাঙ্খিত ও ইপ্সিত। কেননা এখানে কুৎসিত কিছু নেই। বরং এর মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হবে। সুতরাং সৎকর্মশীলগণ ব্যক্তির জন্য শোভা স্বরূপ, যা তাকে প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করাবে, তাদের সহচর্যে সীমাহীন কল্যাণ লাভ হবে, তা তার মাঝে ভাল কাজের প্রতি ভালবাসা ও সে অনুযায়ী আমল করার শক্তি যোগাবে এবং তার মাঝে খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা ও তা পরিত্যাগ করার স্পৃহা তৈরী করবে। ফলে তার স্বভাব ও চরিত্র সুন্দর থেকে সুন্দরতম হবে। কাজেই এদের সঙ্গ গ্রহণে উৎসাহী থাকা উচিত। তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল সাঃ বলেন: (সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হল কস্তুরী বহনকারী (আতর বিক্রেতা) ও কামারের হাপরের ন্যায়। মৃগ-কস্তুরী বহনকারী হযত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি লাভ করবে সুবাস। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে পাবে দুর্গন্ধ।)[৩] যদিও চারিত্রিক বিচ্যুতির ক্ষেত্রে পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, তথাপি তা এমন কোন জটিল কারণ নয় যার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা দুষ্কর। কেননা এমন কত লোক রয়েছে যারা কুফর ও নাস্তিকতার মাঝে জীবন যাপন করেছে, কিন্তু তারা তাকওয়ার ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ। আবার এমন কত ব্যক্তি রয়েছে যারা উত্তম তাকওয়া সম্পন্ন গৃহে লালিত-পালিত হয়েছে, তথাপি তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়নি বরং বিচ্যুত হয়েছে ও পরিবেশের পথ থেকে সরে গেছে ফলে তারা কুফর ও নাস্তিকতার উদাহরণে পরিণত হয়েছে। নূহ আঃ ও লূত আঃ এর স্ত্রীরা ছিল নবী গৃহে, কিন্তু তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অপরপক্ষে ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন কুফরী গৃহে কিন্তু তিনি হককে বুঝতে পেরেছিলেন তাই তো কুফর থেকে সঠিক পথে ফিরে এসেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ١٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا

---

(১) মাদারিজুস সালেকীন (১/৪৯০)।
(২) পূর্বোক্ত।
(৩) সহীহ বুখারী (৩/৪৬৩ হাঃ ৫৫৩৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০২৬, হাঃ ১৪৬/২৬২৮)।

لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١﴾] [যারা কুফরী করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন নূহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর, তারা ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হল, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদের জন্য পেশ করেন ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার রব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।][(১)]

এর অর্থ সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে হেয় করা নয় বরং তা ব্যক্তির আচরণে সবচেয়ে বড় প্রভাবক। কেননা সঙ্গ গ্রহণের জন্য আবশ্যক হল সাদৃশ্যতা গ্রহণ। কিন্তু ব্যক্তি তার প্রচেষ্টা দ্বারা আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যে এ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

আরো কতগুলো প্রভাবক রয়েছে যা খারাপ চরিত্রের ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখে ও তার কারণ হিসেবে বিবেচিত এবং উত্তম চরিত্র থেকে বিচ্যুতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব ক্রিয়াশীল। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১- শিক্ষণীয় প্রতিপালনের অভাবঃ

সঠিক শিক্ষণীয় প্রতিপালনকে উন্নত প্রশংসনীয় আচরণের জন্য ফলস্বরূপ গণ্য করা হয়, অনুরূপভাবে খারাপ প্রতিপালন নোংরা চরিত্রের মূল। বরং খারাপ প্রতিপালন মানুষের আক্বীদার মূলে প্রভাব ফেলে এবং তাকে তার প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্যুত করে। নবী সাঃ এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন: (প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহুদী বা খৃস্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রুপান্তরিত করে।)[(২)]

আর শিক্ষণীয় প্রতিপালনের অভাব বিভিন্ন দিক থেকে হয়ে থাকে যা ব্যক্তি ও সমাজের চরিত্র গঠনে ভুমিকা রাখে, সেগুলো হল:

- **শিক্ষাগত দিক:**

ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরয়ী ইলমের বিষয়ে দুর্বল প্রতিপালন সবচেয়ে বড় স্বীয় নিরাপত্তাকে হারিয়ে ফেলে। কেননা শরয়ী ইলমই ব্যক্তির অন্তরে তাকওয়ার বীজ বপন করে এবং দুনিয়া পরবর্তীতে যে নিয়ামত বা শাস্তি রয়েছে সে বিষয়ে দূরদর্শিতা তৈরী করে। যা তাকে ভাল কাজে অগ্রগামী করে ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

ব্যক্তির অন্তরে শরয়ী শিক্ষার অভাব তাকে এমন মূর্খতার দিকে নিয়ে যায় যা তাকে মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। কাজেই তা খারাপের জখমে ও বিপদের কষ্টে এবং নিকৃষ্ট চরিত্রে ব্যাথায় নাড়া দেয় না। শাইখুল ইসলাম

---

(১) সূরা আত-তাহরীমঃ (১০-১১)।
(২) সহীহ বুখারী (১/৪২৪ হাঃ ১৩৮৫), সহীহ মুসলিম (৪/২০৪৭, হাঃ ২২/২৬৫)।

ইবনে তাইমিয়া বলেন: ব্যাপক মূর্খতায় অন্তর মৃত্যুবরণ করে, আর যে কোন ধরণের মূর্খতায় তা রোগাক্রান্ত হয়।[১]

শরয়ী ইলম বাদ দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা অন্তর ও বিবেকে ফাটল সৃষ্টি করে। ফলে ঐ ব্যক্তি শুধু ঐসকল জ্ঞানই জানে যা আখেরাত বিমুখ হয়ে তার দুনিয়াবী লালসা বাস্তবায়ন করবে। ফলশ্রুতিতে সে চুরি করবে, আক্রমণ করবে, যিনা করবে ও হারাম কাজে জড়িত হবে।

- **আক্বীদা ও ইবাদতগত দিকঃ**

ব্যক্তিকে আক্বীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রতিপালন, তাকে সহজে প্রবৃত্তি ও আনন্দের পিছনে তাড়িত করবে; যা তাকে বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যাবে। কেননা সঠিক আক্বীদা ও ইবাদত একজন মুসলিমের মাঝে দৃঢ় বিশ্বাস, সুদৃঢ় দূরদর্শিতা, চরম ধৈর্য ও উচ্চাকাঙ্খা সৃষ্টি করে এবং হীনমন্যতা থেকে দূরে রাখে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥﴾] [আপনি তেলাওয়াত করুন কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয় এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।][২]

অশ্লীলতা হল যার কদর্যতা সকলের নিকট স্পষ্ট এবং সকল বিবেকবান ব্যক্তি তা খারাপ মনে করে। তাই একে যিনা ও সমকামিতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। আল্লাহ একে ফাহেশা বলেছেন যেন মানুষরা এর নোংরামি থেকে বিরত থাকে। অনুরূপভাবে নোংরা কথাকেউ অশ্লীলতা বলা হয়। আর তা হল যার কদর্যতা খুবই স্পষ্ট যেমন গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া ইত্যাদি।[৩]

আর বান্দা যখন নির্দেশিত পন্থায় সালাত আদায় করে তখন তা তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এটা জ্ঞাত বিষয় যে কোন ব্যক্তি যদি গোপন বিনয়ের ও প্রকাশ্য আমলের মাধ্যমে এই সালাতের হেফাযত করে এবং সে আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে, তবে সে ওয়াজীব সময় বাস্তবায়ন করবে ও কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।[৪] আর যখন দ্বীনি প্রতিপালন দূর্বল হবে তখন ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণের দিকে ধাবিত হবে।

- **চারিত্রিক দিকঃ**

ইসলামী মূল্যবোধের উপর দুর্বল চারিত্রিক প্রতিপালন ব্যক্তিকে এর বিপরীত খারাপ আচরণে জড়িত হওয়াকে অতি সহজ করে দেয়। কেননা সে ধৈর্য্যের শিক্ষার উপর গড়ে উঠেনি। যার ফলে তার খামখেয়ালিপনা ও প্রবৃত্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে পারে না। সে লজ্জাশীলতার শিক্ষা পায়নি যার ফলে সে অপরাধ কর্ম করতে লজ্জাবোধ করে না। সে সততা ও আমানতদারিতার শিক্ষা পায়নি তার ফলে সে চুরি করে, প্রতারণা করে এবং কথা ও কাজে ধোঁকা দেয়।

---

(১) ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া (১০/৯৪)।
(২) সূরা আল-আনকাবূতঃ (৪৫)।
(৩) মাদরিজুস সালেকীনঃ (১/৪০২)।
(৪) ইবনে তাইমিয়া রচিত আল-ঈমান পৃঃ (২৮-২৯)।

ইবনে হাযম রহঃ বলেন: সৌভাগ্যবান সেই যার অন্তর ভাল কাজে প্রশান্তি পায় এবং খারাপ ও পাপ কাজ থেকে পলায়ন করে। আর দুর্ভাগা সে যার অন্তর খারাপ ও পাপ কাজে প্রশান্তি পায় এবং ভাল ও আনুগত্যের কাজ থেকে পলায়ন করে।[১] কাজেই চারিত্রিক প্রতিপালনের দুর্বলতা বিচ্যুতি ও বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় কারণ।

- **শাস্তিগত দিকঃ**

অপরাধ দমনে শাস্তির কার্যকর প্রভাব রয়েছে। আর শাস্তি প্রয়োগ না করা ব্যক্তি ও সমাজকে শয়তানের আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করার সুযোগ সৃষ্টি করে। যেহেতু বর্তমান সমাজে ইসলামী শাস্তি প্রয়োগ হয়না, তাই তা চারিত্রিক বিচ্যুতির সম্মুখীন হচ্ছে। কেননা মানব রচিত আইন একদিক থেকে বিচ্যুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, অপরদিকে সেখানে শরয়ী নিয়ন্ত্রণ অনুপস্থিত।

আর অপরাধী যখন প্রতিরোধমূলক শাস্তি পায়না তখন অকল্যাণ তার অন্তরের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন: অপরাধী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের শাস্তি পরিপূর্ণ হয়না যদি না তা প্রতিরোধকারী কষ্টদায়ক না হয় এবং যারা এরূপ কর্ম করতে চায় তাদের জন্য অপরাধী একজন শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত না হয়। এজন্য ছোট-বড়, কম-বেশী অপরাধ অনুযায়ী তার কোন কিছু নষ্ট করা আবশ্যক।[২] কাজেই শরয়ী শাস্তি বাস্তবায়ন ব্যতীত কোন প্রতিরোধকারী নেই।

২- খারাপ আদর্শঃ

খারাপ আদর্শ অন্যদের মাঝে কার্যকর প্রভাব ফেলে; কেননা তা অন্যদের সামনে বিচ্যুতির বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করে। আর এটা স্পষ্ট করে পথ, পন্থা ও প্রতারণার মাধ্যমে যা দুর্বল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদেরকে বিচ্যুত আচরণের দিকে নিয়ে যায়।

রাসূল সাঃ এর ও এর সাথে জড়িত ব্যক্তির ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন, আরো বর্ণনা করেছেন যারা এর অনুসরণ করবে ও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে তাদের বোঝা তাকে বহন করতে হবে। নবী সাঃ বলেন: (যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থী) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না।)[৩]

খারাপ আদর্শ হয় নোংরা কথা ও নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে; চায় তা সরাসরি হোক বা ছবি, লেখনি অথবা অন্যকোন মাধ্যমে হোক যেটাকে মানুষ অন্যের মাঝে প্রভাব বিস্তার করার জন্য ব্যবহার করে ও তাদের মাঝে বিপর্যয় বিস্তার করে।

সুতরাং খারাপ আদর্শ বিচ্যুত আচরণের বাস্তব উদাহরণ, কেননা তার প্রভাব ব্যাপক। বিশেষ করে যদি সে আদর্শ ব্যক্তি ভাল মানুষদের নিকট প্রিয় হয় ও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন পিতা, শিক্ষক, বন্ধু ইত্যাদি। অথবা

---

(১) আল-আখলাক ওয়াস সিয়ার পৃঃ (১৮)।
(২) আলামুল মুয়াক্কেয়ীন (২/১২২)।
(৩) সহীহ মুসলিম (২/৭০৫, হাঃ ৬৯-১০১৭)।

খারাপ আদর্শের ব্যক্তি এমন বৈশিষ্ট্যের হবে যাতে শারীরিক বা মেধাভিত্তিক একধরণের শক্তি রয়েছে। ফলে অন্যরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং বিচ্যুতির ক্ষেত্রে তার পথই অনুসরণ করবে।

সুতরাং কিশোর ও যুবক বয়সে বীরত্বপূর্ণ গুণের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়, যেহেতু ব্যক্তি এই সময় বীরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই যদি সমাজে খারাপ আদর্শ বিদ্যমান থাকে আর উত্তম আদর্শ অনুপস্থিত থাকে, তবে যুব সমাজ তাদের নষ্ট চরিত্রেরই অনুসরণ করে, যেমন চুরি করা, ডাকাতি করা, ছিনতাই করা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে যদি খারাপ আদর্শ অনুপস্থিত থাকে ও উত্তম আদর্শ প্রকাশিত হয়, যা ভালকাজে বীরত্বের প্রতি গুরুত্ব দেয়, তবে যুব সমাজ তার অনুসরণ করে। যেমন অন্যদের সাহায্য করা, ভাল কাজে কষ্ট ও দুর্দশা সহ্য করা ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে বৃদ্ধ বয়সের মানুষ, যদি দুষ্টপ্রকৃতির বৃদ্ধ তার আচরণে এমন কিছু থাকে যা অনুসরণ ও খারাপ আদর্শের মাধ্যম তবে তা তার সমবয়স্কদের মাঝে প্রভাব ফেলে। আর মানুষ পরস্পরের কার্যক্রম ও অুনসরণের ক্ষেত্রে বিড়ালের পালের ন্যায়, যারা পারস্পারিক সাদৃশ্য রাখতে অভ্যস্ত।[১]

৩- বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতধারা দ্বারা প্রভাবিত হওয়াঃ

ইসলামী সমাজের জন্য শত্রুদের থেকে আগত বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতধারাকে চরিত্রের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক মনে করা হয়। যেহেতু আকর্ষণীয় বক্তব্য, রঙ্গিন স্ক্রিন ও সরাসরি সম্প্রচারগুলোতে অন্ধকার রাত্রীর ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিক ফেতনা ছড়ানো হয়। তা দৃঢ় বিশ্বাসের পরিবর্তে সংশয়ের বীজ বপন করে ও ফেতনা ছাড়ায় যা চরিত্রকে নষ্ট করে ও অধঃপতিত করে। বায়বীয় চিন্তার স্রোতধারার বিস্তৃতি বিভিন্ন উপায়ে হয়ে থাকে যা নিম্নরূপঃ

- **সরাসরি সম্প্রচারঃ**

সরাসরি সম্প্রচার সবচেয়ে দ্রুততম অধুনিক মাধ্যমে যা পূরো বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে এবং মানুষের মাঝে ভাল-মন্দ সমানভাবে প্রচার করেছে। আর মন্দের পরিমাণই ব্যাপক ও অধিক।

কাফের ও ইতর লোকদের খারাপ চরিত্রগত অভ্যাস সম্প্রচার করা হয় যা দ্বীন ও চরিত্রকে নষ্ট করে, সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে এবং বিপর্যয় ও দুশ্চরিত্রের বিস্তার করে; এগুলোকে আকর্ষণীয় পোষাকে উপস্থাপনের মাধ্যমে। এর ফলে যুব সমাজ ও দুর্বল আত্মার মানুষেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং তাদের উপর কুপ্রবৃত্তি ভর করছে।

- **তরজমা বা অনুবাদঃ**

বিচ্যুত চিন্তাধারা আরবী ভাষায় অনুবাদ করায় ঐ সমস্ত পাঠকদের উপর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যাদের শরয়ী ও জ্ঞানগত সুরক্ষা নেই; যা তাদেরকে পঠিত চিন্তার ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবে।

(১) ইবনে তাইমিয়া রচিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ পৃঃ (৪৪)।

যেমন সে চিন্তার অনুবাদ করা যা নারী স্বাধীনতা ও তাদের বাড়ী থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য আহবান করে, যেন তারা পুরুষদের সাথে বাজারে, কারখানায়, শ্রেণীকক্ষে ও সকল স্থানে দাঁড়াতে পারে। আর এর বিরোধীতা করাই পশ্চদপদতা। আবার কতগুলো গল্প ও বর্ণনার মাধ্যমে যুব সমাজকে হারাম সম্পর্কে জড়াতে উৎসাহিত করে, যাকে সুশোভিত করা হয় আন্তর্জাতিক বর্ণনা নামকরণ করে। আবার কতগুলো পাঠকের সামনে অপরাধের পথকে স্পষ্ট করে, কিভাবে এর জন্য পরিকল্পনা করবে, কিভাবে বাস্তবায়ন করবে ইত্যাদি। এ ধরণের অনুবাদগুলোর মানুষের আচরণের উপর মারাত্মক প্রভাব রয়েছে।

- **কাফের দেশে ভ্রমণঃ**

বিনা প্রয়োজনে কাফের দেশে ভ্রমণ করা ভ্রমণকারীদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। যেহেতু তারা হারাম চর্চা দেখতে পায়, যা তাতে পতিত হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেটাকে তাদের সমাজে স্থানান্তরিত করার দিকে পরিচালিত করে বা এসম্পর্কে ও তার প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে উৎসাহিত করে।

আবার অনেক সময় সে দিকে আহবান করতে ও তা প্রচার করতে ভুমিকা রাখে। কাজেই মুসলিম সমাজে অবাধ মেলামেশা, পর্দাহীনতা ও মাদকের বিস্তৃতির পিছনে সফরের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

সম্মানিত শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বায রহঃ -আল্লাহ তার উপর রহম করুন- কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সেসকল কোম্পানী সম্পর্কে যারা বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করে মুসলিম সন্তানদেরকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য গ্রীষ্মের ছুটি পাশ্চাত্যে কাটনোর জন্য আহবান করে।

তিনি এর উত্তরে বলেন:(১) মুসলিমদের সাথে কাফেরদের শত্রুতার বিষয়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, এর উদ্দেশ্য হল তারা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোন ধরণের ত্রুটি করে না। এ ক্ষেত্রে তাদের অসংখ্য পদ্ধতি এবং প্রকাশ্য ও গোপন মাধ্যম রয়েছে। তারমধ্য হতে বর্তমানে প্রকাশ পেয়েছে কিছু ভ্রমণ ও পর্যাটন কোম্পানী কর্তৃক এমন বিজ্ঞাপন প্রচার যাতে এই দেশের সন্তানদেরকে ইংরেজী শিক্ষার অযুহাতে গ্রীষ্মের ছুটি ইউরোপ আমেরিকায় কাটানোর আহ্বান জানানো হয়। তারা সফরের পূরো সময়ের জন্য একটি পূর্ণ প্যাকেজ তৈরী করে। এই প্যাকেজে বিভিন্ন ধারা থাকে তন্মধ্যেঃ

ক- ছাত্রের অবস্থানের জন্য একটি ইংরেজ কাফের পরিবার চয়ন করা; যদিও এতে অসংখ্য বিপদের কারণ রয়েছে।

খ- যে শহরে অবস্থান করবে সে শহরে মিউজিক অনুষ্ঠান, নাট্যমঞ্চ ও বিভিন্ন বিনোদনে ছাড়ের ব্যবস্থা করা।

গ- নাচ ও বিনোদন কেন্দ্র পরিদর্শন করা।

ঘ- ইংরেজ যুবতীদের সাথে ডিসকো নাচ ও নাচের প্রতিযোগিতা চর্চা করা।

(১) ফাতাওয়া ইসলামীয়া (১/১১৮-১১৯)।

৬- এক ইংরেজ শহরের বিনোদন কেন্দ্রে প্রাপ্য বিষয়ের বর্ণনায় এসেছে: (নাইট শো, ডিসকো নাচ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আধুনিক জায ও রক মিউজিক, নাট্যমঞ্চ ও সিনেমা হল এবং ঐতিহ্যবাহী ইংরেজ মদের বার।)

এ ধরণের বিজ্ঞাপনগুলো অনেক মারাত্মক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, তন্মধ্যেঃ

- মুসলিম যুবকদেরকে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট করা।
- চরিত্র নষ্ট করা ও খারাপ কাজে জড়িত করা, নষ্টের উপকরণগুলো সহজলভ্য ও হাতের নাগালে করার মাধ্যমে।
- মুসলিমদের আক্বীদায় সন্দেহের সৃষ্টি করা।
- পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি মুগ্ধতা ও আকর্ষণের মনোভাব তৈরী করা।
- পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট আচার আচরণে অনেক বেশি অভ্যস্ত হওয়া।
- দ্বীনের প্রতি মনোযোগ না দিতে ও তার আদেশসমূহ ও আদবের প্রতি দৃষ্টি না দিতে অভ্যস্ত হওয়া।
- মুসলিম যুব সমাজকে প্রস্তুত করা যেন এই সফর থেকে ফিরে যাওয়ার পরে তারা তাদের দেশে পাশ্চাত্যের দিকে আহ্বানকারী হয় এবং তারা পশ্চিমা চিন্তাধারা, অভ্যাস ও জীবনধরণ পদ্ধতি দ্বারা তৃপ্ত হয়।

ইত্যাদি বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেগুলো বাস্তবায়নে ইসলামের শত্রুরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অসংখ্য পথ ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে।

যারা শিক্ষার জন্য বিদেশে সফর করে সে ভাষা দ্বারা অধিক উপকৃত হওয়ার আশায় পরিবারসহ বসবাস করছে তাদের হুকুম সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে সম্মানিত শায়খ বলেন: সেখানে পরিবারসহ বসবাস করা জায়েয নয়, যেহেতু ছাত্রের কাফেরদের চরিত্র ও নারী দ্বারা ফেতনায় পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর ছাত্রের বসবাস ফেতনার স্থান থেকে দূরে হওয়া আবশ্যক। এই আলোচনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করা বৈধ এমতের উপর ভিত্তি করে। তবে সঠিক হল, চরম প্রয়োজন ছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাফের দেশে সফর করা জায়েয নয়, তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল, তাকে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে এবং সে ফেতনার উপকরণ হতে দূরে থাকবে।(১)

৪- সামাজিক সুপরামর্শের অভাবঃ

নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধের মাধ্যমে সামাজিক সুপরামর্শ সামাজিক বিশুদ্ধতা ও নিরাপত্তার মূল। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾] [নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।](২)

(১) প্রাগুক্ত (১/১১৭)।
(২) সূরা আল-মায়েদাঃ (২)।

রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর।)[১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজীব, উত্তম ও সুন্দর আমল।[২]

আর যখন সামাজিক সুপরামর্শের অভাব হবে, তখন বিচ্যুত ব্যক্তি বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য তার সামনে উন্মুক্ত সুযোগ পেয়ে যাবে। কেউ তাকে বিচ্যুতি থেকে নিষেধ করবে না এবং কেউ তার সমালোচনাও করবে না। ফলে সে ভ্রষ্টতা ও বক্রতা আরো বাড়িয়ে দিবে। হয়ত তার দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হবে। কাজেই নারী তাকে খারাপ চরিত্র থেকে নিষেধ করার জন্য কাউকে পাবে না, ছোটরা অসৎ আমলের ব্যাপারে আদব দেয়ার কাউকে পাবে না, যুবকেরা খারাপ চরিত্র থেকে সতর্ক করার কাউকে পাবে না এবং প্রাপ্তবয়স্কদেরকে কেউ সঠিক কাজ ও উন্নত চরিত্রের আদেশ করবে না। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এর ফলে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে; কেননা তার সদস্যগুলো এমন স্বাধীনতা পেয়েছে যা সমালোচনা ও নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত। কাজেই মানুষেরা প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন লাঞ্ছনাবোধ করে না।

জাতির সদস্যদের মাঝে সামাজিক সুপরামর্শের অভাবের কারণগুলো নিম্নরূপঃ

- **ব্যক্তিগত ব্যস্ততাঃ**

মানুষ তার ব্যক্তিগত বিষয়ে, তা পর্যালোচনায় ও নিজস্ব কল্যাণ বাস্তবায়নের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে সে সত্য বলা ভুলে যায়; যে সত্য মানুষকে ভাল কাজ করতে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। অনেক সময় বন্ধু, প্রতিবেশী বা কোন সন্তানের মাঝে ত্রুটি দেখতে পায়, কিন্তু নিজের বিষয়ে ব্যস্ত থেকে অন্যদের কল্যাণ বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেয় না। আর এতে বিরাট অকল্যাণ রয়েছে যা উম্মতের উপর বর্তায় এমনকি ঐ ব্যক্তির উপরও বর্তায়। নবী সাঃ বলেছেন: (যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তাঁর আযাব নিপতিত করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।)[৩]

- **আর্থিক প্রতিযোগিতাঃ**

সামাজিক সুপরামর্শের অভাবের অন্যতম কারণ হল মানুষের মাঝে আর্থিক প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্থ জমা করার পিছনে ছুটছে, যা মানুষকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করছে। ফলে মানুষদেরকে তাদের চরিত্রগত দিক বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হচ্ছে। যার ফলে মানুষেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ পরিত্যাগ করে সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতার পিছনে দৌড়াচ্ছে। আবার অনেক সময় বিচ্যুত লোকদের সম্পদের কারণে তাদের সাথে উঠাবসা করছে, খাচ্ছে ও তোষামোদ করছে; তাদের থেকে কিছু পাওয়ার আশায়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে সতর্ক করেছেন এবং বিচ্যুত লোকদের সাথে মেলামেশা করার ফলে বনী ইসরাঈলরা কী শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল তার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: [﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ

(১) সহীহ মুসলিম (১/৬৯, হাঃ ৭৮-৪৯)।
(২) ইবনে তাইমিয়া রচিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ পৃঃ (২৬-২৭)।
(৩) সুনানে তিরমিযি (৪/৪০৬, হাঃ ২১৬৯), তিনি বলেন: এই হাদিসটি হাসান। শায়খ আলবানীও হাদিসকে হাসান বলেছেন।

بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ۝٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ۝٧٩﴾ [বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট।](১)

- **দায়িত্ববোধ অনুভব না করাঃ**

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজের দায়িত্ববোধ অনুভব না করার ফলে তা তাদেরকে এই বিধানের প্রতি অজ্ঞতা ও বাস্তবায়ন না করার দিকে নিয়ে গেছে। নবী সাঃ বলেছেন, যেমনটি পূর্বের হাদিসে এসেছে: (যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর তাঁর আযাব নিপতিত করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।)(২)

কাজেই উম্মতের যে বিষয়টি একান্ত প্রয়োজন তা হল, এই বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে দায়িত্বের পরিধি জানা, যেন তারা আল্লাহর আবশ্যকীয় বিধান পালন করতে পারে।

৫- খারাপ সঙ্গীঃ

বন্ধুর উপর তার কথা, কাজ ও বিশ্বাসে খারাপ বন্ধুর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। আর ইসলামী শিক্ষানীতি এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদিসে সতর্ক করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۭ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ ۝٦٧﴾] [বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অন্যের শত্রু, মুত্তাকীরা ছাড়া।](৩) তিনি আরো বলেন: [﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ۝٢٧ يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ۝٢٨ لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا ۝٢٩﴾] [যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌছার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।](৪) আর নবী সাঃ বলেছেন: (মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর গড়ে উঠে, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিৎ সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।)(৫)

সুতরাং খারাপ সঙ্গী ব্যক্তির বিশ্বাসের উপর ও ইবাদতের বিধান পালনের উপর প্রভাব ফেলে। অনুরূপভাবে তা ব্যক্তির আচরণ ও চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে। ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন: খারাপ বন্ধু তার জন্য বিচ্ছিন্নতা, বিভক্ততা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, দুর্বলতা ও এমন বোঝা নিয়ে আসে যা বহন করতে সক্ষম নয়। তার কল্যাণ বিনষ্ট

---

(১) সূরা আল-মায়েদাঃ (৭৮-৭৯)।
(২) হাদিসটির তাখরিজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
(৩) সূরা আয-যুখরুফ: (৬৭)।
(৪) সূরা আল-ফুরকান: (২৭-২৯)।
(৫) সুনানে আবু দাউদ: (৫/১৬৮, হাঃ ৪৮৩৩)।

হয়, কল্যাণ বাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে ও তাদের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের চাহিদা ও দাবীর পিছনে চলে তার চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই আল্লাহ ও পরকালের জন্য তার কী বাকী থাকে?[১]

বস্তুত খারাপ সঙ্গী হক হতে বাধা প্রদান করে, বাতিলের আদেশ দেয়, মিষ্ট ভাষায় খারাপ জিনিসকে সুশোভিত করে ও ভাল কাজ হতে নিষেধ করে; অকল্যাণ ও ফাসাদের প্রতি ভালবাসায় এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি ঘৃণায়।

যেসব পরিবেশে মানুষ খারাপ সঙ্গীর শিকারে পরিণত হয় তা নিম্নরূপঃ

- **পড়ার সাথীঃ**

মাদরাসার সহপাঠীরা কোন সময় ভাল হয় আবার কোন সময় খারাপ হয়; উভয় প্রকার হতে কোন একটিকে এখতিয়ার করা এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আলোকে। তাদের সাথে অধিক পরিমাণে উঠাবসা করা তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ আবশ্যক করে, এজন্য নবী সাঃ আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেছেন: (সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হল কস্তুরী বহনকারী (আতর বিক্রেতা) ও কামারের হাপরের ন্যায়। মৃগ-কস্তুরী বহনকারী হযত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি লাভ করবে সুবাস। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে পাবে দুর্গন্ধ।)[২]

এজন্য পরিবারের উপর ওয়াজীব হল, তারা তাদের সন্তানদেরকে উত্তম সাথী নির্বাচনের দিকনির্দেশনা দিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরও অনুরূপ কর্তব্য, তারা তাদের সকল ছাত্রদেরকে উত্তম সাথী হিসেবে গড়ে তুলবে।

- **আত্মীয়-স্বজনঃ**

সকল আত্মীয়-স্বজনই কল্যাণকামী ও ভাল নয় এবং আত্মীয়দের সকল সন্তানেরাও সৎকর্মশীল নয়। এ ক্ষেত্রে অনেক পরিবার উদাসীন থাকে এবং তাদের সন্তানদেরকে খারাপ আত্মীয়দের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ দেয়। যার ফলে ক্ষতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর তারা বিচ্যুত আচরণের উপর পরস্পর অধিক সহযোগিতা করে। যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে প্রবৃত্তির সম্পর্ক সম্পৃক্ত থাকে। কাজেই এ ধোঁকা থেকে পরিবারের সতর্ক থাকা উচিত এবং খারাপ লোকদের থেকে বেঁচে থাকা উচিত তারা যে পর্যায়েরই আত্মীয় হোক না কেন।

- **গ্রামের সাথীঃ**

স্থানগত নৈকট্য, সহজ সাক্ষাত ও বিপর্যয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাথী হওয়ার কারণে অনেক সময় গ্রামের লোকদের মধ্য হতেই খারাপ সঙ্গী হয়ে থাকে। আর এটা ছোট-বড় সকলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। গ্রামের এ ধরণের খারাপ সঙ্গী হওয়ার পিছনে পিতা-মাতার উদাসীনতার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বিশেষত যখন গ্রামের

(১) মাদারিজুস সালেকীনঃ (১/৪৮৯)।
(২) সহীহ বুখারী (৩/৪৬৩, হাঃ ৫৫৩৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০২৬, হাঃ ১৪৬-২৬২৮)।

লোকদের মাঝে ভাল ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ও সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধের সুপরামর্শের অভাব থাকে।

- **কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীঃ**

কর্মক্ষেত্রে খারাপ সহকর্মীর অপর সহকর্মীদের উপর কার্যকর প্রভাব রয়েছে। যেহেতু ব্যক্তিগত কাজের মঙ্গলের জন্য তাদের মাঝে সম্পর্ক বিদ্যমান। যা কোন কোন সময় এমন গভীর হয় যে পারস্পরিক যিয়ারত ও সম্পর্ক তৈরীতে রূপ নেয়। ফলে তাদের মাঝে সম্পর্ক গভীর হয় এবং তাদের মাঝে ধারাবাহিক ফ্যাসাদের চিত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যক্তি যদি সতর্ক না হয় তবে কিছু সময় পর দেখবে যে সে তাদের মতই খারাপ হয়ে গেছে।

এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে এমন শক্তিশালী সংকল্পে অভ্যস্ত হতে হবে, যেন কোন বিচ্যুত ব্যক্তি তার উপর প্রভাব ফেলতে না পারে। আর ঐ ধরণের সম্পর্কগুলো যেন কাজের ও দায়িত্বপালনের পরিধি অতিক্রম না করে। সর্বপরি সে তার কর্মক্ষেত্রে কল্যাণকামিতার উত্তম ভিত্তি হবে, যা দ্বারা তার চারপাশের লোকদের অবস্থা সংশোধন হবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বিচ্যুত আচরণসমূহের দায়ভার

উম্মতের মাঝে বিচ্যুত আচরণের উপস্থিতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে অধঃপতনের আলামত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর ইসলামী শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ব্যক্তিদের মাঝে ত্রুটি বিদ্যমানতার বিষয়ে এটা একটা ইন্ডিকেটর। বিচ্যুত আচরণের বিষয়ে শিক্ষার এই দায়ভার কোনটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং প্রত্যেক কর্তৃপক্ষই তাদের অবহেলার পরিমাণ অনুযায়ী দায়ী। সুতরাং দেশের কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, অনুরূপভাবে পরিবারের, সমাজ ও ব্যক্তির তাদের পরিমাণ অনুযায়ী দায়ভার রয়েছে। নবী সাঃ বলেছেন: (তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (ইমাম) একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষনাবেক্ষন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবনু উমর রাঃ বলেন আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, ছেলে তার পিতার সম্পত্তির রক্ষক এবং সে জিজ্ঞাসিত হবে তার রক্ষনাবেক্ষন সম্বন্ধে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।)[১]

বিচ্যুত আচরণের জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ ব্যক্তিগত দায়ভারঃ

মানুষের উপর তার ব্যক্তিগত দায়ভার বর্তায়। সুতরাং সে তার চলাচল, বিচ্যুতি ও তদসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে দায়িত্বশীল। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨﴾] [প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।][২] তিনি আরো বলেন: [﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ٨﴾] [কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে।][৩]

কাজেই কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে, সে তার বিচ্যুতির জন্য সামাজিক পরিবেশকে দায়ী করবে, -যে পরিবেশে সে বসবাস করছে তা যদি বিচ্যুত হয়- অথবা খারাপ বন্ধু বা পরিবারকে দায়ী করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার দায়িত্ব বহন করতে পারে। তাকে জ্ঞান দান করেছেন যা বিধি-বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ভিত্তি, আর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, যাদের সর্বশেষ হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ, কুরআন আমাদের মাঝে বিদ্যমান, অনুরূপভাবে সুন্নাহ ও বিদ্যমান যা আমাদেরকে হকের পথ দেখায় এবং আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য কি আবশ্যক করেছেন আর কি নিষেধ করেছেন তা বর্ণনা

(১) সহীহ বুখারী (১/২৮৪-২৮৫, হাঃ ৬৮৯৩), সহীহ মুসলিম (৩/১৪৫৯, হাঃ ২০/১৮২৯)।
(২) সূরা আল-মুদ্দাস্সিরঃ (৩৮)।
(৩) সূরা আয-যিলযালঃ (৭-৮)।

করে এবং মানব মনে এমন কিছুর উদ্রেক করে যা এগুলোকে আবশ্যক করে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ٨﴾] [তারপর তাকে তার সৎকাজের এবং তার অসৎ-কাজের জ্ঞান দান করেছেন।][(১)] অর্থাৎ তার জন্য ভাল-মন্দ বর্ণনা করে দিয়েছেন।[(২)] শাওকানী বলেন: অর্থাৎ তাকে জানিয়েছেন ও বুঝিয়েছেন তার জন্য কি এবং এর মাঝে কি ভাল-মন্দ রয়েছে।[(৩)]

মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের জন্য কি কাজ করেছে ও কি অর্জন করেছে সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে ও চিন্তা করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন: [﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨﴾] [হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।][(৪)]

নবী সাঃ ব্যক্তির চলাফেরার বিষয়ে তার স্বীয় দায়িত্বের কথা বর্ণনা করে বলেন, (কিয়ামত দিবসে কোনো বান্দার পা ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে: কোন কাজে তার জীবন অতিবাহিত করেছে এবং ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে এবং তার ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে এবং তা কোথায় ব্যয় করেছে; এবং তার দেহ কোন কাজের মধ্য দিয়ে জীর্ণ করেছে।)[(৫)]

মুসলিম ব্যক্তির জানা উচিত যে, নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সর্বোত্তম জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, এমনকি এটাকে সর্বশ্রেষ্ট জিহাদ বলা হয়েছে।[(6)] নবী সাঃ বলেছেন: (প্রকৃত মুজাহিদ হলো সেই, যে স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।)[(৭)] আর অপারগ ব্যক্তি সে যার সম্পর্কে উমর রাঃ বলেন: (প্রকৃত অপারগ ব্যক্তি সেই যে তার স্বীয় নফসকে পরিচালনা করতে অক্ষম।)[(৮)]

ফেরাউনের স্ত্রীর কথা চিন্তা করুন! সে একজন কাফের, উদ্ধত ও প্রতাপশালী ব্যক্তির গৃহে এবং আল্লাহর শত্রুর বাড়ীতে ছিল, কিন্তু সে তার নিজের দায়িত্বের বিষয় অনুধাবন করতে পেরেছিল, তাই সে কুফরীর দায় প্রকাশ করেনি যদিও সে তার অধীনে থাকত। বরং সে ঈমান এনেছিল এবং এমন কথা বলেছিল যার বর্ণনা কুরআনে এসেছে: [﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١﴾] [আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদের জন্য পেশ করেন ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার রব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার

(১) সূরা আশ-শামসঃ (৮)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৫৫১)।
(৩) ফাতহুল কাদীর (৫/৪৪৯)।
(৪) সূরা আল-হাশরঃ (১৮)।
(৫) সুনানে তিরমিযি (৪/৫২৯, হাঃ ২৪১৭), তিনি বলেছেনঃ হাদিসটি হাসান সহীহ, শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (১৩/২৪২)।
(৭) সুনানে তিরমিযি (৪/১৪২, হাঃ ১৬২১), মাসনাদে আহমাদ (৬/২০), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮) আদাবুদ দুনিয়া ওয়া আদদ্বীন পৃঃ (২৩৪)।

জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।][১]

আবার অনেক মানুষ তাদের বিচ্যুতির পক্ষে দলিল পেশ করে তাকদীরের কথা বলে। অর্থাৎ এটা তাদের উপর নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। আর তারা ভুলে যায় শরীয়তের পক্ষ হতে তাদের কর্ম ও চলাচলের বিষয়ে দায়িত্ববোধ সম্পর্কে। অপরপক্ষে তাদেরকে রিযিক অন্বেষনের পিছনে ছুটতে দেখা যায় এই বলে যে, আল্লাহ তায়ালা সাবাব তথা উপকরণ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তারা বিচ্যুতির ব্যাপারে নিজেদের বিভ্রান্ত করে, কিন্তু রিযিক উপার্জনের ক্ষেত্রে সঠিকপথে থাকে।

বান্দার নির্ধারিত তাকদীরের বিষয়ে দুটি অবস্থা এবং আদিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেও দুটি অবস্থা। যখন এই অবস্থাগুলো বুঝবে তখন তার বিষয়গুলো ঠিক থাকবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এর বর্ণনা করেছেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ[২]

প্রথম: তাকদীরের ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থাঃ

১- তাকদীর পতিত হওয়ার পূর্বের অবস্থা: এই অবস্থায় তার কর্তব্য হচ্ছে সে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, তাঁর উপর ভরসা করবে এবং তাঁর নিকট দোয়া করবে।

২- তাকদীর পতিত হওয়ার পরের অবস্থা: যদি তার কর্ম ছাড়াই তাকদীর নির্ধারিত বিষয় এসে যায়, তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, ধৈর্যধারণ করা ও সন্তুষ্ট থাকা। আর যদি তার কর্মের ফলে তাকদীর নির্ধারিত বিষয় আসে এবং সেটা নিয়ামত হয়, তবে তার কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা করবে, আর যদি পাপের কাজ হয় তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

দ্বিতীয়ঃ আদিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থাঃ

১- কাজ করার পূর্বের অবস্থাঃ তা বাস্তবায়নের জন্য সংকল্প করা ও সে ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

২- কাজ করার পরের অবস্থাঃ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং কল্যাণকর কাজের নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া করা। এর মাধ্যেমে ব্যক্তি তার উত্তম আচরণ বাস্তবায়ন করবে এবং আদিষ্ট বিষয় ও তাকদীরের বিষয় হৃদয়াঙ্গম করতে পারবে।

কাজেই একজন মুসলিম তার চলাচল ও বিচ্যুতির বিষয়ে নিজের দায়িত্ববোধ অনুধাবন করবে। যদি সে শাস্তির উপযুক্ত হয় তবে দুনিয়াতে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর পরকালে আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন, নইলে তাকে শাস্তি দিবেন। তার কর্তব্য হল আল্লাহ থেকে যথাযথ লজ্জাবোধ করা যে, তিনি তাকে পাপকাজ করতে দেখবেন।

দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক দায়ভারঃ

(১) সূরা আত-তাহরীমঃ (১১)।
(২) আল-কাযা ওয়া আল-কাদর: পৃঃ (৯৬)।

প্রতিপালনের পরিভাষায় পরিবারের অর্থ: তারা সে সমস্ত লোক যারা তার চারপাশে অবস্থান করে এবং তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান।[১]

বিশ্বায়নের ফলে বর্তমানে মুসলিম পরিবারগুলো অসংখ্য আক্বীদাগত, চরিত্রগত ও চিন্তাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে; যে বিশ্বায়নের মাধ্যমে চরিত্রগত ও ধর্মীয় সামাজিক পার্থক্যগুলোকে দূর করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো সন্তানদের প্রতি পরিবারের লালন-পালনগত দায়ভার বাড়িয়ে দিচ্ছে; বিশেষত এমন বিশ্বে যখন পঠনযোগ্য ও ভিয়্যুয়াল প্রচার মাধ্যমেগুলো বিস্তার লাভ করেছে যা পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তাকে পথের দুর্গমতা বা দূরত্ব বাধা দিতে পারে না। বিশেষ যখন তা আকর্ষণীয় মোড়কে প্রচার করা হয়।

উপরন্তু যখন মুসলিম পরিবারগুলো বৈশ্বিক সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, নারীরা কর্মক্ষেত্রে বের হচ্ছে, পুরুষের সাথে অফিস, মার্কেট ও কারখানায় মেলামেশা করছে। এ সকল বিষয়গুলো মুসলিম পরিবারকে নষ্টের হুমকি দিচ্ছে এবং এর সদস্যদের প্রতি শিক্ষার দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করছে।

ইসলাম পরিবারের উপর তার সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (ইমাম) একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষনাবেক্ষন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।)[২]

এই হাদিস স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে ব্যক্তির দায়িত্বকে শক্তিশালী করে, যারা তার অধীনস্থ। অনুরূপভাবে মহিলা তার বাড়ীর সদস্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তাদের হক আদায় ব্যতীত তার এই দায়িত্ব সম্পন্ন হবে না। যে দায়িত্বের অন্যতম হল রক্ষণাবেক্ষণ করা, দিকনির্দেশনা দেয়া এবং ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপদেশ দেয়া; যার মাঝে থাকবে উত্তম আদর্শ, সদুপদেশ, উপমা বর্ণনা, আগ্রহী করা ও ভীতি প্রদর্শন করা এবং সবশেষ আদব শিক্ষা দেয়া।

মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ﴾ [হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।][3] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের কাজ কর, তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমাদের পরিবারকে যিকিরের নির্দেশ দাও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।[4] আলী বিন আবু তালেব রাঃ বলেন: তোমরা তাদের শিক্ষা দাও ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।[৫]

---

(১) খালেদ হামেদ রচিত আল-মুশকিলা আত-তারবাবীয় আল-উসারীয়া পৃঃ (৪)।
(২) সহীহ বুখারী (১/২৮৪-২৮৫, হাঃ ৬৮৯৩), সহীহ মুসলিম (৩/১৪৫৯, হাঃ ২০/১৮২৯)।
(৩) সূরা আত-তাহরীমঃ (৬)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/২৩৩)।
(৫) পূর্বোক্ত ((৪/৪১৭)।

পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা পরিপালনগত দায়িত্ব পালনের দাবী রাখে; নসিহত ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে। কাজেই মুসলিম পরিবারের উপর আবশ্যক তাদের সন্তানদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া ও হেফাযত করা এবং তাদেরকে সকল ধরণের চারিত্রিক বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা।

এই উম্মতের সালাফে সালেহীনগণ পরিবারের দায়িত্ব ও তার বিশাল গুরুত্ব অনুধাবন করতেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহঃ আমাদের জন্য পরিপালনগত দায়িত্ববোধের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। তিনি তার সন্তানদেরকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছিলেন। তার নিকট সংবাদ পৌছল যে, তার এক সন্তান একহাজার দিরহাম দিয়ে আংটির পাথর ক্রয় করেছেন, তখন তার কাছে লিখে পাঠালেন: আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, তুমি একহাজার দিরহাম দিয়ে একটি আংটির পাথর ক্রয় করেছ, তুমি সেটা বিক্রয় করে দিয়ে তার দ্বারা একহাজার জন ক্ষুধার্থকে খাবার দাও। আর তুমি একটি লোহার চায়না আংটি খরিদ কর এবং তাতে লিখে রাখ, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন যে তার নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত।[১]

সুতরাং বর্তমানে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে; যেহেতু জীবনকে বিশ্বায়ন, স্নায়ুযুদ্ধ ও আক্বীদাগত বিচ্যুতি বেষ্টন করে রেখেছে এবং সরাসরি সম্প্রচার ও দ্রুত ভ্রমণমাধ্যমের কারণে দূরত্ব কমে এসেছে।

তৃতীয়তঃ সামাজিক দায়ভারঃ

আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে একটি মহান বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যদি তারা এই বৈশিষ্ট্যের দাবী অনুযায়ী কাজ করে। বৈশিষ্ট্যটি হল উত্তমতা যার চাহিদা হল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মাধ্যমে পারস্পরিক কল্যাণকামনার দায়িত্ব পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾] [তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।][২]

উপরোক্ত আয়াতে এই উম্মতের প্রশংসা করা হয়েছে যতক্ষণ প্রর্যন্ত তারা এটা বাস্তবায়ন করবে এবং এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে। আর যখন তারা বাধা দেয়া ছেড়ে দিবে এবং খারাপ কাজে সহমত পোষণ করবে তখন তাদের থেকে এই প্রশংসা বিলীন হয়ে যাবে।[৩] কাজেই এই উম্মতের যে ব্যক্তি উক্ত গুণগুলো ধারণ করবে সে তাদের সাথে প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত হবে। কাতাদা রহঃ বলেন: আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে উমর রাঃ একবার হজ করতে গিয়ে মানুষের মাঝে সহনশীলতা দেখতে পেলেন, তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন [كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] [তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে;] অতঃপর বললেন: যে ব্যক্তি এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আনন্দিত হতে চায় সে যেন এর শর্ত পূরণ করে। আর যে ব্যক্তি এই গুণগুলো ধারণ করবে না, সে আহলে কেতাবদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হবে যাদেরকে আল্লাহ তিরস্কার করেছেন।[৪]

(১) সিরাত ও মানাকিবু উমার বিন আব্দুল আজীজ, পৃঃ (৩১৫)।
(২) সূরা আলে ইমরানঃ (১১০)।
(৩) আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (৪/১১১)।
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/৪০৪)।

এটা উপরোক্ত উপকরণগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান; যার মাধ্যমে তারা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়েছে এবং সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ নসিহত পেশ, কল্যাণের প্রতি ভালবাসা, দাওয়াত, শিক্ষা, দিকনির্দেশনা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা প্রদানের দিক থেকে।[১]

তাই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে আদেশ করেছেন যেন তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করণের দায়িত্ব পালন করে। মহান আল্লাহ বলেন: [﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾] [আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম।][২]

ইসলাম সমাজের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করে যা তার সাধ্যের মধ্যে। তাইতো সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী কল্যাণ কামনার দায়িত্ব বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছে। নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর।)[৩]

সামাজিক দায়িত্ব শুধু খারাপ কাজে বাধা প্রদানের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং কর্তব্য হল খারাপ কাজ বিদ্যমানতার কারণ দূর করা; দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতার মাধ্যমে। যেন সে তার প্রয়োজন পূরণে চুরি ধোঁকাবাজী ইত্যাদি বিচ্যুত আচরণের দিকে না যায়।

আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য আয়াতে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন: [﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢﴾] [তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।]।[৪] আবু তালহা রাঃ এই আয়াত শ্রবণের পর খুবই চমৎকার ঘটনা ঘটান, যা আনাস রাঃ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (মদিনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) সব চাইতে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূল সাঃ তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলঃ [**তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না**] তখন আবূ তালহা (রাঃ) রাসূল সাঃ এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ বলছেনঃ তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করবেনা। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সাদকা করা হল, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ

(১) তাফসীরে সাদী (১/২৬২)।
(২) সূরা আলে ইমরানঃ (১০৪)।
(৩) সহীহ মুসলিমঃ (১/৬৯, হাঃ ৭৮-৪৯)।
(৪) সূরা আলে ইমরান (৯২)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাকে ধন্যবাদ এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ।)[১]

চতুর্থতঃ রাষ্ট্রের দায়ভারঃ

রাষ্ট্র ব্যতীত সামাজিক মূল্যবোধ ঠিক হয় না, আর শাসক ব্যতীত কোন রাষ্ট্র হতে পারে না যে শাসক সেখানে ফয়সালা করবে ও আল্লাহর বিধান কায়েম করবে। আর শাসকের বিষয়গুলো প্রজা ছাড়া বাস্তবায়িত হবে না, যারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানবে, শাসকের হক আদায় করবে, তার কথা শ্রবণ করা, তার জন্য কল্যাণ কামনা ও একনিষ্টতার মাধ্যমে এবং সমাজের হক আদায় করবে রক্ষণাবেক্ষণ, সংশোধন ও ক্ষতি প্রতিরোধের মাধ্যমে, সর্বোপরি দেশ থেকে তা নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে।

সুতরাং খারাপ চরিত্র দূরীভূত করা ও তা প্রতিরোধ করা শাসকের দায়িত্ব। এরা দুই ধরণের: ওলামা ও শাসকবর্গ। এদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হল, রাজাগণ, মাশায়েখগণ এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার আদেশ দেয়া এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বারণ করা আবশ্যক।[২]

রাষ্ট্রের আমানত বাস্তবায়নের ব্যাপারে শাসক আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হবে। নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সকলেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক একজন দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।)[৩] তিনি আরো বলেন: (আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে খেয়ানতকারীরুপে যদি তার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।)[৪] তিনি আরো বলেন: (এমন আমীর যার উপর মুসলিমদের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা না করে বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ প্রবেশ করতে পারবে না।)[৫] তিনি শাসনভারের দায়িত্ব সম্পর্কে আবু যার রাঃ কে বলেছিলেন: (হে আবূ যার! তুমি দুর্বল অথচ এটা হচ্ছে একটা আমানত। আর কিয়ামতের দিন এটা লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ হবে। তবে যে এটা যথাযথরূপে গ্রহন করবে এবং তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে (তার কথা স্বতন্ত্র)।)[৬]

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাসকের জন্য যে বিষয়গুলো পালন আবশ্যকীয় তা নিম্নরূপঃ

১- প্রমাণিত মূলনীতি ও সালাফে সালেহীনের ঐক্যমতের আলোকে দ্বীনের হেফাযত করা।

২- বিবাদমান দুই পক্ষের মাঝে সমাধান করে দেয়া, যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোন যালিম সীমালঙ্ঘন করতে না পারে বা কোন নির্যাতিত নিজেকে দুর্বল মনে না করে।

---

(১) সহীহ বুখারী (৩/২০৯, হাঃ ৪৫৫৪)।
(২) ইবনে তাইমিয়া রচিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, পৃঃ (৬৮)।
(৩) সহীহ বুখারী (১/২৮৪-২৮৫, হাঃ ৮৯৩), সহীহ মুসলিম (৩/১৪৫৯, হাঃ ২০/১৮২৯)।
(৪) সহীহ মুসলিম (১/১২৫, হাঃ ২২৭-১৪২)।
(৫) পূর্বোক্ত (১/১২৬, হাঃ ২২৯-১৪২)।
(৬) পূর্বোক্ত (৩/১৪৫৭, হাঃ ১৬/১৮২৫)।

৩- জাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও নারীর সংরক্ষণ করা যেন মানুষেরা জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে ও সফরের সময় নিরাপত্তা অনুভব করে নিজের ব্যক্তি বা সম্পদের ক্ষতি হওয়া থেকে।

৪- শরয়ী শাস্তি বাস্তবায়ন করা; যেন আল্লাহর হারামকৃত বিষয় লঙ্ঘন করা না হয় এবং বান্দার হক নষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

৫- অপচয় ও কৃপণতা মুক্তভাবে বায়তুল মাল থেকে দান ও বেতন ভাতা নির্ধারণ করা এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করা।[১]

রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে ভালকাজের প্রচার করা ও খারাপ কাজ প্রতিহত করা যা বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হল মানুষের মাঝে শরয়ী শিক্ষার বিস্তার করা এবং খারাপ চরিত্রবানদের উপর শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা। শাস্তি দুই ধরণের;

সাধারণ শাস্তিঃ তা হল শরয়ীতের নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে কিংবা শরীয়তের আদেশ পালন না করার কারণে সে শাস্তি হয়।[২]

হদের শাস্তিঃ আল্লাহর হক লঙ্ঘনের কারণে শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি।[৩] যেমন যেনা, সমকামিতা, চুরি, মদ্যপান, মুরতাদ হওয়া, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইত্যাদি হদের শাস্তি।

অনির্ধারিত শাস্তিঃ যে সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শরীয়তে নির্দিষ্ট হদ নেই তার জন্য শাস্তি দেয়া। এর হুকুম ব্যক্তি ও কর্ম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এটা এক দিক থেকে হদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কেননা তা সংশোধন ও সতর্ক করার জন্য শাস্তি, আর হদ থেকে ভিন্ন এ কারণে যে, অপরাধের ভিন্নতার কারণে তা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।[৪]

সুতরাং রাষ্ট্র যদি তার শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করে তাহলে সমাজের বিষয়গুলো ঠিক থাকে এবং বিচ্যুত ব্যক্তিরা বিরত থাকে। আর যদি এই দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাহলে সমাজের মানুষদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, খারাপ চরিত্র ব্যাপকতা লাভ করে এবং বিপদ নেমে আসে। তাই মুসলিম দেশের তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

নবী সাঃ রাসূল সাঃ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদের শাস্তি প্রয়োগ না করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেছেন: (যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লঙ্ঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা কুরআ'র মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহ কালে উপর তলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকেদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তবে ভালো হয়) এমতাবস্থায়

(১) আল-আহকাম আস-সুলতানিয়াঃ পৃঃ (১৮)।
(২) আল- উকুবাত ফিত তাশরী আল ইসলামী, পৃঃ (১৯)।
(৩) নায়লুল আওতার (৭/৮৭)।
(৪) আল-আহকাম আস-সুলতানিয়াঃ পৃঃ (১৮)।

তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।)[১]

রাষ্ট্রের শাসকের উপর আবশ্যক হল উপযুক্ত লোকদের উপর দায়িত্ব অর্পন করা। কেননা মানুষেরা হল আল্লাহর বান্দা আর শাসকগণ হলেন বান্দাদের উপর আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তারা বান্দাদের ব্যাপারে কার্যনির্বাহী; পরস্পর অংশিদারিত্ব পর্যায়ের। সুতরাং তাদের মাঝে দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্বের অর্থ রয়েছে। সুতরাং দয়িত্বশীল ও প্রতিনিধি যখন কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয় এবং তার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাদ দেয় অথবা কোন পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশি দামে ক্রয় করার লোক থাকা সত্ত্বেও কম দামে বিক্রি করে তাহলে সে খিয়ানত করল।[২]

যখন মুসলিম রাষ্ট্র এই দায়িত্বগুলো পালন করবে, তখন তাদের অবস্থা ভাল হবে, তাদের চরিত্র সংশোধিত হবে এবং তাদের চারিত্রিক বিচ্যুতি কমে আসবে। উমর রাঃ মদিনায় নৈশ প্রহরী রাখতেন এবং তিনি নিজে দিন-রাত মদিনার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন মুসলিমদের অবস্থা জানার জন্য, বঞ্চিতদেরকে তাদের হক দেয়ার জন্য এবং অত্যাচারিতদেরকে সাহায্য করা ও যালিমদেরকে পাকড়াও করার জন্য।[৩]

যদি সমাজ এমন দেশে হয় যে দেশ কল্যাণ প্রচারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে এবং শরয়ী শাস্তি বাস্তবায়ন করে, তাহলে সে সমাজের লোকদের মাঝে এই হদগুলোর প্রতি সম্মানবোধ জাগ্রত হবে, বিচ্যুত ও খারাপ আচরণ থেকে দূরে থাকবে এবং উন্নত চরিত্রের প্রতি তারা আগ্রহী হবে। সুতরাং এই সমাজের মাঝে কোন অপরাধ বিস্তার লাভ করবে না। কেননা যখন সমাজের মাঝে অকল্যাণ ও খারাপ চরিত্রের পথ রুদ্ধ হবে তখন অবশ্যই কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের পরিধি বিস্তার লাভ করবে। ফলে মানুষেরা ইসলামী চরিত্রে ভরপুর সুখী জীবন যাপন করবে।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা প্রয়োজন তা হল, যদি শাসক তার প্রজাদের প্রতি যুলুম করে, তবে মুসলিমের প্রতি আবশ্যক হল ধৈর্যধারণ করা, বিদ্রোহ ও বিতর্কের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করা বৈধ নয়। কেননা তাতে মুসলিমদের উপর অনেক বিপদ ও ক্ষতি নেমে আসে। যখন কোন সম্প্রদায় তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন তাদের আঙ্গিনায় অকল্যাণ নেমে আসে। নবী সাঃ বলেছেন: (তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, হাউযে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত।)[৪] এক ব্যক্তি রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিল, (হে আল্লাহর নবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকেরা ক্ষমতাবান হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয়না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, আর তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশআস ইবন কায়েস রাঃ তাকে টান দিলেন। তিনি বললেন: তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে।)[৫]

---

(১) সহীহ বুখারী (২/২০৫-২০৬, হাঃ ২৪৯৩)।
(২) আস-সিয়াসা আশ-শারয়িয়া, পৃঃ (১৪)।
(৩) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, তারিখু উমার বিন খাত্তাব (১০২-১১৩)।
(৪) সহীহ মুসলিম (৩/১৪৭৪, হাঃ ৪৮-১৮৪৫)।
(৫) সহীহ মুসলিম (৩/১৪৭৪-১৪৭৫, হাঃ ৪৯-১৮৪৬)।

পঞ্চমতঃ শিক্ষার পরিবেশের দায়ভারঃ

এর দ্বারা শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানসমূহ। যেমন: মাদরাসা, মসজিদ, সামাজিক সংরক্ষণ অফিস, কিশোর সংরক্ষণ অফিস ও জেলখানা।

এই পরিবেশগুলোর কার্যকর প্রভাব রয়েছে, খারাপ চরিত্রের প্রতিষেধকমূলক বা প্রতিরোধমূলক হোক। যেহেতু এর মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের পরিপালনের বিস্তার এবং নোংরা চরিত্রের প্রতিকার করা হয় ও যারা এতে অভ্যস্ত তাদের থেকে তা দূর করা হয়।

মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্র প্রথিত করতে এবং তাদের খারাপ ও বিচ্যুত আচরণকে প্রতিরোধ করতে এই পরিবেশের উপর শিক্ষণীয় গুরুত্বারোপের দায়িত্ব অর্পিত হয়। যা নবী সাঃ এর এই কথা থেকে গ্রহণ করা হয় (তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সকলেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।) সুতরাং শিক্ষক তার ক্লাসে ছাত্রদের বিষয়ে দায়িত্বলীল, মসজিদের ইমাম তার মসজিদের লোকদের বিষয়ে দায়িত্বশীল, তার এলাকায় খারাপ চরিত্রগুলো খুজে বের করে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তার প্রতিকার করবে; আকর্ষণীয় জুমার খুতবার মাধ্যমে যাতে থাকবে ভাল কাজে উৎসাহ প্রদান, খারাপ থেকে সতর্কবার্তা, সত্য ঘটনা, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদাহরণ বর্ণনা এবং খারাপ চরিত্রের ফলে সমাজে যে সব ঘটনা ঘটছে তার পর্যালোচনা।

জেলার তার জেলে বন্দী লোকদের বিষয়ে দায়িত্বশীল, সে তাদের দেখাশোনা করবে, তাদেরকে উত্তম চরিত্রের প্রতি উৎসাহিত করবে, তাদের বিচ্যুতির দিকগুলো জানবে এবং তাদেরকে শিক্ষা, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ দিবে যে তাদের থেকে অজ্ঞতা ও নোংরা চরিত্রকে দূর করবে।

অনুরূপভাবে সামাজিক সুরক্ষা অফিসসমূহ ও কিশোর অপরাধ বিষয়ক অফিসসমূহ তাদের সদস্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তারা তাদের সন্তানতুল্য। আর আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে সৎকর্ম, অনুগ্রহ ও পারস্পারিক সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।][১]

নবী সাঃ বলেছেন: (আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাকে জনগণের দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে খেয়ানতকারীরুপে যদি তার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।)[২]

এ সকল দায়িত্বের ক্ষেত্রে বর্ণিত পরিণতি মুসলিমদের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীলদের বিশাল মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। চায় তিনি শাসক হোন বা শিক্ষক হোন বা কোন প্রতিষ্ঠান প্রধান হোন। কেননা মানুষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা সহজ কথা নয়। বরং ইসলামী মানহাজে তা বিশাল আমানত আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ; যা মানুষদের সকল বিষয় ও কর্মে পূর্ণ প্রচেষ্টার দাবী রাখে। আর এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মানুষের সকল ধরণের প্রতিপালন ও দিকনির্দেশনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তায়ালা এই আমানত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

(১) সূরা আল-মায়েদাঃ (২)।
(২) সহীহ মুসলিম (১/১২৫, হাঃ ২২৭-১৪২)।

তিনি বলেন: [﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾] [নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে।][১] তিনি আরো বলেন: [﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧﴾] [হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খেয়ানত করো না।][২]

আর যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ শিক্ষার দায়িত্বের আমানত আদায় করতে অক্ষম হবে তখন শিক্ষাদান দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তাদের অধীনস্তদের মাঝে উত্তম চরিত্র বির্নিমাণে ও বিচ্যুত চরিত্র দূরীকরণে ব্যর্থ হবে। তার ফলে সমাজে অপরাধ ও ছিনতাই বৃদ্ধি পাবে এবং ফ্যাসাদ ও সম্ভ্রমহানী ব্যাপক আকার ধারণ করবে। সর্বোপরি মানুষের হক নষ্ট করা হবে।

বর্তমান সমাজ যে চারিত্রিক অধঃপতন লক্ষ্য করছে তা মূলত দায়িত্ব ও তার মহত্ব অনুভব না করার কারণে। আর এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে দুর্বল ও ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা যা মানুষকে তার প্রবৃত্তি, আকাঙ্খা ও শয়তানী খেয়াল প্রতিরোধ করার ব্যাপারে শক্তিশালী করে না। সুতরাং মুসলিম সমাজকে অবশ্যই খারাপ চরিত্র প্রতিরোধে তার শিক্ষার দায়িত্ববোধ অনুধাবন করতে হবে এবং এই পরিবেশ তার সর্বশক্তি দিয়ে উত্তম চরিত্র গঠন করতে ও খারাপ চরিত্র দাফন করতে চেষ্টা করবে।

(১) সূরা আন-নিসা: (৫৮)।
(২) সূরা আল-আনফাল: (২৭)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

মন্দ চরিত্র নিরাময়ের পদ্ধতি

প্রত্যেক রোগেরই ঔষুধ রয়েছে, কেউ হয়ত জানে আবার কেউ জানে না। ইসলামী মানহাজের আলোকে দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে বিচ্যুত আচরণের চিকিৎসা মৃত অন্তরকে জীবিত করে; যেহেতু এর ফলে জীবন উত্তম চরিত্রের চর্চা করে এবং পৃথিবীকে উত্তমতা ও কল্যাণ দিয়ে আবাদ করে। মন্দ চরিত্র নিরাময়ের পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল:

প্রথমতঃ শরয়ী জ্ঞানের প্রচার করাঃ

ইলমের মর্যাদা তার বিষয় বস্তুর আলোকে হয়ে থাকে। বস্তুত ইলমের উপকারিতা চরিত্রের মাঝে তার প্রভাব বাস্তবায়নের মাঝে নিহিত থাকে। আর সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ইলম হল দ্বীনের ইলম; কেননা তা জানার ফলে মানুষ পথ পায় আর এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট হয়।[১]

ইলমের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি জানতে পারে আল্লাহ তাকে কী নির্দেশ করেছেন, ফলে তার অনুসরণ করে এবং জানতে পারে কোন বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেছেন, ফলে তা থেকে বিরত থাকে। আর সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ইলম হল শরীয়ত ও এর শাখা-প্রশাখার ইলম। এটা এমন ইলম যা বান্দাকে তার রবের নিকটবর্তী করে, তার নিকট উত্তম চরিত্রকে সুশোভিত করে যেন তা গ্রহণ করে, মন্দ চরিত্র থেকে তাকে দূরে রাখে এবং তার নিকট পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে তোলে। তাই আলেমগণই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে এবং মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ۗ﴾ [আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই কেবল তাকে ভয় করে।][২]

কাজেই মানুষ আল্লাহর সম্পর্কে যত বেশি জানবে তত বেশি তাকে ভয় করবে। আল্লাহর ভয় তার জন্য পাপমুক্ত থাকা এবং তার সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকাকে আবশ্যক করে। এটা ইলমের ফযিলতের প্রমাণ বহন করে, কেননা তা আল্লাহকে ভয় করার প্রতি আহ্বান করে।[৩]

ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন: ইলম হল জীবন ও নূর আর অজ্ঞতা হল মৃত্যু ও অন্ধকার। সকল অকল্যাণের কারণ হল জীবন ও নূরের অনুপস্থিতি, আর সকল কল্যাণের উৎস হল নূর।[৪] কিতাব ও সুন্নাহর নূরের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। এই দুয়ের মাধ্যমে অন্তর পূণর্জ্জীবিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤﴾ [হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহবান করে তার প্রতি, যা

---

(১) আদাবুদ দুনিয়া ওয়া আদদ্বীন পৃঃ (২৮)।
(২) সূরা আল-ফাতির: (২৮)।
(৩) তাফসীরে সাদী (৪/২১৬)।
(৪) মিফতাহু দারীস সায়াদা (১/৫২)।

তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।][১]

অর্থাৎ তোমরা আনুগত্যের আহবানে সাড়া দাও এবং কুরআনের অন্তর্গত আদেশ-নিষেধের বিষয়ে সাড়া দাও, কেননা এতেই রয়েছে স্থায়ী জীবন ও দীর্ঘস্থায়ী নিয়ামত।[২]

সুতরাং পরিবার, মাদরাসা ও সকল শিক্ষার মাধ্যমসমূহ সবচেয়ে উত্তম যে চিকিৎসা উপস্থাপন করতে পারে তা হল শরয়ী ইলম শিক্ষা দেয়া; যা মন্দ আচরণকে দূরীভূত করে আর উত্তম চরিত্র গঠন করে।

কাজেই শুধু ইসলামী বিভাগগুলোতেই শরয়ী শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, যেমনটি ইসলামী সমাজের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান, বরং বিজ্ঞান বিভাগের সকল শাখায় পর্যাপ্ত পরিমাণ শরয়ী শিক্ষা থাকা আবশ্যক। এটাই হল সঠিক চিকিৎসা ও নিরাময়। যারা মাদকাসক্তি থেকে ফিরে এসেছে তাদের একটা বিরাট অংশ দ্বীনি দিক-নির্দেশনার ফলেই ফিরে এসেছে, যেমনটি গবেষণা থেকে প্রমাণিত। আর এটি আমাদের নিকট কুরআন ও সুন্নাহর ঈমানের মাধ্যমেও প্রমাণিত।

পরিবার যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করে, তাহলে তাদের উপর আবশ্যক হল তারা শরয়ী শিক্ষার এই ঘাটতি পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে; যা তাদেরকে দ্বীন ও ফরয বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ শরীয়ত যা থেকে নিষেধ করেছে তার জ্ঞান দিবে। কোন মুসলিম পরিবার বা কোন মুসলিম ব্যক্তি যেন এই কারণ না দেখায় যে, যাদের বিভাগ ভিন্ন যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স বা কৃষি তাদেরকে শরয়ী জ্ঞান শিখানো হবে না। বরং প্রত্যেক মানুষের জন্য এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক যা দ্বীনের বিষয়ে তার অজ্ঞতাকে দূর করবে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিক্ষিতদের চেয়ে অশিক্ষিতদের মাঝে মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা অনেক বেশি। যেখানে তাদের পরিমাণ হল প্রায় ৭০%।[৩]

মাদক গ্রহণের অন্যতম কারণ হল তার হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার উপকারিতার বিষয়ে ভুল ধারণা। যেহেতু অধিকাংশ মাদকসেবীরা মনে করে যে, মাদক তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং বন্ধুদের সাথে সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।[৪]

দ্বিতীয়তঃ সৎ সঙ্গীঃ

চারিত্রিক প্রভাবকের অন্যতম হল সৎ সঙ্গী যারা তাকে কল্যাণের পথ দেখায় ও তা গ্রহণে উৎসাহিত করে এবং অকল্যাণের পথ হতে সতর্ক করে ও সে পথে চলতে নিরুৎসাহিত করে। এ মর্মে নবী সাঃ বলেন: (সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হল কস্তুরী বহনকারী (আতর বিক্রেতা) ও কামারের হাপরের ন্যায়। মৃগ-কস্তুরী বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি লাভ করবে সুবাস। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার কাছ

(১) সূরা আল-আনফাল: (২৪)।
(২) আল-জামে লি আহকামিল কুরআনঃ (৭/২৪৭)।
(৩) আল-জাওয়াবুল ইজতেমায়িয়া আয-যহেরাতিল ইদমান (২/৮২)।
(৪) পূর্বোক্ত (২/১২৭)

থেকে পাবে দুর্গন্ধ।)[১] তিনি আরো বলেন: (মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।)[২]

সুতরাং বিচ্যুত আচরণ নিরাময় করতে বা তার থেকে রক্ষা পেতে অথবা উত্তম চরিত্র গঠন করতে অবশ্যই সৎ সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে। কেননা যে উত্তম চরিত্র গঠন করতে চায় তাকে অবশ্যই সেই পথেই চলতে হবে এবং এই পথে অবশ্যই তাকে সৎ সঙ্গী গ্রহণ করতে হবে, যে তাকে ভাল কাজ, সততা, উত্তম আচরণ, ধৈর্যধারণ ও প্রতিশ্রুতি পূরণে সহযোগিতা করবে।[৩]

সৎ সঙ্গীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল: শরয়ী জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ, বাস্তব জীবনে তার বাস্তবায়ন, উন্নত চিন্তাধারা, উত্তম আচরণকারী, কথার পূর্বে কর্মের মাধ্যমে কল্যাণের প্রতি আহবানকারী, আপনি তাকে কল্যণের পথে অগ্রগামী ও তার পথ উন্মোচনকারী পাবেন, সে হবে অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী, সে বন্ধুর ভুল এড়িয়ে যায়, তাকে সততার সাথে নসীহা করে, সে কাজকে ভালবাসে প্রফুল্লচিত্তে অলসতা বশত নয়।

পক্ষান্তরে অসৎ বন্ধু: তার বন্ধুত্ব গ্রহণের পর শুধু আফসোস ও অনুশোচনা করতে হবে; অথচ তখন অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ অসৎ সঙ্গের পরিণতি বর্ণনা করে বলেন: ﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧ يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ٢٨ لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا﴾ [যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌছার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।][৪]

সালাফে সালেহীনগণ অসৎ সঙ্গ থেকে সতর্ক করেছেন। জনৈক সালাফ বলেন: তোমরা দু'ধরণের মানুষ থেকে সতর্ক থাক। প্রবৃত্তির অনুসারী যাকে তার প্রবৃত্তি ফেতনাগ্রস্ত করেছে আর দুনিয়া অনুসন্ধানী লোক, দুনিয়া যাকে অন্ধ করে রেখেছে।[৫]

মাঠপর্যায়ের গবেষণা ইঙ্গিত করে যে, খারাপ চরিত্রে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে অসৎ সঙ্গীর কার্যকর প্রভার রয়েছে। গবেষণা স্পষ্ট করেছে যে, কর্মক্ষেত্রের লোকদের নতুন সদস্যদের উপর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে তাদের নিকট ভুল বার্তা পৌছানোর ক্ষেত্রে।[৬]

(১) সহীহ বুখারী (৩/৪৬৩, হাঃ ৫৫৩৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০২৬, হাঃ ১৪৬-২৬২৮)।
(২) সুনানে আবু দাউদ (৫/১৬৮, হাঃ ৪৮৩৩), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, সিলসিলা সহিহা (২/৬৩৩, হাঃ ৯২৭)।
(৩) আল-আখলাক ওয়া আস-সিরা, পৃঃ (২৪)।
(৪) সূরা আল-ফুরকানঃ (২৭-২৯)।
(৫) ইকতেযাইস সিরাত আল-মুস্তাকিম পৃঃ (২৫)।
(৬) আল-জাওয়াবুল ইজতেমায়িয়া আয-যহেরাতিল ইদমান (২/৯০)।

অনুরূপভাবে গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অর্ধেকেরও বেশি প্রায় ৫৪.৬% মাদকাসক্ত ব্যক্তি বারবার মাদক ছাড়তে চেষ্টা করেছে, কিন্তু খারাপ বন্ধু থাকার দরুন তারা তা করতে পারেনি। বরং এ পথে ধাবিত হওয়ার জন্য প্রধান কারণ ছিল অসৎ সঙ্গ, যার পরিমাণ হল ৮৫.৫%।[১]

তৃতীয়তঃ শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা:

বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের অন্যতম নির্দশন হল, তিনি তাদের জন্য শরয়ী শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং তা প্রয়োগ করা ওয়াজীব করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ﴾ [আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।][২] তিনি আরো বলেন: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾ [আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।][৩]

সুতরাং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা কাফেরদের কাজ। ইবনে আব্বাস রাঃ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: কুফর বিভিন্ন স্তরের, যুলুম বিভিন্ন স্তরের এবং ফাসেকী বিভিন্ন স্তরের। যখন সেটাকে হালাল মনে করে করা হবে তখন তা সবচেয়ে বড় যুলুম, আর হালাল মনে করে না করলে কবিরা গুনাহ হবে।[৪]

শরয়ী শাস্তি প্রয়োগের সময় অপরাধীর সাথে অনুকম্পা প্রদর্শনা না করা আবশ্যক যাতে করে মন্দ ও বিচ্যুত আচরণ বিস্তার লাভ না করে; কেননা অপরাধমূলক খারাপ ও বিচ্যুত চরিত্র বিস্তার লাভের অন্যতম কারণ হল অপরাধীকে কম শাস্তি দেয়া ও তাদের প্রতি অনুকম্পা করা। তাদের প্রতি অধিক দয়া দেখানো হয় এই দাবীতে যে তাদেরকে শাস্তি দিলে তাদের উপর মানসিক ও স্নায়ুবিক চাপ বাড়বে।[৫]

এটা হল মানব রচিত নীতি যা সমাজে বিচ্যুত আচরণ প্রসার ও বিস্তারের জন্য দায়ী। যদিও আমরা দেখতে পায় যে, শরয়ী শাস্তির ক্ষেত্রে অপরাধীর সাথে দয়া প্রদর্শনের কোন উপায় নেই। বরং কোন প্রকার নমনীয়তা ছাড়াই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, যা অপরাধীকে তার কর্ম থেকে বিরত রাখবে এবং অন্যদেরকে বিচ্যুতি থেকে সতর্ক করবে। আমাদের নবী সাঃ বলেন: (সে মহান সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি মুহাম্মাদ তনয়া ফাতিমা রাঃ চুরি করত তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।)[৬]

মহান আল্লাহ যিনার শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলেন: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا

(১) পূর্বোক্ত।
(২) সূরা আল মায়েদাঃ (৪৪)।
(৩) সূরা আল মায়েদাঃ (৪৫)।
(৪) তাফসীরে সাদী (১/৪৮৮-৪৮৯)।
(৫) আত-তারবিয়া ইসলামিয়া ওয়া দাওরুহা ফি মুকাফাহাতিল জারিমা পৃঃ (২২৪)।
(৬) সহীহ মুসলিম (৩/১৩১৫, হাঃ ১/১৬৮৮)।

﴿طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾[ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।][১]

শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ ব্যক্তিকে তা পুণরায় করা হতে বিরত রাখে কেননা সেখানে তোষামোদ ও অনুকম্পার কোন স্থান নেই।

অপর দিকে ব্যক্তির সংশোধনের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। মানুষ স্বভাবগতভাবেই যেখানে খারাপ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে, যেমনভাবে ভাল অভিজ্ঞতার কাজ বারবার করতে আগ্রহী থাকে।[২]

ইসলামী শরীয়ত ব্যতীত সমাজে এমন কোন শরীয়ত পাওয়া যাবে না যা বিচ্যুত আচরণকে প্রতিরোধ করে; যেহেতু ইসলামী শরীয়তের শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তা প্রয়োগে শৈথিল্যের কোন স্থান নেই। তা মানুষকে বিচ্যুত আচরণ থেকে দূরে থাকতে ও উত্তম চরিত্রের দিকে আগ্রসর হতে উৎসাহিত করে। যে সমাজে ইসলামী শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না সে সমাজ নিয়ে পর্যাবেক্ষণকারী লক্ষ্য করবে যে, সেখানে অপরাধ প্রবণতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, যা সমাজের মানুষদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করছে। পক্ষান্তরে নববী সমাজ পর্যাবেক্ষণকারী লক্ষ্য করবে যে, অপরাধ প্রবণতা সেখানে হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি যখন আবু বকর রাঃ খেলাফতের সময় উমর রাঃ বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন এক বছরে একটি বিচারের আবেদনও করা হয়নি।[৩] বর্তমান সময়ে রাজকীয় সৌদি আরব তার বড় প্রমাণ, যেখানে মানুষেরা নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা উপভোগ করছে যা এর জনগণের জন্য আরামদায়ক ও শান্তিময় জীবন নিশ্চিত করছে।

চতুর্থতঃ প্রচার মাধ্যমগুলোর সঠিক ব্যবহার:

মিডিয়াকে তার বিভিন্ন পঠন ও শ্রবণযোগ্য মাধ্যমগুলোতে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি কার্যকর প্রভাবক হিসেবে গণ্য করা হয়, বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন তার সাথে যোগাযোগ ও তথ্যের প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে এমনকি তা ঘরের গোপন বিষয় প্রকাশ করতে ও যা ইচ্ছা তা প্রচার করতে সক্ষম হচ্ছে।

যেহেতু এগুলো মাধ্যম তাই তার হুকুম হল, তাতে যা ভাল বা মন্দ প্রচার করা হয় সে অনুযায়ী। আর তার পরিণতি কখনো ভাল হয় বা কখনো খারাপ হয় তাতে উপস্থাপিত বিষয়ের আলোকে। সুতরাং তা কল্যাণের সুবাতাস ও উন্নত চরিত্রের প্রচার এবং খারাপ ও মন্দ আচরণ প্রতিরোধের মাধ্যম যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় ও ইসলামের সঠিক দিক-নির্দেশনা পেশ করা হয়।

মন্দ চরিত্র ও বিচ্ছিন্নতার আস্তানা থেকে মানবতাকে বাঁচাতে ইসলামই হল সঠিক মানহাজ। কাজেই এর উপর ভিত্তি করে ইসলামী মিডিয়া গড়ে তোলা আবশ্যক যা নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করবেঃ

১- ইসলামের দিকে আহ্বান।

---

(১) সূরা আন-নূরঃ (২)।
(২) ইলমু ইজতেমায়ীল ইকাব (১/১১৫)।
(৩) ওকী বিন হিব্বান রচিত, আখবারুল কুযা (১/১০৪)।

২- নির্দেশনা ও নসীহার ব্যাপারে সততা অবলম্বন।

৩- অশ্লীলতা প্রচার থেকে দূরে থাকা।

এর ফলে পৃথিবীর সকল স্থানে সংশোধনমূলক দাওয়াতের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়বে, তাকে কোন শত্রু বা হিংসুক বাধা দিতে পারবে না।

সীমালঙ্ঘনকারীরা দায়ীদেরকে মানুষদের নিকট আল্লাহর আহবান পৌছাতে বাধা দেয়। সুতরাং মিডিয়গুলো এই বন্দীত্বকে শেষ করে দিয়েছে। কাজেই তাওহীদের বাণী ও তার ফযিলত কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই প্রচার করা যায়। এখানে সীলঙ্ঘনকারী ও শত্রুরা আক্রমণ করতে পারে না। তাই যদি মুসলিম সমাজে এই মিডিয়াগুলো সঠিক ব্যবহার করা হয় তবে তা হবে সমাজ ও ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তারকারী সবচেয়ে সফল ও কার্যকরী মাধ্যম। শরীয়ত সম্মত চ্যানেল প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিশ্ববাসীর নিকট তাওহীদের বাণী ও তার আলো প্রচার করবে এবং এমন মানহায প্রচার করবে যা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বাস্তবায়ন করবে, এর মাধ্যমে অকল্যাণ ও মন্দ আচরণের বন্ধনকে ছিন্ন করবে; যা বর্তমান ইসলামী সমাজের মূলকে আতঙ্কিত করছে।

পঞ্চমতঃ মসজিদগুলোর সঠিক ব্যবহার:

এই উম্মতের উপর আল্লাহর তায়ালার একটি অন্যতম নিয়ামত হল তিনি তাদের জন্য মসজিদে জামাতে সালাত আদায়ের বিধান দিয়েছেন; যে মসজিদ হল দাওয়াতের কেন্দ্র, দিক-নির্দেশনার মিম্বার যা অন্তরকে কল্যাণের মাধ্যমে আবাদ করে এবং তা হতে জাহেলিয়াতের চরিত্র, পাপাচারের অন্ধকার ও তার দূর্বিপাককে দূরীভূত করে।

অনুরূপভাবে আরেকটি নিয়ামতে হল তিনি জুমার দিনে খুতবার বিধান দিয়েছেন, যার মাধ্যমে একজন খতিব মানুষকে দিক-নির্দেশনা, সঠিক বিষয়ে বর্ণনা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে সক্ষম হবেন; আলেমের হিকমতের সাথে এবং তাদের প্রতি দয়াদ্র হয়ে ও তাদেরকে ভালবেসে। জাবের রাঃ কর্তৃক বর্ণিত নবী সাঃ এর খুতবার বিবরণে এসেছে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো, তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে বলছেন: তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আক্রান্ত হতে পারো ।)[১]

একজন খতিবের কর্তব্য হল সে সমাজের সমস্যা ও তাতে প্রচলিত খারাপ চরিত্রগুলো সম্পর্কে জানবে, যাতে তাদের নিকট শরীয়তের হুকুম এবং ব্যক্তি, সমাজ ও উম্মতের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে এর ভয়াবহতা বর্ণনা করতে পারে। তবে তা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলবে না। কেননা সাধারণভাবে বললে নির্দিষ্ট করে বলার প্রয়োজন হয়না। কারণ মিম্বারে কারো প্রকাশ্য সমালোচনা ও দোষ বর্ণনা শ্রোতার সাথে অসৌজন্যতার ও অপরাধীকে ধমক দেয়ার শামিল, যা তাকে নসীহা গ্রহণ না করতে ও পাপে ডুবে থাকতে উৎসাহিত করে।[২]

দুইটি বিষয় থাকলে খুতবা কাঙ্খিত ফলাফল দিতে পারে:

---

(১) সহীহ মুসলিম (২/৫৯২, হাঃ ৮৬৭)।
(২) মিম্বারুল জুমআ, আমানাহ ওয়া মাসউলিয়াহ পৃঃ (২১)।

এক: খতিবের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ঃ

১- সে উত্তম আদর্শ হবে এবং মানুষের মাঝে এ বিষয়ে সুপরিচিত হবে। কেননা যার কাছে কিছু নেই সে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

২- ভাষা ও উপস্থাপনার দিকে থেকে খুতবার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি নিবে।

৩- খুতবা হবে বিষয় ভিত্তিক।

৪- খুতবায় পর্যাপ্ত পরিমাণ কুরআন-সুন্নাহ, আলেমদের উক্তি ও তাদের জীবনী থাকবে।

৫- খতীব খুতবা দীর্ঘ করবে না বা কারো কণ্ঠ নকল করবে না।

৬- খুতবা ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ ও মন্দ বিষয় হতে ভীতি সম্বলিত হবে এবং তা সমাজের সমস্যার সমাধান করবে যার অন্যতম হল মন্দ চরিত্র।[১]

দুই: খুতবার ক্ষেত্রে মুসল্লীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়:

১- সকাল সকাল মসজিদে উপস্থিত হওয়া।

২- চুপ করে বসা ও মনোযোগ সহকারে খুতবা ও খুতবার দিক-নির্দেশনা শ্রবণ করা। নবী সাঃ বলেছেন: (তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে জুম'আর দিবসে ইমাম খুৎবা দেয়ার সময় বল চুপ কর, তাহলে তুমি অনর্থক কথা বললে।)[২]

এজন্য ইমামের উচিত খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুসল্লীদেরকে চুপ করে খুতবা শোনার প্রতি আকৃষ্ট করা।

অন্য দিক থেকে মসজিদ শিক্ষণীয় কার্যকরী দায়িত্ব পালন করতে পারে, যেমনঃ

ক- শরয়ী ইলমের দারস প্রদান।

খ- দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা যেখানে মানুষদেরকে ভাল কাজে উৎসাহিত করা হবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা হবে।

গ- কুরআনুল কারীমের হালাকার ব্যবস্থা করা, কেননা কুরআন চরিত্রের সংবিধান ও অন্তরের চিকিৎসক, এর মাধ্যম উম্মত সুখী হবে এবং তা বর্জনে মানুষেরা হতভাগা হবে।

ঘ- শরয়ী কিতাব সম্বলিত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা, যার দায়িত্ব পালন করবে কোন আলেম বা ছাত্র এবং ছাত্র-শিক্ষক ও মূর্খ সকলের জন্য সেবা দিবে।

---

(১) দেখুনঃ মিম্বারুল জুমআ, আমানাহ ওয়া মাসউলিয়াহ।
(২) সুনানে আবু দাউদ (১/৬৬৫, হাঃ ১১১২)।

৬- মসজিদে একটি চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠান থাকবে, যা ধনীদের থেকে সম্পদ সংগ্রহ করবে। ফলে তা দরিদ্রদের জন্য প্রশান্তির মাধ্যম হবে, যা তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে রক্ষা করবে এবং মন্দ চরিত্র থেকে হেফাযত করবে।

মসজিদ যদি এই মহান দায়িত্বগুলো পালন করে তবে তা সমাজ থেকে খারাপ আচরণের মূলোৎপাটন করতে এবং ও উত্তম চরিত্রের বিস্তারে অবদান রাখবে। অনুরূপভাবে তা উত্তম জাতী গঠনে ভুমিকা রাখবে, মানব জাতীর জন্য যাদেরকে বের করা হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ মনের বিরুদ্ধে জিহাদ:

মনের মাঝে অকল্যাণ ও বিচ্যুতির প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, আর এগুলোকে মানুষের নিকট সুশোভিত করে দেখায় মানব ও জিন শয়তান। সুতরাং যদি স্বীয় প্রচেষ্টা না থাকে তবে মন সে দিকে আকৃষ্ট হয়; তাই মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হল সর্বোচ্চ জিহাদ। যদি মন ভাল চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হতো এবং প্রবৃত্তি ও তার আকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত না হতো তবে মনের জিহাদের কোন অর্থ থাকত না। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ﴾ [নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে।][১]

মনের মাঝে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তার সাথে হিংসা করে, তার হক নষ্ট করার মাধ্যমে যুলুম করার প্রতি আকর্ষণ থাকে। মনের মাঝে নিজের প্রতি যুলুম করার আগ্রহ থাকে, খারাপ প্রবৃত্তি যেমন যিনা ও হারাম ভক্ষণে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে। তাইতো যে কখনো এমন ব্যক্তির উপর যুলুম করে, যে তার প্রতি যুলুম করেনি। এই প্রবৃত্তিগুলো তার উপর প্রভাব বিস্তার করে যদিও অন্য কিছু না করে। সুতরাং যখন দেখে যে তার সমপর্যায়ের কেউ যুলুম করছে বা এই প্রবৃত্তিগুলো গ্রহণ করছে তখন তার মাঝে এতে জড়িত হতে বা যুলুম করতে বেশি আগ্রহ জাগে।[২]

তাই মনের নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ۝٤١﴾ [আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।][৩]

ইবনুল কায়্যিম রহঃ জিহাদকে চারটি স্তর বিভক্ত করেছেন:

মনের বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

মনের বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি স্তরঃ

---

(১) সূরা ইউসুফঃ (৫৩)।
(২) ইবনে তাইমিয়া রচিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, পৃঃ (৪০-৪১)।
(৩) সূরা আন-নাযিয়াতঃ (৪০-৪১)।

১- হেদায়াত ও সত্য দ্বীন শিক্ষার জন্য জিহাদ; যা ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে মনের কোন সাফল্য ও সৌভাগ্য নেই।

২- জ্ঞান শিক্ষার পর সে অনুযায়ী আমল করার জন্য জিহাদ।

৩- সে দিকে আহ্বান করার জন্য জিহাদ।

৪- দাওয়াতের পথে যে কষ্ট আসে তার উপর ধৈর্যধারণ করার জন্য জিহাদ।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, এর দুটি স্তরঃ

১- বান্দার নিকট ঈমান বিধ্বংসী যে সন্দেহ ও শুবহাত আসে তা প্রতিহত করার জন্য জিহাদ।

২- তার যে খারাপ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় তার বিরুদ্ধে জিহাদ।

মনকে উপযোগী করার প্রথম কাজ হল কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা। কেননা সেটা কোন সহজ বিষয় নয়; তাই তার প্রতিদান মহান, তার পরিণতি কল্যাণকর এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তা বান্দার জন্য আনন্দদায়ক। আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া ও ধৈর্যের সওয়াবের বিষয়ে বলেন: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসহিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।][১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হারাম কর্ম সম্পাদনে আল্লাহকে ভয় করবে এবং কষ্ট, বিপদ ও আদেশ পালনে ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয় তা সৎকর্মের অন্তর্গত, আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।[২]

সপ্তমতঃ দূরদৃষ্টি:

দুনিয়া পরবর্তী বিষয়ে দূরদৃষ্টি মন্দ চরিত্র পরিহার ও উত্তম চরিত্র গ্রহণে শক্তিশালী ও কার্যকরী অনুঘটক। পক্ষান্তরে অদূরদর্শিতা, দুনিয়ার সম্ভোগে দ্রুততা ও বিচ্যুত প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা তার দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক, যেমনটি দুর্বল ঈমানের লোকদের হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ۝١٦ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ﴾ [কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।][৩]

আর এর চিকিৎসা হল যা এই খারাপ চরিত্রকে প্রতিহত করবে ও তাকে সমূলে উৎপাটিত করবে, তা হল এই জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস যে দুনিয়া হল পরীক্ষাগার ও অস্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ

(১) সূরা ইউসুফঃ (৯০)।
(২) তাফসীরে সাদী (২/৪৩৪)।
(৩) সূরা আল-আলাঃ (১৬-১৭)।

ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ [আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।][১] তিনি আরো বলেন: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ﴾ [যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।][২] তিনি অন্যত্র বলেন: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [নিশ্চয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ।][৩]

সুতরাং যমীনের উপর যা কিছু আছে সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়, সুন্দর পোষাক, গাছপালা, নদীনালা, ক্ষেত, ফলমূল, আকর্ষণীয় দৃশ্য, চিত্তাকর্ষক বাগান, শব্দাবলী, আকর্ষণীয় চিত্র, স্বর্ণ, রোপ্য, ঘোড়া, উট ইত্যাদি এই সবগুলোকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জন্য শোভা বানিয়েছেন এবং তাদের জন্য পরীক্ষা ও ফেতনা স্বরূপ করেছেন। তা সত্বেও আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে বিনাশ করবেন এবং যমীন পুনরায় তৃণবিহীন ভূমিতে পরিণত হবে।[৪]

সুতরাং মানুষ যখন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে এবং তার প্রতি ঈমান রাখবে, তাহলে কি সে অদূরদর্শী হতে পারে এবং আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার এই কষ্টদায়ক প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দিতে পারে?! মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا﴾ [নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য, উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ, আর সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা বাক্য; আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত দানস্বরূপ।][৫]

সুতরাং ইসলামী শিক্ষার মানহায তার অনুসারীদের নিকট থেকে প্রত্যাশা করে যে, তারা ভবিষ্যতের দিকে ও ভবিষ্যতের আনন্দের দিকে দৃষ্টি দিবে এবং অস্থায়ী দুনিয়া ও তার কষ্ট হতে দূরে থাকবে। তারা প্রবৃত্তি ও তার যন্ত্রণাদায়ক প্রভাবকে প্রত্যাখ্যান করবে যেন স্থায়ী স্বাদ আস্বাদন করতে পারে; যা প্রেমময়ী, দয়াশীল ও ক্ষমাশীল রবের নিকট শেষ হয় না।

(১) সূরা আল-বাকারাঃ (১৫৬)।
(২) সূরা আল-মুলকঃ (২)।
(৩) সূরা আল-কাহাফঃ (৭)।
(৪) তাফসীরে সাদী (৩/১৪৩)।
(৫) সূরা আন-নাবাঃ (৩১-৩৬)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মতের উপর খারাপ চরিত্রের প্রভাব

প্রথম অনুচ্ছেদ: দ্বীনি প্রভাব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নিরাপত্তাগত প্রভাব

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: স্বাস্থ্যগত প্রভাব

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মানসিক প্রভাব

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: সামাজিক প্রভাব

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: পারিবারিক প্রভাব

সপ্তম অনুচ্ছেদ: অর্থনৈতিক প্রভাব।

ভূমিকা

ব্যক্তি ও সমাজের উপর খারাপ চরিত্রের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে যা বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে। যেমন দ্বীন ধ্বংস করা, আর্থিক অনটন, হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাপৃতি, সমাজের অস্তিত্ব ধ্বংস করা বা দুর্বল করা, পরিবারের সদস্যদের মাঝে খারাপ চরিত্রের রোগ ছড়িয়ে পড়া, সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানী হওয়া।

কুরআনুল কারীম আমাদের সামনে যে ঘটনাবলী বর্ণনা করেছে তাতে আমাদের জন্য শিক্ষা ও নসীহত রয়েছে। কারুন যখন সীমালঙ্ঘন করেছিল ও অহংকার করেছিল আল্লাহ তাকে যমীনে ধসিয়ে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿فَخَسَفۡنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلۡأَرۡضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُنتَصِرِينَ﴾ [অতঃপর আমি কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।][১] মহান আল্লাহ তার নিয়ামত নিয়ে অহংকারী জনপদ সম্পর্কে বলেন: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدٗا مِّن كُلِّ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ﴾ [আর আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।][২] তিনি লূত আঃ এর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন: ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ﴾ [অতঃপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে উল্টে দিলাম, এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর।][৩]

এই পরিচ্ছেদে মুসলিম উম্মাহর উপর এর প্রভাব সম্পর্কে নিম্ন বর্ণিত সাতটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবেঃ

- দ্বীনি প্রভাব

- নিরাপত্তাগত প্রভাব

- স্বাস্থ্যগত প্রভাব

---

(১) সূরা আল-কাসাসঃ (৮১)।
(২) সূরা আন-নাহলঃ (১১২)।
(৩) সূরা হুদঃ (৮২)।

- মানসিক প্রভাব

- সমাজিক প্রভাব

- পারিবারিক প্রভাব

-আর্থিক প্রভাব।

প্রথম অনুচ্ছেদ:

দ্বীনি প্রভাব

খারাপ চরিত্রে জড়িত হওয়া ব্যক্তি দ্বীন নষ্টে প্রারম্ভ, উম্মতের দ্বীনকে দুর্বল করণ, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও ধর্মের খারাপ রূপ প্রকাশ। ইসলামের শত্রুরা এর পৃষ্ঠেই তাদের কলমকে আরোহন করায়, এই দ্বীনের অনুসারীদের বিচ্যুত চরিত্র দিয়ে এই দ্বীন অঙ্কিত করতে; এর প্রকৃত মানহায দিয়ে নয়। খারাপ চরিত্রের দ্বীনি প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হল:

প্রথমত: ইসলামের হাকিকতের বিকৃতি:

নিঃসন্দেহে ইসলামকে আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জীন জাতীর জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনিত করেছেন। এই দ্বীন নিয়ে জিবরাঈল সম্মানিত রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর সাঃ উপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই দ্বীন অতীব স্বচ্ছ। নবী সাঃ বলেন: (অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।)[১]

রাসূল সাঃ এই উজ্জল দ্বীনকে ধারণ করেছেন এবং এর উপরই সাহাবাগণকে গড়ে তুলেছেন। তারা আমাদেরসহ বিশ্ববাসীর সামনে দ্বীনের জীবন্ত, সত্য, সঠিক, স্বচ্ছ রূপ তুলে ধরেছেন, যা মানুষ অবলোকন করেছে, ফলে তারা দলে দলে এই দ্বীনে প্রবেশ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ۝٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا﴾ [যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।][২]

সুতরাং যখন মুসলিম জনপদে খারাপ চরিত্র ছড়িয়ে পড়বে তখন তারা প্রকৃত ইসলামের বিকৃত রূপ প্রকাশ করবে। ফলস্বরূপ মানুষের মাঝে বিকৃত আচরণ দ্বারা এই ধারণা জাগ্রত করে যে, এটাই হল ইসলাম ধর্ম যা তার অনুসারীদের মাঝে বিদ্যমান। ফলে তারা মুসলিম সমাজে চুরি, প্রতারণা ও ধোঁকা দেখতে পায় এবং তারা এর সদস্যদের মাঝে যিনা ও মদ্যপানের বিস্তৃতি অবলোকন করে; যা তারা তাদের দেশে গোপন বা প্রকাশ্যে চর্চা করে অথবা অমুসলিম দেশে তাদের মতই চলাচল করে। তাদের আচরণে যুলুম, বলপ্রয়োগ ও সীমালঙ্ঘন লক্ষ্য করা যায়, এমনকি অনেক সময় তারা এটা ইসলামের নাম দিয়ে করে থাকে। সুতরাং এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর সঠিক দ্বীনের বিকৃত রূপ প্রকাশ করে।

কাজেই একজন মুসলিম যেন খারাপ চরিত্রের পরিণতি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার মন্দ প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকে। নবী সাঃ বলেছেন: (যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করে তবে এ অসৎকর্মের

---

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ (১/১৬, হাঃ ৪৩), শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ আল-জামে আস-সগীর (২/৮০৫)।
(২) সূরা আন-নাসরঃ (১-৩)।

গুনাহ তার উপর বর্তাবে এবং ঐ ব্যক্তির গুনাহও, যারা তার পরবর্তীতে সে অসৎকর্ম করবে, এতে তাদের গুনাহ বিন্দু পরিমাণও কমবে না।)[১]

দ্বিতীয়তঃ জাতীর ধর্মকে সমালোচনার মুখোমুখী করা:

এই দ্বীনের অনুসারীদের খারাপ চরিত্রের ফলস্বরূপ তাতে যা কিছু আরোপিত হচ্ছে তার অন্যতম হল প্রচার মাধ্যমগুলোতে বাণী, ছবি বা প্রবন্ধের মাধ্যমে এর সমালোচনা করা; যেটা তারা এই দ্বীন ধ্বংসের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করছে।

কাজেই যখন কিছু মুসলিম নারী হিজাব বর্জন করেছে এবং খারাপ চরিত্রের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তখন ইসলামের শত্রুরা বুঝতে পেরেছে যে, তারা যদি হিজাবের সমালোচনা করে তবে তাদের তারা সাহায্য করবে। ফলে তাদের কলম, পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম হিজাবের সমালোচনা করতে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

ইসলামের শত্রুরা এর সমালোচনা করার সাহস করে না, তবে যদি তারা সুযোগ পায় তবে তাদের ধর্মীয় শত্রুতা প্রকাশ করে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ﴾[তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, আর তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে।][২]

অর্থাৎ যদি তারা সুযোগ পায় তবে কথা ও কাজ দ্বারা তোমাদেরকে কষ্ট দিতে কোন দ্বিধা করবে না।[৩]

বর্তমান বিশ্ব নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখতে পাবে যে এই সময়ে ইসলামের কঠোর সমালোচনা করা হয়, বিশেষ করে নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই বলে যে, ইসলাম নারীদেরকে কর্মক্ষেত্র ও উঠাবসায় পুরুষদের সমপর্যায় হতে বাধা দিচ্ছে।

এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য হল নারীকে তার বাড়ী ও পরিপালনগত দায়িত্ব থেকে বের করা, যেন মার্কেট, কারাখানা ও হাসপাতালে পুরুষদের সাথে মিলিত হয়। যার ফলে মুসলিম উম্মাহর চারিত্রিক অধঃপতন ঘটবে যেমনভাবে তাদের সমাজে চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছে।

তৃতীয়তঃ ইসলাম গ্রহণে মানুষদের পিছপা হওয়া:

মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের মাঝে খারাপ চরিত্র ছড়িয়ে পড়লে তারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তার অন্যতম হল, মানুষেরা এই দ্বীন গ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে যাবে। কেননা যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা তা গ্রহণ করে ধর্মীয় প্রশান্তি পাওয়ার জন্য যা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। কাজেই যখন তারা দেখে যে মুসলিমদের মাঝে সেসব খারাপ চরিত্র রয়েছে যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বিদ্যমান, তখন তারা ধারণা করে এটাই

(১) সহীহ মুসলিম (২/৭০৫, হাঃ ৬৯-১০৪)।
(২) সূরা আল-মুমতাহিনাঃ (২)।
(৩) তাফসীরে ইবনে কাসীর (৪/২৭১)।

ইসলামের পথ। ফলে এ থেকে ফিরে যায়। সুতরাং শান্তি প্রত্যাশীদের এই দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়ার কারণ হল মুসলিমদের খারাপ ও নিকৃষ্ট চরিত্রে জড়িত হওয়া।

এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল একজন ইহুদী যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি শান্তির খোঁজে বিভিন্ন ধর্ম অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু তিনি আরব দেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হননি। তিনি বলেন: আশ্চর্যের বিষয় হল আমি আরব দেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও ইসলামকে সেরূপ গুরুত্ব দেইনি। অতঃপর আমি লন্ডনের একজন বিখ্যাত দায়ীর সন্ধান পাই, ফলে আমি আশ্চর্যন্বিত হই আরবদের অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে ঘাটতি দেখে।[১]

প্রশ্ন: তিনি আরব দেশে থেকেও কেন প্রভাবিত হননি? অথচ বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন মেজর একজন মুসলিমের আদর্শ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: তিনি বার্মার জলপথে একটি ছোট নৌকায় ভ্রমণ করছিলেন, আর নৌকার নাবিক ছিল একজন মুসলিম ব্যক্তি, যিনি আমলে ছিলেন দক্ষ, দ্বীনের শিক্ষা ধারণকারী, একনিষ্ঠ ব্যক্তি, সময়মত সালাত আদায়ে যত্নবান ও তাকওয়াবান। তিনি শুধু আমার নিকট সম্মানিত ব্যক্তিই ছিলেন না, বরং আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেন তার দ্বীন সম্পর্কে জানতে যা তাকে একজন মুত্তাকী বান্দায় রূপান্তরিত করেছে।[২]

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম ব্যক্তি কখনো উত্তম আদর্শ সম্পন্ন হয়, যে মানুষকে এই দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং এই দ্বীনের মহান শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে, যার অন্যতম হল উত্তম চরিত্র। পক্ষান্তরে কখনো খারাপ চরিত্রের অধিকারী হয়, সে এই দ্বীনকে কলুষিত করে যদি সে খারাপ ও মন্দ চরিত্রে জড়িত হয়।

চতুর্থতঃ দ্বীনকে দুর্বল করার মাধ্যমে উম্মতকে দুর্বল করা:

উম্মতের শক্তি হচ্ছে দ্বীনকে মুজবুতভাবে ধারণ করার উপর ভিত্তি করে, আর তার দুর্বলতা হচ্ছে আক্বীদাকে দুর্বলভাবে ধারণ করার কারণে। অনুরূপভাবে জাতীর শক্তিই দ্বীনের শক্তি, এবং দ্বীনের দুর্বলতাই জাতীর দুর্বলতা। চিন্তা করুন! শাসকের শক্তিই হল দ্বীনের শক্তি (নিশ্চয় আল্লাহ শাসক দ্বারা এমন কিছু বাধা প্রদান করেন তা কুরআন দ্বারা হয় না।) তাহলে যদি শাসকের শক্তির সাথে মুমিনদের শক্তি মিলিত হয় তবে কেমন হবে?!

সমাজের মাঝে খারাপ ও মন্দ চরিত্রের বিস্তার এর অনুসারীদের দুর্বলতা ও দ্বীনের প্রতি তুচ্ছজ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। আর এটি দ্বীনকে দুর্বল ও হেয় করার শামিল।

নবী সাঃ এর এই বাণীর বিষয়ে চিন্তা করুন: (খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কি এরূপ হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে (আল ওয়াহন তথা) ভীরুতা ভরে দিবেন। এক

(১) আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, পৃঃ (১৩৩)।
(২) পূর্বোক্ত পৃঃ (১২৬)।

ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ’আল-ওয়াহন’ কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।)[১]

অর্থাৎ কাফের ও পথভ্রষ্টরা একে অপরকে ডাকবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তোমাদের শক্তি খর্ব করার জন্য এবং তোমাদের গৃহ ও সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার জন্য। যেমনভাবে খাদ্য গ্রহণকারীরা খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একে অপরকে ডেকে থাকে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই। ফলে তারা কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই ভালভাবে খেতে পারে। তোমাদের বিরুদ্ধে এই আহ্বান সংখ্যার স্বল্পতার কারণে নয়, বরং সংখ্যার আধিক্য থাকবে কিন্তু তা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার ন্যায়। তাদেরকে এই সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে তাদের কাপুরুষতা ও মর্যাদাহীনতার কারণে। আর শত্রুদের অন্তর থেকে ভয় ও আতঙ্ক দূর করে দেয়া হবে এবং আল্লাহ তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা দিয়ে দিবেন। আল্লাহর রাসূল সাঃ দুর্বলতা দ্বারা তার আনুসঙ্গিক বিষয় বুঝাতে চেয়েছেন, তাই তার ব্যাখ্যা করেছেন দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা এই বাক্য দ্বারা।[২]

কাজেই যখন মুসলিম সমাজে খারাপ ও মন্দ চরিত্র বিস্তার লাভ করবে ও তা প্রাধান্য লাভ করবে, তখন এই উম্মাহর অন্তরে ভয় প্রবেশ করবে। এর মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তিকে দুর্বল করা হবে; যা শক্তিশালী থাকা আবশ্যক, যেন তার তার মাধ্যম দ্বীন শক্তি ও বিস্তার লাভ করে। সুতরাং মুসলিম সন্তানদের দ্বীনের উপর এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের নিজেদের উপর বিচ্যুতির ভয়াবহতা অনুধাবন করা উচিত।

---

(১) সুনানে আবু দাউদ (৪/৪৮৩-৪৮৪, হাঃ ৪২৯৭), শায়খ আলবনী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।
(২) আউনুল মাবুদ শরহু সুনানে আবু দাউদ (১১/৪০৪-৪০৫)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ:

নিরাপত্তাগত প্রভাব

ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে সুখী-সমৃদ্ধ জীবনে জন্য গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে মনে করা হয়।

ইসলাম ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতার নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে, এমনকি তাকে সুখী জীবনের তিনটি স্তম্ভের একটি হিসেবে গণ্য করেছে। নবী সাঃ বলেন: (তোমাদের মধ্যে যে লোক নিজের গৃহে নিরাপদে শারীরিক সুস্থতা সহকারে সকালে উপনীত হয় এবং তার কাছে সে দিনের প্রাণ রক্ষা পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকে, তার জন্য যেন দুনিয়ার সমস্ত নি'আমাত একত্রিত করে দেয়া হয়েছে।)(১)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম অন্যায়ভাবে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করাকে সমস্ত মানব জাতীকে হত্যা হিসেবে গণ্য করেছে; সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে ও ফাসাদ সৃষ্টি থেকে ভীতি প্রদর্শনার্থে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ﴾ [যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।](২)

অনুরূপভাবে ইসলাম খারাপ চরিত্রের সকল রূপ ও আকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে; যেহেতু তা ব্যক্তি, সমাজ ও উম্মাহর ক্ষতি সাধন করে। তাই ইসলাম যিনা, সমকামিতা, মদ্যপান, গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা বলা ইত্যাদিকে হারাম করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ﴾ [বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করা।](৩)

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এসকল মন্দ চরিত্রের খারাপ প্রভাব রয়েছে, যা আমরা নিম্নে ব্যাখ্যা করবঃ

প্রথমতঃ হত্যা:

খারাপ চরিত্র বিস্তার লাভ করলে অন্যতম যা সৃষ্টি হয় তা হল তুচ্ছ কারণে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা, যার উৎস হল খারাপ চরিত্র। যেমন ঐ ব্যক্তি যে মাদক বা নেশাদ্রব্য ক্রয় করার জন্য কিছু টাকা চুরি করল, বা তুচ্ছ কোন বিষয় তাকে কেউ রাগান্বিত করল বা সে হত্যা করল নিহত ব্যক্তির সম্পদ ভক্ষণ করার জন্য।(৪)

(১) সুনানে তিরমিযি (৪/৫৭৬-৫৭৫, হাঃ ২৫১৬), মুসনাদে আহমাদ (১/২৯৩)। শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
(২) সূরা আল-মায়েদাঃ (৩২)।
(৩) সূরা আল-আরাফঃ (৩৩)।
(৪) দেখুনঃ আত-তারবিয়া আর-রুহিয়াঃ পৃঃ (২৪৪)।

জাতির মাঝে খুনাখুনির বিস্তৃতি তার নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে ও তার সদস্যদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করে এবং মানুষের সাথে লেনদেন ও উঠাবসায় সন্দেহ ও কুধারণার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে:

মাদক ও নেশাদ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম ভয়াবহতা হল তা সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে; কেননা নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন সমাজেরই সদস্য, তাদের মাঝে তা বিস্তার লাভ করে যা সমাজে বিস্তার লাভ করে। আর যখন নিরাপত্তা বাহিনীর মাঝে মাদক ও নেশাদ্রব্য গ্রহণ ছড়িয়ে পড়ে, তখন জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়।

অনুরূপভাবে যখন জাতির মাঝে যৌন বিকৃতি বিস্তার লাভ করে তখন তা সমারিক শক্তির উপর প্রভাব ফেলে। এর দলিল হল ফ্রান্সের তিক্ত অভিজ্ঞতা, যেখানে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর মাঝে যৌন বিকৃতি বিস্তার লাভ করার কারণে তাদের সামরিক শক্তি দিন দিন লোপ পাচ্ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফ্রান্সের শাসকগণ সৈন্যদের শারীরিক সুস্থতা ও শক্তির শর্তের বিষয়ে শিথিলতা করেছিল। ফলে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রথম দুই বছরে সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তারা ৭৫ হাজার সৈন্যকে কাজ থেকে অবসর দিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। একটি মধ্যম সেনা ছাউনিতে একই সময়ে (২৪২) জন আক্রান্ত হয়েছিল।[১]

তৃতীয়তঃ ছিনতাই:

খারাপ চরিত্রের ফলস্বরূপ এর ধারকরা তাদের শরীরের স্বাভাবিক চাহিদা মেটায় ছিনতাই করার মাধ্যমে; যা সমাজের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। আর এটা মূলত বিচ্যুতি ও খারাপ আচরণের ফল।

চতুর্থতঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করাঃ

খারাপ চরিত্রের প্রভাব হল ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ ধ্বংস করা, যেমন বিভিন্ন কারণে আগুন লাগানো, হয়ত দায়িত্ব পালনে তার অপারগতাকে গোপন করতে বা কোন কর্মচারীর ক্ষতি করতে, বা চুরি ও হত্যার অপরাধ গোপন করতে।[২] এগুলো শুধুমাত্র খারাপ চরিত্রের অধিকারীরাই করে থাকে, যা জাতির নিরাপত্তাকে নষ্ট করে।

পঞ্চমতঃ চুরি করা:

যা জাতির মাঝে নিরাপত্তার ফাটল সৃষ্টি করে তার অন্যতম হল বিচ্যুত ও খারাপ চরিত্রের দরুন চুরির বিস্তার লাভ। যেহেতু তাদের মাঝে কোন দ্বীনি প্রতিবন্ধকতা কাজ করে না এবং নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে পাকড়াও হওয়ার ভয় থাকে না। কাজেই এর উপযুক্ত চিকিৎসা হল ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

ষষ্ঠতঃ চোরা-কারবারী:

খারাপ ও মন্দ চরিত্রের অরেকটি দিক হল তারা সমাজের সদস্যদের মাঝে হারাম ও নিষিদ্ধ জিনিস পাচার করে এবং তাদের মাঝে এমন জিনিসের প্রচলন ঘটায় যা তাদেরকে বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়। যেমন সেক্স

---

(১) হিজাব, আবুল আলা মাওদুদী, পৃঃ (১০১-১০২)।
(২) মুখতাসারাত আদ-দিরাসাত আল-আমনিয়া (৬/২০৯)।

সিডি, খারাপ বই, হারাম ছবি, মাদক, নেশাদ্রব্য পাচার করা; যা জাতির নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে।

একটি সমাজের নিরাপত্তাগত গবেষণার পরিসংখ্যান নিশ্চিত করেছে যে, সমাজে যে বিষ আমদানি হচ্ছে তা মূলত শরীয়ত পরিপন্থী পথে।

সপ্তমত: হিংসা ও শত্রুতার সৃষ্টি:

খারাপ চরিত্র নিয়ে গবেষক মাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, জাতির মাঝের হিংসা ও শত্রুতা তাদের ধ্বংসের কারণ। সুতরাং গীবত ও চোগলখোরী হল জাতির নিরাপত্তা ধ্বংসকারী; কেননা তা হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে যা সমাজের নিরাপত্তাকে নষ্ট করে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য খারাপ চরিত্রও হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে যা নিরাপদ সমাজের ভিত্তিকে প্রভাবিত করে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ:

স্বাস্থ্যগত প্রভাব

ইসলামী মানহায যা কিছু থেকে নিষেধ করেছে তাতে রয়েছে মহা কল্যাণ, অসংখ্য উপকারিতা ও বিরাট হিকমত। আর যা কিছু পালন করতে নির্দেশ দিয়েছে তাতে রয়েছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। তাই ইসলাম খারাপ চরিত্র থেকে নিষেধ করেছে, কেননা তাতে মানব সম্পর্কিত সকল দিকের অকল্যাণ রয়েছে, যার অন্যতম হল শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। যেহেতু অশ্লীল কর্ম সম্পাদন যেমন যিনা, সমকামিতা, মাদক ও নেশাদ্রব্য পান এবং হারাম জিনিস দর্শনের ফলে এমন কিছু রোগে আক্রান্ত হয় যা শরীরকে ধ্বংস করে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। এসকল স্বাস্থ্যগত পরিণতিগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমঃ এইডস রোগ:

এটা এমন রোগ যার কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। যা আবিষ্কার হয়েছে ১৪০১ হিঃ মোতাবেক ১৯৮১ খ্রীঃ। এই রোগ যিনা, সমকামিতা ও রক্ত আদান-প্রদানের মাধ্যমে একজন থেকে আরেকজনের মাঝে ছড়াই। এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয় সমকামিরা। এটি একটি ভাইরাস জনিত রোগ যা সাদা কোষকে ধ্বংস করে, ফলে শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তা অণুজীবের আক্রমণের পথ পরিস্কার করে, যা বিভিন্ন ধরণের প্রদাহ ও ক্যান্সার সৃষ্টি করে। আমেরিকাতে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ জন এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।[১]

দ্বিতীয়ঃ সিফিলিস রোগ:

এটি একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ যা শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি থেকে অপর জনের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তার প্রথম উপসর্গ হল শরীরের কোন একটি অঙ্গে ফুসকুড়ি হওয়া। পরবর্তীতে যা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এর উপসর্গগুলো হল মাথা ব্যাথা, জ্বর ও রক্ত স্বল্পতা। এই রোগটি তার তৃতীয় পর্যায়ে মৃত্যু ঘটায় যদি তা হার্ট বা কেন্দ্রীয় পরিপাকতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করলে তা প্যারালাইসিসের কারণ, যা অনেক সময় মস্তিষ্ক বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়।[২]

তৃতীয়: ইনগুইনাল গ্রানুলোমা

এটি সামান্য ছোঁয়াচে, এটি শুরু হয় যৌনাঙ্গের বাইরের অংশে, যা অতি পুরাতন লাল ক্ষতের আকারে প্রকাশ পায়। এটা অনেক কষ্টে সেরে উঠে। রোগী যদি অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয় তবে এই ক্ষত কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। যদি এর চিকিৎসা না করানো হয় তবে চরম অক্ষমতা ও ওজন হ্রাস দেখা দেয় অতঃপর রোগীর মৃত্যু ঘটে।[৩]

---

(১) দালিলুল আনফাস বাইনাল কুরআনুল কারীম ওয়া ইলমুল হাদিস (৪০৮-৪০৯) সংক্ষিপ্ত আকারে।
(২) মুশকিলাতুশ শাবান আল-জিনসিয়া ওয়াল আতেফা (১৪৮-১৪৯)।
(৩) পূর্বোক্ত পৃঃ (১৫১)।

চতুর্থঃ ফুসফুস ক্যান্সার:

ধুমপানের ফলে ফুসফুস সবচেয়ে মারাত্মক যে রোগটি দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হল ফুসফুস ক্যান্সার। চিকিৎসকগণ পরীক্ষাগারে কিছু পরিমাণ জামানো সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে তা প্রাণীর চামড়ার উপর রেখেছিল, সাথেসাথে সে প্রাণীগুলো চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল। অতঃপর তারা একই পরীক্ষা প্রাণীর উপর চালালো এবং প্রাণীগুলোকে শ্বাসের সাথে ধোঁয়া গ্রহণের সুযোগ করে দিল, সেগুলো ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হল।[১]

পঞ্চমঃ লিভার সিরোসিস:

মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য লিভার সিরোসিস ঘটায় ও লিভারকে দুর্বল করে এবং তার কার্য সম্পাদনে অপারগ করে তোলে। আবার অনেক সময় তা ফুলে যায়। পরিসংখানে দেখা গেছে ফ্রান্সে ১৯৬৯ সালে (২৫০০০) ও বেশি লোক মারা গেছে।[২]

ষষ্ঠ: যৌন দুর্বলতাঃ

মাদকাসক্তি নারীদের ডিম্বাশয়ের ক্ষয় করে। জনৈক চিকিৎসক বলেন: আমি ময়নাতদন্তের সময় মদ্যপদের অণ্ডকোষে ক্ষয় ও অনমনীয়তা দেখেছি। আর আমি যে কেইসগুলো বিশ্লেষণ করেছি তার ৮৬% এর মাঝে শুক্রাণু উপস্থিতি লক্ষ্য করিনি। এ থেকে আমাদের নিকট মাদকাসক্তদের বন্ধ্যাত্বের কারণ স্পষ্ট হয়।[৩]

সপ্তম: স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বলতাঃ

মাদকদ্রব্য সরাসরি স্নায়ুকে প্রভাবিত করে; যেহেতু তা অসাড়তা ও শিথিলতার সৃষ্টি করে পরবর্তীতে তা পক্ষাঘাত আক্রান্ত করে। যার ফলে স্নায়ুতে কম্পন, ব্যাথা ও দুর্বলতার সৃষ্টি হয়।[৪]

অষ্টম: ডিপ্রেশন ও মানসিক অস্থিরতাঃ

চারিত্রিক বিচ্যুতি তার মাঝে যা সৃষ্টি করে তার অন্যতম হল উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতা; বিচ্যুতির অনুভূতি, সমাজের তার কর্ম ও আচরণ অগ্রহণযোগ্য হওয়া এবং আল্লাহর মানহায ও তাঁর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলস্বরূপ। কেননা আল্লাহকে স্মরণ না করা এবং তাঁর থেকে দূরে যাওয়ার মাঝে চরম অস্থিরতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ۝٣٦﴾ [আর যে রহমানের

(১) আল-মুসকিরাত, আদরারুহা ও আহকামুহা, পৃঃ (২৯৬)।
(২) পূর্বোক্ত, পৃঃ (২০২)।
(৩) মাওকিফুল ইসলাম মিনাল খামর, পৃঃ (২৫)।
(৪) পূর্বোক্ত, পৃঃ (২৬)।

যিকর থেকে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।][১] সুতরাং যখন মানুষের জন্য শয়তান নিয়োজিত করা হয়, তখন সে বিকৃত চিন্তাধার ও ভুল ধারণা মাধ্যমে তার মাঝে উদ্বেগ ও অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে দয়াময় আল্লাহর স্মরণে রয়েছে প্রশান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨﴾ [যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।][২]

অপর দিকে উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতার ক্ষেত্রে গীবত ও চোগলখোরীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। কেননা যারা এ ধরণের স্বভাবের অধিকারী তাদের মাঝে অস্থিরতা ও মানসিক কষ্টের সৃষ্টি হয়; চোগলখোরীর মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতার ফলস্বরূপ। যেহেতু চোগলখোর অনুভব করে যে, এটা তার কর্মের ফলেই হয়েছে তাই তার আফসোস ও কষ্ট বেড়ে যায়।

হিংসার মাঝে অস্থিরতার সমস্ত কারণ বিদ্যমান; কেননা হিংসুক যখন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির মাঝে কোন নেয়ামত দেখে তখন তার বিষণ্নতা ও রাগ বেড়ে যায়, তার রাত দীর্ঘ হয় ও চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়, ফলে সে শান্ত হয় না এবং ঘুমায় না। আপনি তাকে অস্থির ও অস্থিতিশীল পাবেন, সে মানুষের অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করে, কিন্তু নিজের দিকে দেখে না। সে মনে করে তার নিকট যা আছে তা অতি সামান্য, অন্যের নিকট যা আছে তা প্রচুর এবং ক্ষুধা ও লোভ তার অন্তরকে গ্রাস করে রেখেছে।

---

(১) সূরা আয-যুখরুফঃ (৩৬)।
(২) সূরা আর-রাদঃ (২৮)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মানসিক প্রভাব

ইসলামী মানহায অমান্যতার অনেক খারাপ প্রভাব রয়েছে যা মানবসত্ত্বার নানা দিকে প্রতিফলিত হয়; তন্মধ্যে মানসিক দিক।

আর তা হল, যে ব্যক্তি ইসলামী মানহায পরিহার করে বিপথ অবলম্বন করবে; সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার কারণে তার জন্য এমন একজনকে নির্ধারণ করে দেয়া হবে যে তার জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা নিয়ে আসবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ﴾ অর্থ: [আর যে রহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয় আমরা তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।][১] অর্থাৎ যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে উদাসীন হবে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করব যে তাকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে।[২]

আর শয়তান মানুষকে কেবল যা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা আনায়ন করে তার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে তাকে দরিদ্রতা, সংকটাপন্ন অবস্থা এবং অন্যের সম্পত্তিতে লোভ ও নিজের যা রয়েছে তাতে অতৃপ্তির কুমন্ত্রণা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ﴾ অর্থ: [শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।][৩] অর্থাৎ সে তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় যেন তোমরা তোমাদের সম্পত্তি আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে ব্যয় না করে সঞ্চিত করে রাখ। এর সাথে সে তোমাদেরকে নিঃস্ব হওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্যয় করা থেকে নিষেধ করে এবং তোমাদেরকে পাপাচার, গর্হিতকাজ, হারামকাজ ও স্রষ্টার অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়।[৪]

আর মুমিনগণের উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ﴾ অর্থ: [বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না।][৫] তিনি বলেন: ﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ﴾ অর্থ: [নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই।][৬] তিনি আরো বলেন: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٞۚ وَكَفَىٰ

(১) সূরা আয-যুখরুফ: (৩৬)।
(২) তাফসীরে ইবনে কাসীর: (৪/১৩৮)।
(৩) সূরা আল-বাকারা: (২৬৮)।
(৪) প্রাগুক্ত (১/৩২৯)।
(৫) সূরা আল-হিজর: (৪২)।
(৬) সূরা আন-নাহাল: (৯৯)।

﴿بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ অর্থ: [নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আপনার রব'ই যথেষ্ট।][১]

আচরণগত বিচ্যুতির কিছু মানসিক প্রভাব নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে আলোচিত হল:

প্রথমত: মানসিক অসঙ্গতি:

ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ গঠনকারী হল মানসিক সঙ্গতি। আর তা হল, ব্যক্তির চারপাশের সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়া এবং সফলভাবে উত্থাপিত সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা।

মানসিক অসঙ্গতির বাহ্যিকরূপের অন্যতম হল: উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, খাবারে অনীহা, গুটিয়ে থাকা ও অতিরিক্ত লাজুকতা, তরিৎ রেগে যাওয়া, একগুঁয়েমি, আক্রমণাত্মক শত্রুতার প্রবণতা, দিবা-স্বপ্ন এবং মিথ্যা বলা ইত্যাদি মানসিক অস্থিরতার বাহ্যিকরূপ।[২]

মানসিক অসঙ্গতি সৃষ্টিতে আচরণগত বিচ্যুতির বড় প্রভাব রয়েছে। কেননা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফিজিওলজির ল্যাবের পরিক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মদের সামান্য পরিমাণ অংশও মানসিক ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।[৩]

দ্বিতীয়ত: হতাশা অনুভব করা:

আশার বিপরীত হল হতাশা।[৪]

হতাশা মানুষকে অলসতা, উদাসীনতা এবং পরিশ্রমহীনতার দিকে ধাবিত করে। উপরন্তু তাকে প্ররোচিত করে প্রতারণামূলক ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ অনুসন্ধানে। অনুধাবন করুন চোর ও ভিক্ষুকের বিষটি, তাদের অনেকের কাজ ও উপার্জন করার শারীরিক সক্ষমতা থাকার পরেও তাদের চারিত্রিক বিচ্যুতি বেকারত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার দিকে ধাবিত করেছে।

অনুরূপভাবে নেশাদ্রব্য অযৌক্তিক ভয়, হতাশা, নিরাশা, উৎকন্ঠা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এটা চারিত্রিক মূল্যবোধ হারানোর দিকে নিয়ে যায় এবং পাগল বানিয়ে ফেলে। কেননা পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ৫০% পাগল মদপানে আসক্ত ছিল।[৫]

একজন মিথ্যাবাদীকে দেখবে যে, সত্য তাকে নাজাত দিতে পারে -এ ব্যাপারে হতাশা থেকে সে মিথ্যা বলে এবং একজন হিংসুক অন্যের ন্যায় তারও নেয়ামত প্রাপ্তি হতে পারে -সে এ বিষয়ে হতাশ।

আর ইসলামী শিক্ষা মানুষকে আচরণগত বিচ্যুতি থেকে দূরে রাখে, তার অনুসারীদের হৃদয়ে প্রশান্তি ও ধীরস্থিরতা রোপন করে এবং হৃদয়কে সাহসিকতা ও অগ্রগামিতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে। সুতরাং তাকে তুমি

(১) সূরা আল-ইসরা: (৬৫)।

(২) আব্দুল মজীদ আহমদ, আস-সুলূক আল-ইজরামী (১/১৪৫)।
(৩) মাহমুদ হাসান, মুকাদ্দিমাতুল খিদমাহ (পৃ: ৪২৪)।
(৪) ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব (৬/২৫৯)।
(৫) সালেহ আব্দুল আজীজ, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল খামর (৩৫-৩৬)।

মিথ্যাবাদী বা হিংসুকরূপে পাবে না। যেমন রাসূল সাঃ বলেছেন: (কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রে থাকে না।)[১]

তৃতীয়ত: উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা:

আরবি (القلق) অর্থ হল: বিরক্তি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা।[২]

উদ্বেগ হল অন্তরের এমন অবস্থা যা অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায় এবং চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে ও প্রশান্তিকে দূর করে দেয়।

উদ্বেগ ও অস্থিরতার মূল হল ইসলামী মানহায থেকে দূরে থাকা; কেননা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে আল্লাহর যিকিরে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ অর্থ: [জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।][৩]

ইসলামী মানহায থেকে ব্যক্তি যত দূরে সরে যাবে এবং খারাপ চরিত্রে লিপ্ত হবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা তাকে করায়ত্ব করবে। এ কথার স্বপক্ষে সর্বোত্তম সাক্ষী হল ইসলামী শিক্ষার মানহায থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি। তথা ডাক্তারদের বরাতে গবেষণা ইঙ্গিত করছে যে, প্রতি বিশজনে একজন আমেরিকান তার জীবনের কোন এক সময় মানসিক রোগ নিরাময়কেন্দ্রে কাটায়। বাস্তবতা হল, সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধকালীন যে যুবকেরা সামরিক সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল তাদের প্রতি ছয়জনে একজন অস্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিলো। কেননা সে অসুস্থ অথবা মানসিকভাবে দুর্বল ছিল। অনুরূপভাবে পরিসংখ্যাণ প্রমাণ করছে যে, আমেরিকায় মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ হল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। সর্বশেষ বিশ্বযুদ্ধের সময়ে উদ্বিগ্নতার ব্যাধি দুই মিলিয়ন মানুষের প্রাণ নাশ করেছে। তন্মধ্যে এক মিলিয়ন মানুষের ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছিল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও স্নায়ুবিক উত্তেজনা থেকে।[৪]

উদ্বিগ্নতা ও মানসিক অস্থিরতা আনায়নে মাদকদ্রব্য ও নেশাদ্রব্য পানের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মাদকাসক্তদের উপর সরেজমিনের সমীক্ষা নিশ্চিত করেছে যে, তাদের নিকট তুচ্ছ বিষয়ের প্রভাব ৯. ৯৬%, স্নায়ুবিক উত্তেজনা ৮.৮৬%, স্থায়ী উদ্বিগ্নতা ৬.৮৮%, অবসাদগ্রস্ততা ৫.৮৬%, ঘুমের সমস্যা ৫.৮৪% এবং স্থায়ী ভীতি ১.৭০%।[৫]

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকারী মানুষের জীবনে ও আচরণে মানসিক উদ্বিগ্নতার কু-প্রভাব প্রত্যক্ষ করবে এবং এর থেকে একমাত্র মুক্তির উপায় হল ইসলামী মানহাযকে ধারণ করা ও মন্দ চরিত্র থেকে দূরে থাকা।

একজন তাওহীদবাদী মুমিন অন্তরকে প্রশান্তি ও হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাসে পূর্ণ রাখে তার বিপদাপদ যতই বৃদ্ধি পাক, দুর্ঘটনার ঝাঞ্চা বায়ু তার উপর দিয়ে যতই বয়ে যাক এবং দুঃখ-কষ্টে যতই আক্রান্ত হোক। কেননা সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, দুনিয়া হল পরিক্ষা গৃহ; যেমনটি বর্ণনা করেছেন বিশ্বপালনকর্তা এবং তাদের

---

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ (২/৯২৭, হাঃ ২৭৭৪), সুনানে নাসায়ী (৬/১৩, হাঃ ৩১০৯), ইমাম হাকেম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন (২/৭২)।
(২) ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব (১০/৩২৩-৩২৪)।
(৩) সূরা আর-রাদ: (২৮)।

(৪) আব্দুর রহমান ওয়াসেল, মুশকিলাতুশ শাবাব (পৃঃ ৪৩)।
(৫) মুতাওয়াল্লী আশমাবী, আল-জাওয়ানেব আল-ইজতেমাইয়্যাহ (২/১২২)।

সৃষ্টিকর্তা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ অর্থ: [আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরিক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।][১]

চতুর্থত: অন্তরের ব্যাধি:

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্তরের ব্যাধি ও তা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আল-কুরআনে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে হল মহান আল্লাহর বাণী: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ অর্থ: [তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারন তারা মিথ্যাবাদী।][২] তিনি বলেন: ﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّۚ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ অর্থ: [হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।][৩] তিনি আরো বলেন: ﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا﴾ অর্থ: [মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করব; এরপর এ নগরীতে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে।][৪]

আর অন্তরের ব্যাধি হল মানুষের সাথে ঘটে যাওয়া এক ধরণের ভ্রান্তি; যা সত্য সম্পর্কে তার ভাবনা ও অভিপ্রায়কে নষ্ট করে দেয়। ফলে সে সত্যকে সত্য মনে করে না বা সত্যকে তার বিপরীত অবস্থায় দেখে বা তার সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হ্রাস পায় বা সে ক্ষতিকর বাতিলকে ভালবাসে অথবা দুটিই তার মাঝে থাকে তবে বাতিল প্রাধান্য বিস্তার করে।[৫]

এ জন্য বিপথগামীরা হকপন্থী ও সৎলোকদের সংস্পর্শ থেকে পালায়ন করে। বরং কখনো তাদেরকে ঘৃণা করে; কেননা সৎলোকেরা হারাম দ্বারা তাদের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে নিষেধ করেন এবং তারা তাদের মত নয়। কখনো তারা সৎকর্মশীলদের অবুঝ মনে করে। আর এটি জাহালত ও ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত পর্যায়।

---

(১) সূরা আল-বাকারা: (১৫৫)।
(২) সূরা আল-বাকারা: (১০)।
(৩) সূরা আল-আহযাব: (৩২)।
(৪) সূরা আল-আহযাব: (৬০)।
(৫) ইবনুল কায়্যিম, ইগাসাতুল লাহফান (১/২৩)।

আর এর প্রতিকার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ অর্থ: [হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও অন্তরসমূহে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।][১]

সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ ও অন্তরের আরোগ্য কামনা করে -যা অসংখ্য মানুষ প্রত্যাশা করে- সে যেন আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে; কেননা এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ-শান্তি।

---

(১) সূরা ইউনুস: (৫৭)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

সামাজিক প্রভাব

সমাজে ফাটল, সম্পর্ক ভাঙ্গন, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মাধ্যমে মন্দ স্বভাব-চরিত্রের প্রভাব সামাজিক পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়।

এই পরিচ্ছেদের পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে যে আলোচনা গত হয়েছে তা ছিল পরোক্ষ প্রভাব; যা প্রতিফলিত হয় সমাজের ধর্ম, নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দিকগুলোতে। আর নিম্নে সমাজে মন্দ স্বভাব-চরিত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রভাব আলোচিত হল:

প্রথমত: আসমানী শাস্তি:

যখন মন্দ চরিত্র কোন এক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদের অঙ্গনে বালা-মসিবত নাযিল হয়। নবী সাঃ যিনা ও সুদ সম্পর্কে বলেছেন: (যখন কোন জনপদে ব্যাভিচার ও সুদ প্রকাশ পায় তখন তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর শাস্তিকে বৈধ করে নেয়।)(১)

লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মাঝে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন: ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ ۝٨٢ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ﴾ অর্থ: [অতঃপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে উল্টে দিলাম, এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর।* যা আপনার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর এটা যালিমদের থেকে দূরে নয়।](২)

দ্বিতীয়ত: পারস্পরিক শত্রুতা:

মন্দ চরিত্র থেকে উদগত হল উম্মতের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সামাজিক শত্রুতা। উদাহরণস্বরূপ হিংসাকে ধরা যেতে পারে। এটি ঈর্ষার শিকার ব্যক্তির প্রতি হিংসুকের শত্রুতার ফলাফল। হিংসুকের বিকৃত আচরণে, মন্দ স্বভাবে এবং যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামতদানে ধন্য করেছেন, তাদের সাথে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় হিংসা প্রকাশ পায়। এ প্রেক্ষিতে কখনো হিংসার শিকার ব্যক্তিও মন্দ আচণের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে; ফলে তা থেকে হিংসা নির্গত হয়ে হিংসুকদের হৃদয়ে বাসা বাঁধে।

গীবত ও চোগলখোরীর ন্যায় অনৈতিক আচরণের মাঝে এমন উপাদান নিহিত রয়েছে যা সমাজের মাঝে তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর এটি মন্দ ও ভুল আচরণের ফলাফল; যেটাকে তারা পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

(১) হাকেম, মুস্তাদরাক (২/৩৭) এবং তিনি হাদিসের সনদকে হাসান, সহীহ বলেছেন।
(২) সূরা হূদ: (৮২-৮৩)।

অনুরূপভাবে সুদ, ব্যাভিচার, সমকামিতা নেশাদ্রব্য গ্রহণের মাধমে যাদের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা পরিবর্তন হয়ে গেছে; তাদের কপালে বিদ্বেষ ও সামাজিক ঘৃণা জোটে। কখনো এই পারস্পরিক শত্রুতা সৎলোক এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের মাঝে সংঘটিত হতে পারে।

তৃতীয়ত: সামাজিক বয়কট:

সামাজিক বয়কট (সমাজের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়া) এর মূল উৎস হল মন্দ চরিত্র। কেননা প্রতিটি খারাপ আচরণ উম্মতের সদস্যদের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক বিনষ্টে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে। যেমন চোগলখোরী উম্মতের সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন, পরিবার ও বন্ধুদের মাঝের সম্পর্ক কর্তনের একটি মারাত্মক মাধ্যম এবং শক্তিশালী অস্ত্র। অনুরূপভাবে তা শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রসারের উপায়। রাসূল সাঃ চোগলখোর সম্পর্কে বলেছেন: (কোন চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।)[১]

মিথ্যা হল অনিষ্টের মূল এবং সংবাদ নায্যতা হারানোর প্রমাণ। মিথ্যা সামাজিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করে এবং তার কাঠামোকে স্থানচ্যুত করে। মিথ্যা কথার মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক, একই পেশার সঙ্ঘবদ্ধতা এবং বন্ধু-বান্ধবদের দলবদ্ধতা ভেঙ্গে যায়। তার পিছনে রেখে যায় কথা ও কাজে সন্দেহ থেকে সৃষ্ট ঘৃণা-বিদ্বেষ।

সামাজিক সম্পর্ক বিনষ্টের বীজ রোপনে হিংসার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ না হলেও সামাজিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ। কেননা হিংসা হিংসুক ব্যক্তিকে গীবত করা, মিথ্যা বলা এবং সমগ্র শক্তি দিয়ে নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে নেয়ামত অপসারণ করার প্রচেষ্টার দিকে ধাবিত করে। এ নেয়ামতটি হতে পারে স্বামী-স্ত্রী, দু'জন বন্ধু, দু'টি পরিবার বা দুই অথবা ততোধিক গোষ্ঠির মাঝের সামাজিক সম্পর্ক। সুতরাং হিংসুক ব্যক্তি তার অভিযান শুরু করে এই সম্পর্কগুলো ভাঙ্গার লক্ষ্যে। আর এটি ভয়াবহ বিষয়! রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ তোমাদের মাঝেও সংক্রমিত হবে। তা হল, হিংসা ও বিদ্বেষ। এটি হল মুণ্ডনকারী। দ্বীন মুণ্ডনকারী, চুল মুণ্ডনকারী নয়। শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে মুহম্মাদের প্রাণ! তোমরা পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না যদি তোমরা তা কাজে পরিণত কর তবে তোমারা একে অপরকে ভালবাসবে? তাহল তোমরা পরস্পরের মাঝে সালাম বিনিময় করবে।)[২]

চতুর্থত: সামাজিক প্রতারণা:

সামাজিক প্রতারণার নানা ধরণ ও প্রভাব রয়েছে। যেমন কথা, পরিমাপ, অধিকার এবং দায়িত্বে প্রতারণা করা। আবার তা ধন-সম্পদ এবং সম্পর্কেও হয়। এটি কেবল মন্দ স্বভাবের লোক থেকেই প্রকাশ পায়।

মন্দ স্বভাবের ফলাফল হল ওজনে কম দেয়া এবং প্রাপ্য অধিকার প্রদানে কম করা ও দায়িত্ব অবহেলা করা। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو

---

(১) সহীহ মুসলিম (১/১০১, হাঃ ১৬৮-১০৫)।
(২) সুনানে তিরমিযি (৪/৫৭৩, হাঃ ২৫১০), মুসনাদে আহমাদ (১/১৬৫), সহীহ তিরমিযি গ্রন্থে (২০৩৮-২৬৪১) শায়খ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ অর্থ: [দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়।* যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।* আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় তথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।* তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।* মহাদিনে?][১]

মন্দ স্বভাবে ফলাফলস্বরূপ সম্মানহানী করা হয়। অপবাদ আরোপ ও ব্যভিচারের মাধ্যমে সমাজের লোকদের চরিত্র হনন করা হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তি কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।)[২]

সামাজিক প্রতারণার প্রবেশদ্বারসমূহ:

বাস্তবতা বিবর্জিত ও সঠিক চিত্র ব্যতীত নির্দিষ্ট বেশভূষায় এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রকাশ করা যার অবধারিত পরিণতি হল এক বা একাধিক অপর পক্ষকে ধোঁকা দেয়া অথবা এক সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট এক কথা বলে আর অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভিন্ন কথা বলে। এরূপ চরিত্রের মানুষের সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেছেন: (আর মানুষের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখো ব্যক্তি, যে একদলের সঙ্গে একভাবে কথা বলে। অপর দলের সঙ্গে আরেকভাবে কথা বলে।)[৩]

ইমাম কুরতুবী রহিঃ বলেন: "দু'মুখোর ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ; কেননা তার অবস্থা মুনাফিকের অবস্থার ন্যায়। বাতিলপন্থায় ও মিথ্যার মাধ্যমে তোষামোদকারী এবং মানুষের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টিকারী"। ইমাম নববী রহিঃ বলেন: "দু'মুখো হল সেই ব্যক্তি যে প্রত্যেক দলের নিকট তাই বলে যা তাদেরকে তৃপ্ত করে। এর মাধ্যমে সে তাদেরকে বুঝাতে চায় যে, সে তাদের দলে এবং তাদের প্রতিপক্ষের বিপরীত। তার এ ধরণের কর্ম মূলত নেফাকী এবং নিরেট মিথ্যা, ধোঁকা ও উভয় দলের গোপনীয় বিষয় অবগত হওয়ার কৌশল মাত্র! (৪)

পঞ্চমত: আইবুড়োত্ব ও বিবাহে বিলম্বতা:

তাড়াতাড়ি বিবাহের পরিবর্তে বিলম্বে বিবাহের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে চারিত্রিক অধঃপতন। বিশেষত যারা নেশা বা মাদক জাতীয় দ্রব্যে আসক্ত এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়; যার পরিণতি হল তালাকের বিস্তার লাভ। এর কারণ হল পারিবারিক দায়িত্বানুভূতির অনুপস্থিতি এবং অধিক পরিমাণে অন্তর্কলহ। অনুরূপভাবে জীবন-যাপনে নারীদের অনৈসলামী কালচারের দিকে ধাবিত হওয়া; যেমন: দেহপ্রদর্শনী, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পর-পুরুষের সাথে এমন বিষয়ে গল্প করা যাতে পুরুষ অনাগ্রহী। আর এগুলো বিবাহ বিলম্ব এবং বিবাহ ছাড়া আইবুড়োত্বের কারণ।

---

(১) সূরা আল-মুতাফফিফীন: (১-৫)।
(২) সহীহ বুখারী (১/৪১, হাঃ ৬৭), সহীহ মুসলিম (৩/১৩০৬, হাঃ ৩০/১৬৭৯)।
(৩) সহীহ বুখারী (২/৫০৩, হাঃ ৩৪৯৪), সহীহ মুসলিম (৪/২০১১, হাঃ ১০০/২৫২৬)।
(৪) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী (১০/৪৭৫)।

কাজেই মন্দ চরিত্রের প্রভাব সমাজের উপর মারাত্মক যা সমাজের জীবন-যাপন ও আচরণে প্রতিফলিত হয়, অপরাধ ও অধঃপতনকে সৌন্দর্যময় করে তোলে এবং এতদুভয়কে সহজ ও তাতে অভ্যস্ত করে তোলে; যা সমাজের সদস্যদেরকে মন্দ আচরণে অভ্যস্ত করে তোলে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

পারিবারিক প্রভাব

পরিবারের সদস্যদের মাঝে সংঘটিত মন্দ আচরণের দ্বারা পরিবার সরাসরি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আর তা হল বেশি বেশি অবাধ মেলামেশা, দীর্ঘসময় ধরে সহাবস্থান এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে আদান-প্রদানকৃত দায়িত্বের আকারকে বোঝা মনে করার কারণে; যে দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেছেন: (তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল ব্যাক্তি, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীগৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবনু উমর রাঃ বলেন, আমার মনে হয়, রাসূল সাঃ আরো বলেছেন, পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকেই তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।)[১]

পরিবারের উপর মন্দ স্বভাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল:

প্রথমত: দায়িত্বের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়া:

মন্দ স্বভাবের যে প্রভাব সর্বাগ্রে পরিবারে সাথে যুক্ত হয় তা হল, দায়িত্বের বোঝা ও ভার বৃদ্ধি পাওয়া এবং এর অনুসঙ্গ হিসেবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বেড়ে যাওয়া; এর কষ্ট কেবল সেই অনুভব করে যে এতে আক্রান্ত হয়েছে। যথা বাবা-মা পারিবারিক ঘটনাবলী এবং চুরি, যুলুম, ধর্ষণ, মদ ও নেশা পান, জালিয়াতি, ব্যাভিচার, সমকামিতা, অবাধ্যতা, আনুগত্যহীনতা, মিথ্যা ও ভাইদের মাঝে কলহের ন্যায় ইত্যাদি নৈতিক অধঃপতনের অপরাধ সহ্য করেন। বর্ণিত সবগুলো মন্দ স্বভাবে তার বোঝাকে পরিবারে কাঁধে নিক্ষেপ করে; যা তরবিয়তি দায়িত্বশীলতার আকারকেই বৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয়ত: খারাপ আদর্শ:

স্বীকৃত বিষয় হল যে, অধিক পরিমাণে সঙ্গ লাভ, দীর্ঘ মেলামেশা সমস্যা সৃষ্টি করে। আর এই মূলনীতি থেকে যা হয় তা হল, পরিবারের নষ্ট সন্তান অন্যান্য ভাইদের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে সার্বক্ষণিক সঙ্গের মাধ্যমে; যা মুসলিম পরিবার গঠনে মন্দ তরবিয়তি প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ পরিবার নিষ্কলুষ তরবিয়তি কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অনুসরণীয় আদর্শ হারায়।

---

(১) সহীহ বুখারী (১/২৮৪, হাঃ ৮৯৩), সহীহ মুসলিম (৩/১৪৫৯)।

ইসলাম তার শ্রেষ্ঠ তরবিয়তি মানহাযে দ্বীন, চরিত্র এবং সমস্ত আমলে মন্দ আদর্শের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ অর্থ: [আর তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর। তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে, তবুও কি? (তারা পিতৃ পুরুষদের অনুসরণ করবে?)][১]

মন্দ আদর্শের ব্যক্তির সাথে যে ক্ষতি ও ধ্বংস যুক্ত হয় সে সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করল, তার জন্য তো এ কাজের গোনাহ আছেই। এরপর যারা এ মন্দ রীতির উপর আমল করবে তাদের গোনাহও তার ভাগে আসবে আমলকারীদের গোনাহ কোন প্রকার কম করা ব্যতিরেখেই।)[২]

হাদিসটি মন্দ আদর্শের ভয়াবহতা ও মন্দ স্বভাবের অধিকারীর ভাগ্যে যে পাপ যুক্ত হয়; সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য উক্ত মন্দ প্রভাব অপনোদনের জন্য পরিবারের সর্বোত্তম সহায়ক হল মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর প্রজ্ঞাময় মানহায পরিবারের কাঠামোর মাঝে বাস্তবায়ন করা।

তৃতীয়ত: দুর্নাম:

পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিচ্যুতির কারণে পরিবারের দুর্নাম হয়। আর এই দুর্নামের সামাজিক ও পরিপালনগত প্রভাব রয়েছে; তন্মধ্যে: খারাপ পরিবারের সাথে একত্রে বসবাস করা অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে মানুষের অনাগ্রহ। তাই এটি পিতামাতা এবং সন্তানদের উপর ভয়াবহ নৈতিক ও মানসিক প্রভাব ফেলে।

এ জন্য পরিবারের দায়িত্ব হল সেই ইসলামী মানহায প্রয়োগের মাধ্যমে এই খারাপ প্রভাবকে প্রতিহত করা, যেই মানহায মন্দ চরিত্রের দুর্ভোগ ও বিপদ থেকে পরিবার ও সমাজের দূরে থাকাকে নিশ্চিত করে এবং গুজববাজ ও রোগাক্রান্ত হৃদয়ের অধিকারীদের মুখের আঘাত থেকে পরিবারের মান-সম্মানকে রক্ষা করে।

ইসলামী মানহাযের অন্তর্গত সতর্কতামূলক পরিপালনের মাঝে এর জন্য উত্তম সহায়ক রয়েছে। মহান আল্লাহর বাণীকে গভীরভাবে অনুধাবন করুন: ﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾ অর্থ: [হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।][৩]

(১) সূরা লুকমান: (২১)।
(২) সহীহ মুসলিম (২/৭০৫, হাঃ ৬৯-১০১৭)।
(৩) সূরা আল-আহযাব: (৩২)।

এই দিকনির্দেশনার মাঝে সতর্কতামূলক তরবিয়ত রয়েছে যাতে কুপ্রবৃত্তির ব্যাধিতে আক্রান্ত অন্তরের অধিকারীদের কামনাভাব জাগ্রত না হয়। এই প্রতিকার ও সতর্কতামূলক তরবিয়ত অপেক্ষা আর কোন তরবিয়ত মহত্ত্বর!

চতুর্থত: বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা:

পরিবারের সদস্যদের মাঝে যখন গীবত, চোগলখোরি ও হিংসা-বিদ্বেষ বিস্তার লাভ করে তখন তাদের মাঝে শত্রুতা প্রবেশ করে, বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতা তৈরি হয় এবং নৈকট্যতার পরিবর্তে দূরত্ব আপতিত হয়।

আর নবী সাঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেছেন: (আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।)[১]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হল রিযিক বৃদ্ধি পাওয়া ও বয়সে বরকত লাভের দার। নবী সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে।)[২]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের খারাপ প্রভাব রয়েছে সদস্যদের উপর। তথা এতে তাদের পাপ এবং সামাজিক, মানসিক ও বস্তুগত ক্ষতি সাধিত হয়। আর এগুলো মূলত পারস্পরিক অসহযোগিতা, সাহায্যহীনতা এবং অভাবী ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ না করার ফলাফল। কখনো এমনও হয় যে, ধনী ব্যক্তি সুখের নিদ্রায় আছে অথচ তার কোন নিকটাত্মীয় ক্ষুধার্ত রয়েছে এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে। এ জন্য মুসলিম পরিবারের কর্তব্য হল, ইসলামী তরবিয়তি মানহাযের অন্তর্গত তরবিয়তের সকল উপায় অবলম্বন করে তারা একতা বজায় রাখবে এবং সম্পর্ক ছিন্নের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখবে।

পঞ্চমত: দেরিতে বিবাহ:

পরিবারের ইমেজে যে মন্দ প্রভাব যুক্ত হয় তা হল, পরিবারের সন্তান-সন্ততির বিবাহে বিলম্ব করা। আর তার কারণ হল, কিছু মন্দ স্বভাবের উপস্থিতি; যার কার্যকর প্রভাব রয়েছে বিলম্বে বিবাহের ক্ষেত্রে। সে মন্দ স্বভাব হয় মাদক ও নেশাদ্রব্যে অর্থ ব্যয় বা হারাম খেলা অথবা হারাম উপায়ে কামনা-বাসনা তৃপ্ত করার ফল; যেমন: প্রেমিকা রাখা অথবা অভ্যাস ও কালচারের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ফল।

বিলম্বে বিবাহের নানাবিধ খারাপ প্রভাব রয়েছে যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:[৩]

১- যুবকদের উদ্দেশ্যে রাসূল সাঃ এর অমূল্য উপদেশের বাস্তবায়নে ত্বরা না করা; রাসূল সাঃ বলেছেন: (হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে নিচু করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করে।)[৪]

২- হারামে পতিত হওয়ার পথ বন্ধ না করা; যেমন: নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং ব্যাভিচার করা।

---

(১) সহীহ বুখারী (১/২৮৪, হাঃ ৮৯৩), সহীহ মুসলিম (৩/১৪৫৯)।
(২) সহীহ বুখারী (১/৮৯, হাঃ ৫৯৮৫), সহীহ মুসলিম (৪/১৯৮২)।
(৩) খালেদ আল-হাযেমী, আল-মুশকিলাত আত-তারবাবিয়্যাহ (পৃ: ১০-১১)।
(৪) সহীহ বুখারী (৩/৩৫৫, হাঃ ৫০৬৬), সহীহ মুসলিম (২/১০১৯)।

৩- সন্তান-সন্ততি জন্মদানে বিলম্ব করা; যাদের নিয়ে রাসূল সাঃ কিয়ামত দিবসে গর্ব করবেন। তিনি বলেছেন: (তোমরা অধিক সন্তান প্রসবকারী এবং প্রেমময়ী নারীকে বিবাহ কর; কেননা আমি কিয়ামত দিবসে অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব।)[১]

৪- বিবাহে বিলম্ব করার কারণে তরুণীদের মাঝে আইবুড়ো সমস্যার আবির্ভাব হয়।

ষষ্ঠত: মান-সম্ভ্রম হানি করা:

মন্দ স্বভাবের মাঝে এমন উপাদান নিহিতি রয়েছে যা সম্ভ্রমহানি ও বংশ বিনষ্টের দিকে নিয়ে যায় এবং ব্যক্তির যা নয় তার দিকে তা সম্পৃক্ত করার দিকে ধাবিত করে। এগুলো হল যৌন বিকৃতির ফসল। অথচ নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তি কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।)[২]

কেবল প্রশান্ত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দানকারী ইসলামী তরবিয়তের মানহাযের মধ্য দিয়ে অনৈতিক আচরণ থেকে সুরক্ষামূলক তরবিয়তের মাধ্যমেই পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষা করা সম্ভব।

আর ইসলামী তরবিয়তের মানহায হল কুরআন ও সুন্নাহ যে নির্দেশনা ধারণ করেছে তার বাস্তবায়ন।

(১) সহীহ বুখারী (১/৪১, হাঃ ৬৭), সহীহ মুসলিম (৩/১৩০৬, হাঃ ৩০/১৬৭৯)।
(২) সহীহ বুখারী (১/৪১, হাঃ ৬৭), সহীহ মুসলিম (৩/১৩০৬, হাঃ ৩০/১৬৭৯)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

অর্থনৈতিক প্রভাব

অর্থনীতিকে সমাজ গঠন ও তার স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাসের মাঝে বেকারত্ব, অনিষ্টতা এবং বিচ্যুতির দিক রয়েছে। রাসূল সাঃ দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছেন: (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফরী, দরিদ্রতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই।)[১] তিনি আরো বলেছেন: (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দরিদ্রতা, অপ্রতুলতা ও অপমান হতে এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন আমি কারো উপর অত্যাচার না করি বা আমি যেন অত্যাচারিত না হই।)[২]

উম্মতের অর্থনৈতিক দুর্বলতার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী অনুঘটক হল মন্দ চরিত্রের বিস্তার লাভ। কেননা মন্দ চরিত্র নিজ অভ্যন্তরে অনিষ্টতা ও অন্যায়কে ধারণ করে যা উম্মতের উন্নতি, অগ্রগতি, বিকাশ এবং তার কল্যাণ ব্যবহারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। নিম্নে উম্মতের অর্থনৈতিক সক্ষমতার উপর মন্দ চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

প্রথমত: আয় হ্রাস করে:

মন্দ স্বভাব ব্যক্তি ও সমাজের আয়কে দুর্বল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আর তার স্বরূপ হল যে, বিচ্যুত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ রোগাক্রান্ত হয়ে কর্মে অনুপস্থিত থাকে বা পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিলম্ব করে; ফলে এটা সময় অপচয় এবং উপকারহীন কাজে সময় ব্যয়ের দিকে নিয়ে যায়।

আরেক দিক থেকে বলা যায় যে, মন্দ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি তার আয়ের কিছু অংশ গান শোনা, গানের যন্ত্রপাতি ও ক্যাসেট ক্রয়ের ন্যায় অনৈতিকতায় ব্যয় করে বা নাটক, সিনেমা দর্শনের মধ্য দিয়ে সময় নষ্টমূলক কাজে ব্যয় করে বা নেশাজাতীয় ও মাদকদ্রব্য সংগ্রহে খরচ করে; যা সামগ্রিকভাবে উম্মতের অর্থের অপচয় এবং উম্মতকে দুর্বল করার বিষয়টি প্রতিফলিত করে।

কিছু গবেষণা ইঙ্গিত করছে যে, কিছু ইসলামী সমাজে পরিবারের ১৩% বাজেট গান-বাদ্যে ব্যয় করা হয়। মদ পানের কারণে কোন একটি সমাজের লোকসানের পরিমাণ প্রায় ৩১৯৫ পাউন্ড![৩]

কিছু গবেষণা প্রকাশ করেছে যে, মাদকদ্রব্য ও ঔষুধে ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের প্রায় অর্ধেক। আবার কখনো মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার মাদকের নেশা পূরণের জন্য ঋণের দারস্থ হয়।

দ্বিতীয়ত: বেকারত্ব:

---

(১) সুনানে নাসায়ী (৩/৭৩-৭৪, হা: ১৩৪৭), মুসনাদে আহমাদ (৫/৩৬), শাইখ আলবানী সহীহ সুনানে নাসায়ীতে (১২৭৬) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

(২) সুনানে আবু দাউদ (২/১৯০-১৯১,হা: ৫৪৪), শাইখ আলবানী সহীহ সুনানে আবু দাউদে (১৩৬৬-১৫৪৪) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

(৩) মুতাওয়াল্লী আশমাবী, আল-জাওয়ানেব আল-ইজতেমায়িয়্যাহ (১/১০১-১০২)।

আচরণগত বিচ্যুতির প্রভাবের অন্যতম হল আরাম-আয়েশের প্রতি ঝোঁক এবং অভাব পূরণের জন্য অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রহণ। বিশেষত মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে; তথা এই শ্রেণীটি আরামের প্রতি আগ্রহী আর কর্মে অনাগ্রহী। কোন একটা জরিপে তাদের সংখ্যা ২.১১%।[১]

তৃতীয়ত: মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ব্যয়:

জাতীয় অর্থনীতির উপর ব্যক্তির মাদকাসক্তির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যদি একাধিক ব্যক্তি যদি আসক্ত হয় তাহলে কেমন প্রভাব পড়তে পারে? নিশ্চয় তার প্রভাব হবে অধিক মারাত্মক তাদেরকে কর্ম থেকে বিরত রাখার কারণে। তদুপরি এর সাথে যুক্ত হবে বিশাল অর্থ তাদের চিকিৎসা ব্যায়ের অংশ হিসেবে। অথচ এ অর্থগুলো লাভজনক অর্থনৈতিক চ্যানেলে ব্যয় করাটা যৌক্তিক ছিল।

আচরণগত বিচ্যুতির মাঝে এমন উপাদান রয়েছে যা ব্যক্তিকে আসক্তি ও তার চিন্তা-শক্তি আক্রান্ত হওয়ার কারণে প্রতিবন্ধিতার দিকে ধাবিত করে। যা তাকে চাকরিচ্যুত করে এবং তার চিকিৎসা খরচ রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে নির্বাহ করতে হয়।

অন্যদিকে, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে অন্যদের সম্পদের ক্ষতি হয় যা মূলতঃ জাতির অর্থের অপচয় হিসেবে গণ্য। আর আচরণগত বিচ্যুতির ফলে অর্থ ও শক্তির অপচয় হয়।

অনুরূপভাবে ব্যাভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার ফলে এমন রোগে আক্রান্ত হয় যা তাদেরকে কর্ম ও দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত করে। আর এটি কতগুলো বিবেক-বুদ্ধি ও শরীরকে নিষ্ক্রিয় করা যাদের জাতি গঠনে ভূমিকা রাখার অপার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মন্দ আচরণে আক্রান্ত হওয়ার কারণে জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনির্মাণে তারা ভূমিকা রাখার সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। উল্টো তাদের চিকিৎসা, ঔষুধ, ডাক্তার, বেড এবং হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে; যা মূলত জাতির অর্থনীতির অপচয় করছে।

চতুর্থত: ঘুষের মাধ্যমে সম্পদ ধ্বংস করা:

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণকে হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ অর্থ: [আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।][২]

(১) প্রাগুক্ত (২/৮২)।
(২) সূরা আল-বাকারা: (১৮৮)।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: (রাসূল সাঃ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন।)(১)

ঘুষের বিষয়টি শুধু সম্পদ ও সুবিধা অর্জনে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা পদ ও কর্ম অর্জনে পর্যবসিত হয়; যা ব্যক্তিকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে যার যোগ্য সে নয়। অযোগ্য ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করার মাঝে সময়, শক্তি ও সক্ষমতার অপচয় রয়েছে এবং উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস রয়েছে; যার প্রভাব পড়ে জাতীয় অর্থনীতিতে।

অযোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম আলামত। আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: (যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে। সে বলল, কীভাবে আমানত নষ্ট করা হয়? তিনি বললেন: যখন কোন কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত লোকের উপর ন্যাস্ত করা হয় তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।)(২)

ঘুষ কখনো উম্মতের সম্পদ ধ্বংস করার মাধ্যমে তার অধিকার ও অর্থনীতিকে বিনষ্ট করেছে। অনেক ঘুষখোর রয়েছে যাদের উপর প্রশাসনিক বা আর্থিক দায়িত্ব ন্যাস্ত করার পর জাতীয় প্রকল্পগুলোকে ঘুষের বিনিময়ে ধ্বংস করেছে। কখনো এমন হয়েছে যে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষুধ বা খাদ্য সমাজের সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে ফলে সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রাষ্ট্র ও জাতির উপর আর্থিক ও জীবনের ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়ে দিয়েছে।

পঞ্চমত: উৎপাদন হ্রাস:

উৎপাদন হ্রাস, গুণগত মানের দুর্বলতা এবং নিপুনতার অভাবের কারণ হল কর্মে আমানতদারিতা ও আন্তরিকতার অভাব। কেননা আমনতদারিতার মাঝে পেশাগত দায়িত্ব পালনে পূর্ণ চেষ্টা, হকদারের হক প্রদান এবং তাদের নায্য হক না কমানোর মন্ত্র নিহিত রয়েছে। আর এ বিষয়েই শরীয়ত তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের জন্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খেয়ানত করো না।](৩) রাসূল সাঃ বলেছেন: (যে ব্যক্তি তোমার কাছে কিছু আমানত রেখেছে তাকে তা ফেরত দাও। যে ব্যক্তি তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না।)(৪)

যখন উম্মত আমানত হারিয়ে ফেলে তখন পেশাগত দায়িত্ব ও লেনদেনে খেয়ানত, ধোঁকা, মিথ্যা ও প্রতারণা প্রবেশ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হোঁচট খায় ও তাতে মন্দাভাব দেখা দেয়। ফলে তার প্রভাবে জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। আর ইসলাম খেয়ানতকে মুনাফেকির একটি আলামত হিসেবে গণ্য করেছে। রাসূল সাঃ

(১) মুসনাদে আহমদ (২/১৬৪)।
(২) সহীহ বুখারী (১/৩৭, হা: ৫৯)।
(৩) সূরা আল-আনফাল: (২৭)।
(৪) সুনানে আবু দাউদ (২/১৯০-১৯১,হা: ৫৪৪), মুসনাদে আহমাদ (৩/৪১৪), শাইখ আলবানী সহীহ জামেউস সগীরে (১/১০৭, হা: ২৪০) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

বলেছেন: (মুনাফেকের আলামত তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে আর আমানত রাখলে খেয়ানত করে।)(১)

ষষ্ঠত: সম্পদ বিনষ্ট করা:

মন্দ চরিত্র যা রেখে যায় তার অন্যতম হল নানা উপায়ে সম্পদ বিনষ্ট করা; যেমন: অপচয় এবং মুদ্রা পাচার ইত্যাদি।

চারিত্রিকভাবে নষ্টদের অধিকাংশ সম্পদ হারাম কাজে ও বিলাসিতায় ব্যয় হয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ﴾ অর্থ: [আর অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।](২)

অন্যদিকে, আমরা মাদক ও নেশাদ্রব্য ব্যবসায়ীদের দেখতে পাই যে, তারা বাইরে ডলার পাচারে ভূমিকা রাখছে ধ্বংসাত্মক বাণিজ্যিক ডিল বিনিময় এবং তা জাতির জন্য আনায়ন করার লক্ষ্যে।(৩) এর মাঝে জাতির জন্য মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি রয়েছে।

সপ্তমত: প্রতিকারমূলক সুরক্ষা ব্যয়:

যিনা, চুরি, ঘুষ, পাচার, মাদক চোরাচালান ইত্যাদি মন্দ স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই রাষ্ট্র ও তার নিরাপত্তা এজেন্সীগুলোকে অপরাধীদের অনুসন্ধানে, তাদের অপকর্ম নস্যাতে এবং তাদের পাকড়াও করতে বিশাল অংকের অর্থ খরচে বাধ্য করে। একই সমই যদি রাষ্ট্র তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকত তাহলে উক্ত অর্থগুলো উন্নয়নমূলক ভিন্ন খাতে ব্যয় করতে পারত; যার আর্থিক উন্নয়নের সুফল জাতি ভোগ করত। কিন্তু প্রতিকারমূলক সুরক্ষা ব্যয়ের কারণে অর্থনীতির বিরাট একটা অংশ নিরাপত্তা খাতে ব্যয় হচ্ছে।

---

(১) সহীহ বুখারী (১/২৭, হাঃ ৩৩), সহীহ মুসলিম (১/৭৮, হাঃ ১০৭/৫৯)।
(২) সূরা আল-আনআ'ম: (১৪১)।
(৩) মুতাওয়াল্লী আশমাবী, আল-জাওয়ানেব আল-ইজতেমায়িয়্যাহ (১/১০১-১০২)।

পরিশিষ্ট

এই গ্রন্থটি মহান ইসলামী শিষ্টাচার, তার নীতিমালা, ও সীমারেখা বুঝার ক্ষেত্রে নানা বিষয় এবং ইসলামী শিষ্টাচারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফযীলতকে ধারণ করেছে; যার মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক বাস্তবায়িত হবে এবং ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আল্লাহর নিকট উন্নীত হবে।

যেহেতু উত্তম আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ রয়েছে সেহেতু অন্তর, কান, চোখ এবং কর্ম সম্পর্কিত মন্দ আচরণ কেন্দ্রিক আলোচনা গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে এগুলোর পরিচয়, বিপদ ও প্রতিকারমূলক আলোচনা। অনুরূপভাবে গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আচরণগত বিচ্যুতির কারণসমূহ এবং উত্তম চরিত্র হেফাযতে ও মন্দ চরিত্র প্রতিরোধে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনা।

গ্রন্থটি পাঠে ইসলামী মানহায কর্তৃক ব্যক্তি ও সমাজের সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করণের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হবে। আরো স্পষ্ট হবে যে, ইসলামী মানহাযের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা সে তার অনুসারীর জন্য সুখ-সমৃদ্ধি এবং তার রবের নৈকট্য অর্জনকারী চরিত্র নিশ্চিত করে।

ইসলাম প্রতিটি উত্তম গুণাবলীর প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং তা ধারণকারীর জন্য সওয়াব নির্ধারণ করেছে। আর প্রতিটি মন্দ গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে এবং তা ধারণকারীর যে পাপ ও বিপদ রয়েছে; তার বর্ণনাও প্রদান করেছে।

এই মানহাযের পূর্ণতা ও ব্যাপকতার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রশংসা। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন সমস্ত উত্তম গুণাবলীর উপর আমল ও তা চরিত্রে ধারণ করার তাওফীক দান করেন, মন্দ চরিত্র থেকে দূরে রাখেন, আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করেন এবং আমাদেরকে হেদায়েত ও তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজ করার তাওফীক দান করেন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গসহ সকল সাহাবীদের উপর।

সূচিপত্র

সূচিপত্র

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

ভূমিকা...
......২

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামী চরিত্রের সংজ্ঞা, মূলনীতি ও সীমারেখা..........৫

মুখবন্ধ:
....৬

প্রথম অনুচ্ছেদঃ চরিত্রের সংজ্ঞা...৮

প্রথমত: আভিধানিক অর্থে চরিত্র:..৮

দ্বিতীয়ত: কুরআনুল কারীমের বর্ণনায় চরিত্র:..৯

তৃতীয়ত: হাদিসের বর্ণনায় চরিত্র:...১১

চতুর্থত: পারিভাষিক অর্থে চরিত্র:...১৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ শিষ্টাচার সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ..................................২৬

প্রথমত: শরয়ী নীতিমালা: ২৭

দ্বিতীয়ত: উরফ বা প্রথাগত নীতিমালা: ২৯

তৃতীয়ত: মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালা: ৩২

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখা...৩৭

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার সংজ্ঞা: ৩৭

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার গুরুত্ব: ৩৮

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

স্বভাব-চরিত্রের সীমারেখার প্রকারভেদ: ৩৯

১- সাধারণ সীমারেখা: ৩৯

২- বিশেষ সীমারেখা: ৪১

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ চারিত্রিক আচরণের মূলনীতি..৪৫

প্রথমত: বদান্যতা প্রদর্শন করা...৪৫

দ্বিতীয়ত: কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা: ৫০

তৃতীয়ত: কষ্ট সহ্য করা: ৫৭

চতুর্থত: চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখা: ৫৯

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ ইসলামী স্বভাব-চরিত্রের মূলভিত্তি.................................৬১

১- নিয়ত বা ইখলাস: ৬১

২- ইত্তেবা বা অনুসরণ: ৬৬

৩-চারিত্রিক বাধ্যবাধকতা: ৭১

৪. চারিত্রিক সহজতা: ৮১

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: শিষ্টাচার ও চারিত্রিক গুণাবলী..৯০

প্রথমত: আল্লাহর সাথে আদব: ৯১

দ্বিতীয়ত: রাসূল সাঃ সহ সকল নবীগণ আঃ এর সাথে আদব: ৯৬

<u>বিষয়ঃ</u> <u>পৃষ্ঠাঃ</u>

তৃতীয়ত: মাতা-পিতার সাথে আদব...১০০

চতুর্থত: ‘আরহাম’ বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে আদব: ১০৪

পঞ্চমত: প্রতিবেশীর সাথে আদব: ১০৮

ষষ্ঠত: চারিত্রিক গুণাবলী: ………………………………………………………….১১৭

লজ্জাশীলতাঃ……………………………………………………………………… ১১৭

ধৈর্য: …..…………………………………………………………………………১২১

সত্যবাদিতা………………………………………………………………………..১ ২৮

বিনয়: ……………………………………………………………………………..১৩২

সহমর্মিতা ও দয়া: ……………………………………………………………….১৩৯

আমনতদারিতা: ………………………………………………………………………১৪৬

সপ্তম অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক শিক্ষা এবং চারিত্রিক হুকুম আরোপের ভিত্তিসমূহ……..১৫১

প্রথমত: চারিত্রিক হুকুম আরোপ: …………………………………………………..১৫১

দ্বিতীয়ত: চারিত্রিক শিক্ষার ভিত্তিসমূহ: ……………………………………………..১৫৩

সারসংক্ষেপ:.. ………………………………………………………………………..১৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: চারিত্রিক দোষত্রুটি…………………………………………….১৫৭

ভূমিকা: …………………………………………………………………………………১৫৮

<u>বিষয়ঃ</u> <u>পৃষ্ঠাঃ</u>

প্রথম অনুচ্ছেদ: চারিত্রিক দোষত্রুটির পরিচয়, তার উৎসমূল ও নীতিমালা..........১৬২

প্রথমত: চারিত্রিক দোষত্রুটির পরিচয়:..১৬২

দ্বিতীয়ত: চারিত্রিক দোষত্রুটির উৎসমূল: ১৬৩

তৃতীয়ত: চারিত্রিক দোষত্রুটির নীতিমালা: ১৭০

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ চারিত্রিক দোষত্রুটির প্রকারভেদ.................................১৭৫

প্রথমত: শব্দগত বা মৌখিক দোষত্রুটি: ১৭৫

দ্বিতীয়ত: চোখ-কানের দোষত্রুটি: ২০৬

তৃতীয়ত: কর্মগত দোষত্রুটি: ২২২

চতুর্থঃ অন্তরের খারাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ:...২৮৫

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ চারিত্রিক বিচ্যুতির কারণসমূহঃ..................................৩২৩

প্রথমতঃ দ্বীনি নিয়ন্ত্রণের অভাবঃ..৩২৫

দ্বিতীয়তঃ মানসিক অসঙ্গতি...৩৩০

তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক কারণসমূহ...৩৪৩

চতুর্থতঃ সামাজিক পরিবেশ. ৩৫৯

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ বিচ্যুত আচরণসমূহের দায়ভারঃ.................................৩৮০

প্রথমতঃ ব্যক্তিগত দায়ভারঃ..৩৮১

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক দায়ভারঃ..৩৮৫

তৃতীয়তঃ সামাজিক দায়ভারঃ...৩৮৭

চতুর্থতঃ রাষ্ট্রের দায়ভারঃ...৩৯০

পঞ্চমতঃ শিক্ষার পরিবেশের দায়ভারঃ..৩৯৫

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ মন্দ চরিত্র নিরাময়ের পদ্ধতি.....................................৩৯৯

প্রথমতঃ শরয়ী জ্ঞানের প্রচার করাঃ...৩৯৯

দ্বিতীয়তঃ সৎ সঙ্গীঃ..৪০২

তৃতীয়তঃ শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করা: ৪০৪

চতুর্থতঃ প্রচার মাধ্যমগুলোর সঠিক ব্যবহার: ৪০৭

পঞ্চমতঃ মসজিদগুলোর সঠিক ব্যবহার: ৪০৮

ষষ্ঠতঃ মনের বিরুদ্ধে জিহাদ: ৪১১

সপ্তমতঃ দূরদৃষ্টি: ৪১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ উম্মতের উপর খারাপ চরিত্রের প্রভাব...................৪১৬

ভূমিকা...
...৪১৭

প্রথম অনুচ্ছেদ: দ্বীনি প্রভাব...৪১৯

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নিরাপত্তাগত প্রভাব..৪২৫

<u>বিষয়ঃ</u> <u>পৃষ্ঠাঃ</u>

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: স্বাস্থ্যগত প্রভাব...৪২৯

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ মানসিক প্রভাবসমূহ...৪৩৪

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ সামাজিক প্রভাব...৪৪১

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ পারিবারিক প্রভাব..৪৪৭

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ অর্থনৈতিক প্রভাব..৪৫৪

পরিশিষ্ট…………………………………………………………………………………… ৪৬০

সূচিপত্র……………………………………………………………………………………৪৬২

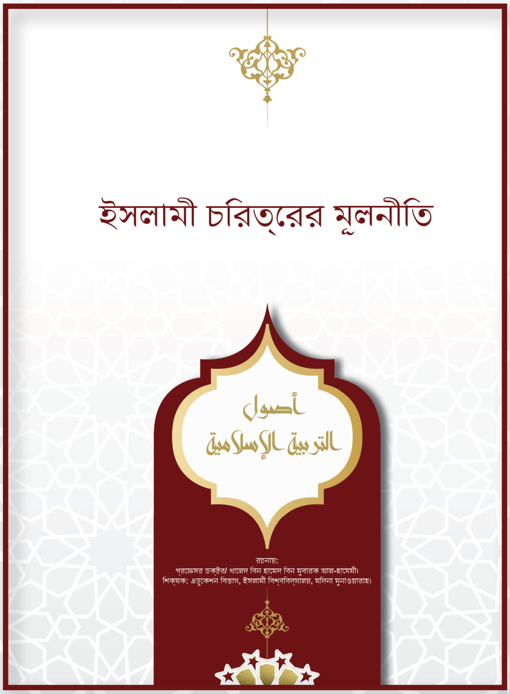
ইসলামী চরিত্রের মূলনীতি
أصول
التربية الإسلامية
রচনায়:
প্রফেসর ডক্টর/ খালেদ বিন হামেদ বিন মুবারক আল-হাযেমী।
শিক্ষক: এডুকেশন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা মুনাওয়ারাহ।